আমি এক অনন্য মানুষ
আমরা এক মহান জাতি

কোয়ান্টাম বুলেটিন

জানুয়ারি ২০১৯

সবার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক

কোয়ান্টাম বর্ষ ২৭

কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী,
আসসালামু আলাইকুম!
শুভ কোয়ান্টাম বর্ষায়ন!

২৬ পেরিয়ে আমরা পদার্পণ করছি ২৭ তম বর্ষে। সিকি শতাব্দী ধরে আত্মনির্মাণ ও সৃষ্টির সেবার মধ্য দিয়ে দেশের জনশক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরে যে অনন্য ভূমিকা রেখেছে কোয়ান্টাম, তার নেপথ্য নায়ক আপনারাই। সবরকম ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ঘরে ঘরে আপনারা কোয়ান্টামের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে এ ইতিবাচক পরিবর্তন। সুখী জীবনের কোয়ান্টাম সূত্রগুলোর চর্চা আজ আমাদের দেশেই যে শুধু বেড়েছে তা নয়, বরং অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্বের প্রথমসারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে। আমাদের পাঠ্যসূচিতেও এর অন্তর্ভুক্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ কৃতিত্বও আপনাদেরই।

কোয়ান্টাম বর্ষ ২৬ বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা সৃষ্টিতে আপনাদের নিরবচ্ছিন্ন তৎপরতায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অভিশাপ সম্পর্কে আজ শুধু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষই সচেতন হন নি, এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে! নড়ে উঠেছে ফেসবুকের ভিত। স্মার্টফোনরূপী শয়তানের বাক্স ব্যবহার এবং সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখতে বেড়েছে সচেতনতা। দেশ-বিদেশের বহু স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার এখন নিষিদ্ধ। এই অভাবনীয় রূপান্তরও আপনাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐকান্তিক প্রয়াসেরই ফল।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এই প্রথমবারের মতো সফল হয়েছে একবছরে লক্ষাধিক ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করতে। সম্মানিত রক্তদাতাদের আন্তরিক দানেই সম্ভব হয়েছে এ অসামান্য অর্জন। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

আমরা জানি, জীবন মানে ক্রমাগত এগিয়ে চলা। মানুষের আস্থা এখন আমাদের ওপর। তারা জানে কোয়ান্টাম শুদ্ধাচারের কথা বলে, কল্যাণের কথা বলে। শান্তির কথা বলে। বলে দেশকে ভালবাসার কথা। এ প্রেক্ষিতে আমরা চাই শান্তি শুদ্ধাচার ও ভালবাসার সূত্র সবার কাছে পৌঁছে দিতে। তাই 'নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম'–এই স্টিকারটি পৌঁছে দিতে হবে দেশের সকল তরুণের হাতে। পরিবারে ও সমাজে অনাবিল শান্তির জন্যে কারো সাথে দেখা হলেই বলতে হবে 'আসসালামু আলাইকুম'–আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

এখন থেকে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দিন। শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক আমাদের জীবন। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন!

[বর্ষায়নে গুরুজী ও মা-জীর শুভেচ্ছা বাণী]

মহীয়সী ভ্যালেরি টেইলর
মানবতার শক্তিতে মানুষের পাশে

ব্রিটিশ তরুণী ভ্যালেরি টেইলর। ২৫ বছর বয়সে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে তিনি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসেন ১৯৬৯ সালে, একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে। ১৫ মাস পর নিজ দেশে ফিরে গেলেও আবার এলেন ১৯৭১ সালে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তখন অসংখ্য যুদ্ধাহত মানুষ। সেই ক্রান্তিকালে তিনি অনুভব করলেন এদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ। ভ্যালেরি সিদ্ধান্ত নেন–এদেশের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন।

১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রশিক্ষিত ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দীর প্রচেষ্টায় গড়ে তোলেন *সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব প্যারালাইজড* বা পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র *(সিআরপি)*, যা আজ একটি আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রতিষ্ঠান। মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে বহু সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ প্রদত্ত অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, মহাত্মা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড, প্রিন্সেস ডায়ানা গোল্ড মেডেল, ডা. এম আর খান ও আনোয়ারা ট্রাস্ট গোল্ড মেডেল এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ৮ জানুয়ারি ২০১৮ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। তার বক্তব্যে উঠে আসে *সিআরপি*-র পথচলা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ।

নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন বার বার

সিআরপি-র শুরুটা ১৯৭৯ সালে–সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের পরিত্যক্ত সিমেন্ট গোডাউনে, চার জন রোগী নিয়ে। বছর কয়েক পরে হাসপাতালের প্রয়োজনে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। *সিআরপি* নিয়ে শুরু হয় ভ্যালেরির তপস্বীর জীবন। দুস্থ রোগীদের কেউ সহজে জায়গা না দিলেও তাদের কখনো ছেড়ে যান নি তিনি। বেশ কয়েকবার *সিআরপি*-কে বিভিন্ন স্থানে সরাতে হয়েছে। হাসপাতালের জিনিসপত্র, রোগী–এসব নিয়ে বার বার স্থান পরিবর্তন ছিল এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা।

তবে অদম্য ভ্যালেরি মনে করেন, এর মধ্য দিয়ে তারা একটু একটু করে *সিআরপি*-কে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দৃঢ় হয়েছেন। অবশেষে ১১ বছর পর ১৯৯০ সালে সাভারে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো *সিআরপি*-র কেন্দ্রীয় অফিস। বর্তমানে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেটসহ দেশের ১২টি জেলা শহরে এর শাখা রয়েছে।

সমমর্মিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ *সিআরপি*। ঠেলাগাড়ি চালক, রিকশা চালক, রাজমিস্ত্রীদের মতো দরিদ্র মানুষদের অনেকেই স্পাইনাল কর্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে এখানে আসে। অর্থাভাবের কারণে তাদেরকে বড় হাসপাতালগুলো ভর্তি করাতে চায় না। ভ্যালেরি অসহায় এ রোগীদের ঠাঁই দেন তার প্রতিষ্ঠানে। ধৈর্য, মমতা, যত্ন নিয়ে এদেরকে সুস্থ করে তোলা হয়। এরপর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবস্থা করা হয় তাদের পুনর্বাসনের।

মূলমন্ত্র : স্বনির্ভরতা

এখানকার রোগীদের চিকিৎসার জন্যে যে ধরনের অত্যাধুনিক সরঞ্জামের প্রয়োজন তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। হাতের কাছে যে কাঁচামাল পাওয়া যায়, তা দিয়েই অধিকাংশ চিকিৎসা-সরঞ্জাম তৈরি করেন *সিআরপি*-র কর্মীরা। কারণ এটা সাশ্রয়ী এবং রোগীদেরও প্রতিকূলতা জয় করতে শেখায়।

যেমন, হুইল চেয়ার বানানোর জন্যে তারা ব্যবহার করেন সাইকেলের চাকা, রিকশার যন্ত্রাংশ। রোগীরাও এগুলো তৈরি করতে শেখে। ফলে কখনো প্রয়োজন হলে যান্ত্রিক ত্রুটি নিজেরাই মেরামত করতে পারে। এ-ছাড়া দরিদ্র রোগীদের জন্যে রয়েছে বিদ্যুৎবিহীন মাটির বাড়িতে জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ। এখানে নিজের বাড়ির মতো বাঁশ, কাঠ, মাটির ঘরের দেয়াল ধরে তারা হাঁটতে শেখে, কাজ করতে শেখে। ফলে তারা যখন বাড়ি ফিরে যায়, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে সহজেই।

সেবাগ্রহীতারাই আজ সেবা দিচ্ছেন

সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরাও স্বাভাবিক কর্মময় জীবনযাপন করতে পারেন। *সিআরপি*-তে এসে সুস্থ হয়েছেন, এমন অনেকেই এখন এ প্রতিষ্ঠানেই কাজ করছেন। কেউ রিসিপশনিস্ট, কেউ অসুস্থদের থেরাপি দিচ্ছেন, কেউ অন্যদের সাহস জোগাচ্ছেন। নতুন রোগীদের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এই কর্মীরা যখন নিজের সুস্থতার কথা রোগীদের বলেন, শারীরিক অনুশীলনে নিয়ে যান, জীবনকে নতুন করে শুরু করতে বলেন, তখন রোগীরা অনেক বেশি উজ্জীবিত হয়।

বাংলাদেশে অর্ধশতাব্দীকাল কাজের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভ্যালেরি টেইলর বলেন, 'আমাদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ করে তোলার পর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের স্বাবলম্বী করে তোলা। এদের মধ্যে শিক্ষিতদের আমরা বলি–এসো, বাচ্চাদের লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করো। আর অক্ষরজ্ঞানশূন্য হলে তাদের বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শেখাই। এতে তারা নিজের ও পরিবারের দায়িত্ব নিতে

সিআরপি-তে সুস্থ হয়ে একজন রিসিপশনিস্ট হিসেবে কাজ করছেন

সক্ষম হন। সমাজের বোঝা হয়ে তাদের বেঁচে থাকতে হয় না। কাজের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের অর্থ নতুন করে খুঁজে পায়। আসলে কাজই আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে চলাচলে অক্ষম, অসহায়, ব্যথাক্লিষ্ট মানুষেরা যখন সিআরপি-তে আসেন, তখন তারা জীবন্মৃত। আমাদের এখান থেকে সেবা নিয়ে এ রোগীরা স্বাবলম্বী হয়ে বাড়ি ফিরে যান। এই রূপান্তর দেখাটা স্বর্গীয় আনন্দের। বার বার এই আনন্দের দেখা পেতেই আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। ঈশ্বর যদি আবার জন্ম দেন, তাহলে বাংলাদেশের মাটিতেই আমি কাজ করতে চাই।'

আমরা গর্বিত যে, এদেশে তাঁর জীবনভর ত্যাগ ও অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে ভ্যালেরি টেইলরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন।

হে তরুণ! আপনিও পারবেন

লুইস ব্রেইল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পড়ালেখার সুবিধার্থে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্রেইল পদ্ধতির জনক। তিনি নিজেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন। ১০ বছর বয়সে তার মা-বাবা তাকে ভর্তি করান 'রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ব্লাইন্ড ইয়োথ' নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেসময় অন্ধদের জন্যে পড়া ও লেখার প্রচলিত পদ্ধতি ফলপ্রসূ ছিল না মোটেও। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই পড়ালেখা শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলত।

লুইস ব্রেইল পড়ালেখার ফাঁকে কাজ শুরু করলেন এই মেথড নিয়ে। তার অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে ১৮২৪ সালে কার্যকর একটি মেথড হিসেবে আবিষ্কৃত হলো ব্রেইল পদ্ধতি। লুইস ব্রেইলের বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। তার কিশোর বয়সের একটি অনন্য উদ্যোগ আজও বিশ্বজুড়ে শিক্ষার আলো দিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের।

'কতটা কাজ করছি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কতটুকু ভালবাসা নিয়ে কাজটা করছি। কী পরিমাণ দিচ্ছি, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কতটা মমতা নিয়ে দান করছি।'–এই কথাগুলো বলেছেন মহীয়সী মাদার তেরেসা। রোগগ্রস্ত ও বঞ্চিতের পাশে দাঁড়ানোকেই সত্য বলে জেনেছেন তিনি, মানুষের ধর্মে-বর্ণে-জাতে ভেদাভেদ করেন নি কখনো।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি আত্মনিয়োগ করেন মানবতার সেবায়। শুরুটা ছিল খুব সাধারণ। কিন্তু তারুণ্যের একটি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মমতা ও করুণার আরেক নাম হয়ে উঠলেন মাদার তেরেসা। শুশ্রূষা পেল অসহায় লাখো মানুষ।

মানুষের কল্যাণে এমন পদক্ষেপগুলোই সময়কে অতিক্রম করেছে। আর যুগে যুগে তরুণেরা অগ্রণী হয়েছে অন্যের জন্যে কিছু করার প্রয়াসে।

তরুণরা পারে, কারণ–

- ☐ তারা বদলে দিতে চায়
- ☐ তারা সৃজনশীল ও উদ্যমী
- ☐ লেগে থাকতে পারে
- ☐ রয়েছে সংবেদনশীল মন
- ☐ নেই হারানোর ভয়, নেই ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা
- ☐ সবকিছু দেখতে পারে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে

এ বৈশিষ্ট্যগুলো কৈশোরে ও তারুণ্যে সহজাত। চেনা জগতকে সে বদলে দিতে চায়। সেইসাথে নিজের শক্তি-সামর্থ্য ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতাও বিরাজ করে এ সময়েই। উদ্যম, স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীলতা আর অভাবনীয় সব আইডিয়া তার নিত্যসঙ্গী। সে বড় স্বপ্ন দেখতে পারে এবং স্বপ্ন পূরণের জন্যে লেগে থাকতে পারে।

হারানোর ভয় তারুণ্যকে স্পর্শ করতে পারে খুব সামান্যই। তাই চারপাশে বঞ্চিত মানুষের কষ্টগুলো তাকে ভাবায়। যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে সে বিশ্বাস করতে পারে, যে-কোনো বাধা অতিক্রম করতে চায় প্রত্যাশা আর সাহস দিয়ে।

স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায় কেন?

কৈশোরে ও তারুণ্যে অধিকাংশ মানুষই স্বপ্ন দেখে দুস্থ-বঞ্চিতের জন্যে কিছু করার। কেউ স্কুল গড়তে চায়, কেউ হাসপাতাল, কেউ-বা বৃদ্ধাশ্রম। তরুণ মাত্রই স্বপ্ন দেখে–সমাজের অসঙ্গতিগুলো দূর করতে হবে, দেশটাকে গড়তে হবে।

ইতিহাস বলে, বড় স্বপ্নকে যারা অলীক-অসম্ভব মনে করেন নি, তারাই সফল ও স্মরণীয় হয়েছেন। অন্যদিকে সেই মানুষগুলো হারিয়ে যায়, যাদের জীবন শুধু নিজস্ব সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া কিংবা পেয়ে হারানোর সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তারুণ্যদীপ্ত বড় স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়, যখন মানুষ ভাবতে শুরু করে–যেদিন অনেক অর্থসম্পদ হবে, সেদিন ভালো কাজ করব। প্রতিষ্ঠা পাওয়া আর সম্পদ গড়ার বৃত্তে এভাবেই ইতি ঘটে হাজারো স্বপ্নের। অথচ মানুষের জন্যে কাজ করতে প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং সমমনা মানুষের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ থাকা।

বেরিয়ে আসতে হবে 'আমি'র বৃত্ত থেকে

একজন মানুষ তখনই দুঃখী, যখন সে শুধু নিজের দুঃখ নিয়েই চিন্তা করে আর ব্যাকুল হয় কেবল নিজের সুখের জন্যেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিই তার একাকীত্বের দ্বার উন্মোচন করে।

অথচ বেঁচে থাকাটা কখনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ডেনমার্কের হ্যাপিনেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণায় উঠে এসেছে–ভালো থাকার অন্যতম মাপকাঠি হলো পারস্পরিক সম্পর্কগুলো। যিনি পরিবার-পরিজনসহ চারপাশে সবার সাথে জীবনটা ভাগ করতে শেখেন, তিনি-ই সুখী।

সেইসাথে সমাজের কল্যাণে স্বেচ্ছাশ্রমে জড়িত থাকেন যারা, তাদের ভালো থাকার পরিমাণ অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। হ্যাপিনেস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান মেইক উইকিংস-এর ভাষ্য হলো–সাধারণভাবে মনে করা হয়, সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে আমরা অন্যের উপকার করি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, এ ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি সুফল পাই আমরা নিজেরা।

প্রথমত, এর মাধ্যমে আমরা সমমনা মানুষের সান্নিধ্য পাই। দ্বিতীয়ত, সেবার সূত্রে কিছু মানুষের সাথে গড়ে ওঠে এক ধরনের নিঃস্বার্থ সম্পর্ক, যা দেয় পরিতৃপ্তি। তৃতীয়ত, জীবনে যা-কিছু পেয়েছি, তার জন্যে আমরা আরো বেশি কৃতজ্ঞ হতে শিখি। কারণ সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের আরো অনেক মানুষের জীবন দেখার সুযোগ পাই খুব কাছ থেকে। *(রিডার্স ডাইজেস্ট, জুলাই ২০১৮)*

চাই সুদূরপ্রসারী মনছবি ও সঙ্ঘবদ্ধতা

মনছবি বা লক্ষ্যই হলো সাফল্যের বীজ। ভবিষ্যতের কল্পনা বা স্বপ্ন যখন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়, তা-ই পরিণত হয় মনছবিতে। একজন লক্ষ্যাভিসারী মানুষ জানেন তার করণীয় সম্পর্কে। তাই আপাত ব্যর্থতা তাকে হতাশায় নিমজ্জিত করতে পারে না; বরং নতুন কর্মপরিকল্পনা আর উদ্যমে তিনি শুরু করতে পারেন বার বার। এজন্যেই প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি আর কিছু পণ্যের মাঝে বন্দি থাকার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেইসাথে সঙ্ঘবদ্ধ থাকা প্রয়োজন ইতিবাচক ও আশাবাদী মানুষের সাথে।

তরুণরা সুখী তাদের অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে আর প্রবীণরা সুখী হন পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে। কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের গবেষক ড. লিসা এফ কার্ভার-এর মতে, 'তারুণ্যের ইতিবাচক দিক হলো, সে সাফল্যকে অনিবার্য মনে করে। কিন্তু প্রবীণরা জীবনের নানা উত্থান-পতন দেখেছেন। তাই তারা জানেন, প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই ভালো বিষয়গুলোর দেখা মেলে।'

তাই কোনো প্রতিকূলতায় মুষড়ে পড়া নয়, তা অতিক্রমে প্রয়োজন নিরলস প্রয়াস। এর সহায়ক শক্তি হলো ধ্যান বা মেডিটেশন।

ধ্যান ও সমমর্মিতায় বিকশিত হোক তারুণ্য

সাম্প্রতিক সময়ের পরিচিত এক নাম একাপল চ্যান্থাওং। থাইল্যান্ডে এক পাহাড়ের গুহায় ১২ জন কিশোর ফুটবলারসহ আটকে পড়েছিলেন আড়াই সপ্তাহের বেশি। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পরবর্তীতে হয়েছেন ফুটবলের কোচ।

অন্ধকার গুহা থেকে কিশোরদের উদ্ধার করার পর ডুবুরিরা সাক্ষ্য দিয়েছেন–কিশোরদের বাঁচাতে কোচ একাপল নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সঙ্গে যেটুকু খাবার ছিল, সবাইকে প্রতিদিন একটু একটু করে ভাগ করে দিয়েছেন। আর একাপল নিজে বেঁচে থেকেছেন পাহাড়ের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়া পানি পান করে। মনোবল ধরে রাখার জন্যে তিনি কিশোরদের মেডিটেশন চর্চা করিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে এসব কোনোকিছুই কারো অজানা নয়।

একাপল আজ সারাবিশ্বেই সমমর্মিতার এক অনন্য উদাহরণ। কোচ হিসেবে তিনি ছাত্রদের দিতে চেষ্টা করেছেন সর্বোচ্চটুকু। অন্ধকার গুহায় শুধু খেয়াল রাখাই নয়, ধ্যানের শিক্ষাও দিয়েছেন কিশোরদের, যা তাদের বিশ্বাসকে বলীয়ান করেছে।

বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্ম

জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে কিশোর-তরুণের সংখ্যা ১.৮ বিলিয়ন, যাদের বয়স ১০ থেকে ২৪ বছর *(৯ আগস্ট, ২০১৬)*। এ তরুণরা পড়ালেখা করছে, কাজ করছে আর খুঁজে ফিরছে জীবনের উদ্দেশ্য। গবেষণায় বলা হচ্ছে, পৃথিবী নামক গ্রহটি এর আগে কোনো যুগেই দেখে নি এ বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রাণ। তবে এরা বেড়ে উঠছে এমন এক সময়ে যখন পৃথিবী বাঁক বদলাচ্ছে–পুরনোর খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রহর গুনছে এক নতুন পৃথিবী।

সেই নতুন পৃথিবী যেন হয় এক মানবিক মহাসমাজ, যেখানে প্রত্যেকের একমাত্র পরিচয় হবে–সে মানুষ। যেখানে জাতিধর্মবর্ণের সীমারেখা ম্লান হয়ে যাবে সমমর্মিতার ধারায়।

হে তরুণ! এ দায়িত্ব আপনার। কারণ যুগে যুগে তরুণরাই দায়িত্ব নিয়েছে। আর জ্ঞানের আলোয় দূর করতে চেয়েছে সকল অন্ধকার। তাই জ্ঞানে-অভিজ্ঞানে নিজেকে গড়ে তুলুন আত্মপ্রত্যয়ী ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে অংশ নিন সৃষ্টির সেবায়।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ॥ গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

মেধা ও যোগ্যতা রয়েছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই। মেধাকে যিনি কাজে লাগাতে পারেন, তিনি জীবনে সফল হন এবং নিজের পরিচয় সৃষ্টি করেন। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, এজন্যে প্রয়োজন আত্মনিমগ্নতা বা মেডিটেশন চর্চা। আর মেডিটেশন শেখার সর্বাধুনিক ও সহজ প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম মেথড। শিক্ষা-ক্যারিয়ারে সাফল্য, ব্যবসায় উন্নতি, শারীরিক সুস্থতা এবং ব্যর্থতাকে জয় করে জীবনে নতুন শুরুর পথ দেখায় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। ২৬ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এ কোর্সের ৪৫৩টি ব্যাচ। অংশ নিয়েছেন লাখো মানুষ, পেয়েছেন আরাধ্য সাফল্য। এমনই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে দেয়া হলো–

কিশোর-তরুণদের অংশগ্রহণ দেখে ভালো লেগেছে

অধ্যাপক ডা. সজল মজুমদার

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার আগে ভাবছিলাম–এখানে এসে আমি কী শিখব? কিন্তু যা দেখেছি এবং শুনেছি, আমি বিস্মিত! এ কোর্সটিকে সময় ও নিয়মানুবর্তিতার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে। চার দিন ধরে দীর্ঘ সময়ের ক্লাসগুলো এতটা আনন্দদায়ক হতে পারে–আগে এমন অভিজ্ঞতা আমার হয় নি।

প্রায়শই আমরা দেশ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। কিন্তু কোর্সের আলোচনায় বার বার আশাবাদের কথা বলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ কোর্সে যারা মেডিটেশন শিখেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের মানসিক শক্তিটা তুলনামূলক বেশি হবে।

এখানে কিশোর-তরুণদের অংশগ্রহণ দেখে আমার ভালো লেগেছে। আগামীতে তারাই এ দেশের নেতৃত্ব দেবে। এ কোর্সে এসে তারা সময় এবং নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখছে। আশা করি, আমাদের দেশটি শান্তিময় এবং ন্যায়পরায়ণ দেশ হিসেবে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে।

[বিভাগীয় প্রধান, শিশু সার্জারি বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ৪৫৩ ব্যাচ]

আমি এখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি

ডা. সুলতানা রাজিয়া

ছোটবেলা থেকেই মা বলতেন, আমার মেয়েটার খুব জেদ। আমার স্বামীও প্রায়ই বলেন, তুমি মাথাটাকে ঠান্ডা করো। কিন্তু আমি তাদের কোনো কথাই শুনতাম না।

একদিন আমার সাত বছরের সন্তান আমাকে বলল, 'মা! তোমার এত রাগ কেন?' তার এ প্রশ্নটি আমাকে খুব ভাবিয়েছে। এই ছোট শিশুটিও আমাকে বুঝিয়ে দিল, মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। সেদিনই প্রথম অনুভব করলাম, এটা আমার বড় সমস্যা। এ থেকে বের হওয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে একটা পথ চাইলাম।

এর মধ্যেই পরিচিত একজন আমাকে কোয়ান্টামের কিছু বই পড়তে দিলেন। তারপর এক শুক্রবার কোয়ান্টামের সাদাকায়নে গেলাম এবং উপলব্ধি করলাম, এ কোর্সটি আমার করা উচিত।

যে রাগ আমি এতদিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি, তা আমি কোর্সের এই চার দিনে অনেকটাই পেরেছি। গুরুজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ এটা সম্ভব হয়েছে শুধু মেডিটেশনের জন্যেই।

[মেডিকেল অফিসার, ডক্টরস জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা। ৪৫৩ ব্যাচ]

তিন জন চিকিৎসকই বললেন– মেডিটেশন করুন

মো. কাজী রেজুয়ান হোসেন

পাঁচ বছর আগে আমি জানতে পারলাম, আমার মৃগীরোগ হয়েছে। ডাক্তারের একথা শুনে আমি মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়লাম। অসুস্থতার কারণে আমি সবসময় বিব্রত বোধ করতাম। পুকুরে নামা যাবে না, আগুনের সামনে যাওয়া যাবে না ইত্যাদি বিভিন্ন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হতো। চিকিৎসকের পরামর্শে আমাকে উচ্চমাত্রার ওষুধ খেতে হতো। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে পারি নি।

কোনো উপায় না পেয়ে চিকিৎসা করাতে ভারতে গেলাম। চেন্নাইয়ের বিখ্যাত তিন জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলাম। তারা প্রত্যেকেই বললেন, মেডিটেশন করুন। রোগটা আপনার শরীরে নয়, এটা আপনার মনের রোগ।

দেশে ফিরে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! চার দিন মেডিটেশন করে আমি অনেকটা সুস্থ অনুভব করছি। অথচ আগে আমার সবসময় মনে হতো, আমি অসুস্থ। এই নেতিচিন্তাও এখন আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি।

মেডিটেশনের এই শক্তির কথা আমি আমার ছাত্রদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে চাই। কারণ বর্তমান সময়ে তরুণদের হতাশা অনেক বেশি। পড়ালেখার পাশাপাশি তারা যদি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে, হতাশা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

[সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। ৪৫২ ব্যাচ]

এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা

ইঞ্জি. মো. আবদুল মালেক সিকদার

আমি পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। সারা জীবন অনেক অট্টালিকা তৈরি করেছি কিন্তু কখনো মনের বাড়ি তৈরি করতে শিখি নি। কোর্সে এসে মেডিটেশনে যখন মনের বাড়ি নির্মাণ করতে হলো, অনুভব করলাম–আমাদের অন্তর কত ঐশ্বর্যশালী!

মন এবং মনের শক্তি সম্পর্কে আমরা আজ অধিকাংশ মানুষ খুব সামান্যই জানি। শুধু দেহের ওপরে নয়, আমাদের আচার-আচরণ থেকে শুরু করে পুরো সমাজব্যবস্থার ওপর মনের প্রভাব রয়েছে। কোয়ান্টামে মনোদৈহিক বিষয়গুলোর গভীর অনুশীলন ও চর্চা দেখে আমার মনে হয়েছে, মানুষের মনোজগতে কোয়ান্টাম এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা।

সেইসাথে নিয়মিত দানে উৎসাহিত করা হচ্ছে এই কোর্সে। দানের অর্থ জমা রাখার জন্যে সবার কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে একটি করে মাটির ব্যাংক। আর এ অর্থে বান্দরবান লামায় আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে হাজারো বঞ্চিত শিশু। আমি বলব, এটা আসলে ভালবাসার ব্যাংক।

[এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার (অব.), গণপূর্ত অধিদপ্তর, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। ৪৫৩ ব্যাচ]

আমি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারব

মোছাম্মত মৌসুমী

দারিদ্র্যের কারণে ছোটবেলা থেকেই আমাকে অন্যের বাসায় কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আমার হাতে-পায়ে সবসময় খুব ব্যথা হতো। এ কারণে আমি কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারতাম না, শুধু ঘুম পেত। কাজ করতে করতে প্রায়ই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

আমার এক বড় আপার উৎসাহে আমি কোর্সে এসেছি। কারণ আমি আমার জীবনটাকে পরিবর্তন করতে চাই। তিনি আমাকে কোয়ান্টামের মাটির ব্যাংকে দানের কথা বলেছেন। প্রতিদিন দান করার ফলে আমি অনেক উপকার পেয়েছি।

কোর্সে মেডিটেশন করে আমার অতিরিক্ত ঘুমের সমস্যাটি আর নেই। হাত-পায়ের ব্যথাও দূর হয়েছে। আগে কোনোকিছুই আমার ভালো লাগত না। এ সমস্যাও এখন নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার দুঃখের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে আমি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারব।

এতদিন ভাবতাম, আমি এতিম, অসহায়। কিন্তু এখানে এসে আমি বিশাল এক পরিবার পেয়েছি, তা হলো কোয়ান্টাম পরিবার।

[গৃহকর্মী। ৪৫৩ ব্যাচ]

এ জ্ঞান আমি রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগাব

ডা. পারুল আক্তার

একজন গাইনি বিশেষজ্ঞ হওয়ায় আমাকে প্রায়ই রোগীদের করুণ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি আমি রোগীর সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করার চেষ্টা করি। কিন্তু একসময় খেয়াল করলাম, রোগীদের সমস্যার ভেতর ডুব দিতে আমার আর ভালো লাগছিল না। দিন দিন আমি রোগী দেখাও কমিয়ে দিতে লাগলাম।

এ সমস্যার পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। দুমাস আগে আমি পায়ে অনেক ব্যথা পেয়েছিলাম। একমাস বিশ্রামে থেকেছি। একটু সুস্থ হলেও কিছুদিন পর ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল। এতদিনের কর্মব্যস্ত ও ইতিবাচক জীবনে একটা ধাক্কা খেলাম। দৈনন্দিন কাজগুলো জমে গেল। সবকিছু এলোমেলো লাগছিল। ব্লাড প্রেশারও বেড়ে গেল। বার বার আমি ডাক্তারের কাছে যেতে শুরু করলাম।

আমার এমন অবস্থা দেখে পরিচিত এক সিনিয়র ডাক্তার মেডিটেশন করার পরামর্শ দিলেন। কোর্সে এসে দেখলাম, গভীর ও জটিল জীবনদর্শনগুলো এখানে খুব সহজ করে বলা হয়েছে।

এখান থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলাম, তা আমাকে মনের দিক থেকে আরো শক্তিমান করবে। এ জ্ঞান আমি পরিবার-আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মী এবং রোগীদের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারব। এ কোর্সে এসে আমি অভিভূত। আমি এখানে আবার আসতে চাই।

[সহকারী অধ্যাপক, গাইনি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। ৪৫৩ ব্যাচ]

ডাক্তার কন্যার উৎসাহে কোর্সে এসেছি

দিলরুবা তাহের

প্রায় ২০ বছর ধরে আমি মাথাব্যথায় ভুগছিলাম। এটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তেমন কোনো লাভ হয় নি।

আমার মেয়ে একজন ডাক্তার। তার উৎসাহে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসেছি। সে সবসময় আমাকে বলেছে, মেডিটেশন করলে আমি সুস্থ হয়ে যাব। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে গেল।

গত তিন বছর ধরে আমি রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারি নি। কোর্সে মেডিটেশন করে আমার ঘুমের সমস্যা দূর হয়েছে। মাথাব্যথাও আর অনুভব করছি না। আমি এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশ উৎফুল্ল বোধ করছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

[গৃহিণী। ৪৫৩ ব্যাচ]

বার্ধক্য ও অবসরের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির পথ পেয়েছি

আহসান উল্লাহ

গত মাসে আমি পেশাজীবন থেকে অবসর নিয়েছি। আমি একজন কর্মপ্রেমী মানুষ। আমার জন্যে অবসর নেয়াটা তাই অর্ধেক মারা যাওয়ার সমান। কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করলেন। তার সাথেই আমি প্রথম সাদাকায়নে গেলাম। সেখানে মেডিটেশন করে এ কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ হলাম।

এখানে আসার পরে জীবনযাপনের বিজ্ঞান সম্পর্কে আমি জানলাম। ৬৬ বছর বয়সে এসে যেন জীবনে নতুন উদ্যম পেলাম। বার্ধক্য এবং অবসরের নিঃসঙ্গতা এখন আর আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এ-ছাড়া কোয়ান্টামের মতো একটি বড় পরিবার আমি পেয়েছি, যেখানে অবসরের সময়গুলো আমি কাজে লাগাতে পারব।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি গুরুজীকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই। কারণ মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মত্যাগের স্মরণে তিনি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি উৎসর্গ করেছেন।

[মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। ৪৫৩ ব্যাচ]

স্মার্টফোন বিক্রির টাকায় এ কোর্সে ভর্তি হলাম

মো. মোছাদ্দেক হোসেন

ছয় মাস আগে আমার বৃত্তির টাকা দিয়ে আমি একটি স্মার্টফোন কিনি। তখন থেকেই আমার পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যেতে শুরু করল। পড়তে বসলেই বিভিন্ন চিন্তা মাথায় আসত, এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করতাম। সবসময় শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করতে ইচ্ছা হতো।

সারাদিন ফেসবুক, ইউটিউব অথবা গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। দিনে প্রায় ১২ ঘণ্টাই আমি স্মার্টফোনের পেছনে ব্যয় করছিলাম। গত ছয় মাস আমি রাত দুটার আগে কখনো ঘুমাতে পারি নি। একদিন হঠাৎ মনে হলো, আমি এসব কী করছি!

ভাবলাম এই স্মার্টফোনই আমার যত সমস্যা সৃষ্টির কারণ। তাই এটা দিয়েই আমি সমাধান বের করব। স্মার্টফোনটি বিক্রি করে দিলাম। সেই টাকা দিয়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ভর্তি হলাম। দুই বছর আগে আমার ভাইয়ের কাছে এ কোর্সের কথা শুনেছিলাম।

কোর্সে এসে ভার্চুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে আরো সচেতন হয়েছি। আসলেই স্মার্টফোন মানুষের ঘুম কেড়ে নেয়। এ-ছাড়া মেডিটেশন করে আমার নয় বছরের মাইগ্রেনের সমস্যাও দূর হয়েছে।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ধাপ সাতগাড়া মডেল কামিল মাদ্রাসা, রংপুর। ৪৫৩ ব্যাচ]

কোয়ান্টামের বাণী ছড়িয়ে পড়লে দেশ সমৃদ্ধ হবে

শাহ আলমগীর

যারা আমাকে এ কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। এখানে আমার আরো আগেই আসা উচিত ছিল।

কোর্সে বলা হয়েছে, জাতি হিসেবে আমাদের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা নেতিবাচক হয়ে গেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। কোয়ান্টাম যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা সমাজের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে আমাদের কোনো হতাশা থাকবে না।

পৃথিবীতে সাতশ কোটি মানুষের বসবাস। বেশিরভাগ মানুষই শুধু পেতে চায়। যার এক লক্ষ আছে সে এক কোটি চায়। যার এক কোটি আছে সে চায় একশ কোটি। হাজার কোটি হওয়ার পরেও বলে আমার লাখো কোটি দরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কোনো অর্থসম্পদ নিয়ে যেতে পারে না।

খুব অল্প মানুষই সমাজ ও দেশ নিয়ে ভাবেন। আমরা সমাজের যত রূপান্তর দেখেছি, তা সেই অল্প সংখ্যক মানুষই করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, গুরুজী তাদের একজন এবং তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তা করে যাচ্ছেন। কোয়ান্টামের বাণী যত ছড়িয়ে পড়বে আমাদের দেশ তত সমৃদ্ধ হবে এবং সামনে এগিয়ে যাবে।

[মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। ৪৫২ ব্যাচ]

নিজেকে ভালবাসতে শিখলাম

আফরোজা মুন্নী

২০১২ সালে আমার ব্রেন টিউমার অপারেশন হয়। এর দুই বছর পর আমাকে রেডিওথেরাপি নিতে হলো এবং ২০১৭ সালে কেমোথেরাপি নিলাম। অসুস্থ হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, আমার জীবন আর আগের মতো নেই। বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

গত দেড় বছর হলো চাকরিও করছি না। লেখালেখি পছন্দ করি বলে কষ্টের কথাগুলোই শুধু লিখতাম। মারা যাওয়ার আগেই চারপাশের মানুষের নেতিবাচক কথা আমাকে মেরে ফেলেছিল।

কোর্সে এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। আসলেই মানুষের কথা শুনে কোনো লাভ নেই। এখানে এসে আমি নিজেকে ভালবাসতে শিখেছি। বিশ্বাস করতে পারছি, আমার জীবন আমি আবার গড়তে পারব। এখন থেকে কোনো নেতিবাচকতাকে আর প্রশ্রয় দেবো না। আমি উপলব্ধি করেছি, মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। কারণ সবাইকে মারা যেতে হবে। পৃথিবীতে আমি যদি ভালো কিছু করে যেতে পারি, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা।

[লেখিকা। ৪৫৩ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *নিজেকে ইচ্ছামতো চালাতে পারি না কেন?*

উত্তর : ইচ্ছামতো চালাবেন কেন? নিজেকে নিয়মমতো চালাবেন সবসময়। স্বেচ্ছাচারিতা জীবনে কোনো কল্যাণ নিয়ে আসে না। কারণ স্বেচ্ছাচারী মানুষের কোনো দায়িত্বজ্ঞান বা জবাবদিহিতা থাকে না। নিজের প্রতিও না, অন্যের প্রতিও না। সবসময় মনে রাখবেন, জীবনটাকে ইচ্ছামতো চালাতে গেলে আপনি হোঁচট খাবেন, ভুল করবেন। যে কাজে কল্যাণ আছে, সেই কাজগুলো করবেন।

আর স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ এবং কল্যাণকর হয়, যখন এর সাথে কোনো লক্ষ্য থাকে এবং জবাবদিহিতা থাকে। তাই কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুশীলন করুন। নিজের ও অন্যের কল্যাণে সুশৃঙ্খল ও স্বাধীনভাবে কাজ করুন।

প্রশ্ন : *ছোটবেলা থেকেই আমি খুব নার্ভাস প্রকৃতির। ক্রিকেট খেলায় যখন ব্যাটিং করতে নামতাম, খুব জোরে বুক ধুকধুক শুরু হতো। শরীর নিস্তেজ হয়ে যেত, খেলতেই পারতাম না। এরপর জেদ করে আড়াই বছর খেলেছি কিন্তু নার্ভাসনেস দূর হয় নি। শুধু খেলায় নয়, যখন কারো সাথে কোনো ঝামেলা হতো, তা সমাধানের জন্যে যখন বিচার বসত তখনও এত নার্ভাস হয়ে পড়তাম যে, কথাই বলতে পারতাম না। এমন অনেক উদাহরণ আছে। এ-ছাড়া আছে প্রচণ্ড মানসিক দুর্বলতা। কোনো ভুল করলে সেটা নিয়ে সারাক্ষণ অনুতাপ করতে থাকি। এ সমস্যাগুলো কি ভালো হবে? ভালো হওয়ার জন্যে কী করতে হবে?*

উত্তর : ভালো হওয়ার জন্যে লেগে থাকতে হবে, ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্যাগুলো দূর হয়। সবচেয়ে ভালো হয়–আপনি যদি ৪০ দিনের জন্যে লামায় খেদমতায়নে চলে যান। এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হলে তো খুব ভালো, তা না হলে আরো ৪০ দিন।

কারণ ওখানে আপনি এত ব্যস্ত থাকবেন যে, নার্ভাস হওয়ার কোনো সুযোগই পাবেন না। আর দীর্ঘদিন ধরে নার্ভাসনেস ও মানসিক দুর্বলতার মধ্যে থাকতে থাকতে আপনার মনে ও চিন্তা-চেতনায় এক ধরনের জট পাকিয়ে গেছে। এই জট খোলার জন্যে মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনচর্চা আপনাকে সাহায্য করবে। এর পাশাপাশি কিছুদিন একটি নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক শারীরিক পরিশ্রম আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। জীবনে নতুন ছন্দ নিয়ে আসবে।

সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হবে ইতিবাচক অনুরণন। তাই খেদমতায়ন থেকে ফেরার পরও নিয়মিত মেডিটেশন, কোয়ান্টাম ইয়োগা ও অটোসাজেশন চর্চাসহ *(আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব)* সুস্থ জীবনযাপন অব্যাহত রাখবেন। নার্ভাসনেস ও মানসিক দুর্বলতা কেটে যাবে ইনশাল্লাহ।

আর নার্ভাস হবেন কেন? কেন এত ভয় পাবেন? বড়জোর মারা যাবেন, এই তো! আর কী হবে? মারা তো একদিন যাবেনই। মৃত্যু যখন আসার তখন সে আসবেই। যেখানে মৃত্যু লেখা আছে, সেখানেই মৃত্যু হবে। অতএব ভয় কীসের? মনে রাখবেন, একজন ধ্যানী সবসময় আত্মবিশ্বাসী। তিনি তার লক্ষ্যটা জানেন। আত্মবিশ্বাসী ও লক্ষ্য-সচেতন মানুষ কখনো ভয় পান না, নার্ভাস হন না।

প্রশ্ন : *জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে এবং প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে যে সাহস বিশ্বাস ধৈর্য দরকার, সেটা কীভাবে বাড়াতে পারি?*

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন করবেন এবং সৎসঙ্গে একাত্ম থাকবেন। এই সঙ্ঘবদ্ধতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ কেন শোষিত, লাঞ্ছিত ও ভীতসন্ত্রস্ত? কারণ তারা বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ নয়।

আমরা জানি, জ্ঞানই শক্তি। আসলে জ্ঞান কখনো শক্তি হতে পারে না, যদি না তা অন্যের সাথে শেয়ার করা হয় এবং অনুশীলন করা হয়। আর এটা সম্ভব সঙ্ঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। সঙ্ঘবদ্ধতা আপনার সাহস, বিশ্বাস ও ধৈর্য বাড়াবে। এর পথ ধরেই আপনি জীবন ও বাস্তবতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং অতিক্রম করবেন যাবতীয় প্রতিকূলতা। আর যদি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন থাকেন, তাহলে সাহস বা ধৈর্য–কোনোটাই আপনার বাড়বে না। আপনি হারিয়ে যাবেন। হতাশায় ডুবে যাবেন।

তাই যারা সত্যের পথে শান্তির পথে মুক্তির পথে ভালো পথে চলতে চান, তাদের সবসময় সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। সম্পৃক্ত থাকতে হবে সঙ্ঘের সাথে। এজন্যে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে যাবেন, জ্ঞান ও উপলব্ধি বিনিময় করবেন। যা সত্য বলে জানলেন, সেটা চারপাশের মানুষের কাছে বলবেন। তখন জানাটা আপনার জন্যে শক্তি হবে।

প্রশ্ন : *আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার কাছ থেকে ভালবাসার বিনিময়ে প্রতারণা পেয়েছি। আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষের কাছে টাকা দিয়ে ধোঁকা খেয়েছি। ভালবাসা ও টাকা, দুটো থেকেই বিশ্বাসঘাতকতা পেয়েছি। মাঝে মাঝে জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো লাগে, তবু হাল ছাড়ি নি। আমার মা বলেন, নিরাশ হয়ো না, যা হয়েছে হয়তো তোমার ভালোর জন্যে হয়েছে। কথাটা কি ঠিক?*

উত্তর : অবশ্যই ঠিক। আপনার মায়ের সাথে আমি একমত–যা হয়েছে ভালোর জন্যে হয়েছে। যে পাখি উড়ে গেছে সেটা আপনার না। বিয়ের পরে যদি চলে যেত তখন তো আরো বেশি কষ্ট পেতেন।

আর এ ধরনের বোকামি করবেন না। প্রেমিককে টাকা দেয়ার মতো আহাম্মক কোনো মহিলা হবেন না। যে ছেলে কোনো মেয়ের কাছে টাকা ধার চায়, সে আসলে পুরুষ নয়। বুঝবেন, সে প্রথম সুযোগেই আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। টাকা পেয়ে আর আপনার দিকে তাকিয়ে লাভটা কী? সে তখন আরেকজনের পেছনে ছুটবে। অতএব কোনো মেয়ে প্রেমে পড়ে কাউকে আর্থিক সাহায্য করবেন না। তাহলে টাকাও যাবে, প্রেমও যাবে।

আবার এক ধরনের ছেলেদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে–তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এবং বড়লোকের মেয়ে খোঁজে। তারপর নিজের দুর্দশার কথা বলে। এদিকে মেয়ে তো ধনীর দুলালি, মা-বাবার টাকা দিতে কোনো কষ্ট নেই। কারণ এগুলো তার কষ্টার্জিত টাকা নয়।

তাই অর্থনৈতিক লেনদেন বা নির্ভরতা শুরু হলেই বুঝবেন আসলে এটা পছন্দ না, আপনি হলেন তার টাকার উৎস। সবসময় মনে রাখবেন, প্রতারণা করা অপরাধ কিন্তু প্রতারিত হওয়া অসম্মানের। তাই সচেতন থাকবেন, নিজের সম্মান বজায় রাখবেন। আবেগের বশে আহাম্মক হবেন না। আমরা দোয়া করি যেন আপনি কষ্টগুলো ভুলে যেতে পারেন।

প্রশ্ন : *অনেকদিন ধরে আমার মনে একটি সংশয় কাজ করছে। মেডিটেশন শেষে বলা হয়–'আমি এক অনন্য মানুষ। আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম। সারা পৃথিবী আমার। যেখানে দরকার সেখানে যাব।' এই প্রত্যয়ন করার সময় আমার মনে হয়–এই পৃথিবী তো আমার না, এটা সৃষ্টিকর্তার। তাহলে আমি কি শিরক করছি?*

উত্তর : শিরক সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে কত সংকীর্ণ তা এ প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়। এই যে আমরা বলি–আমার গাড়ি আমার বাড়ি, কেউ তো বলে না যে, সৃষ্টিকর্তার বাড়ি! গাড়ি বাড়ি যদি আপনার হতে পারে, তাহলে পৃথিবীটা আপনার হতে অসুবিধা কী?

কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা খুব পরিষ্কার বলেছেন, *'নামাজ শেষ হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধান করো।...' (সূরা জুমআ, আয়াত ১০)* জমিন বলতে শুধু আপনার ধানক্ষেতটুকু না, জমিন বলতে এখানে পুরো পৃথিবীকে বোঝায়। অর্থাৎ অনুগ্রহ-সম্পদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পুরো পৃথিবীই আপনার।

কারণ আল্লাহ মানুষকে ছড়িয়ে পড়তে বলেছেন। যদি তা না হতো, তাহলে আল্লাহ এই নির্দেশ দিতেন না। যখন আপনি আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়ছেন এবং বলছেন–সারা পৃথিবী আমার, তখন আপনি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন। সেইসাথে মনটাকে বড় করছেন।

তবে কী উদ্দেশ্যে আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়বেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। 'সারা পৃথিবী আমার' বলে আপনি কি পুঁজিপতিদের মতো হবেন? কয়েকজন মিলে পৃথিবীর অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবেন? অর্থাৎ আপনি শোষণ করবেন নাকি মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার থাকতে হবে। কারণ শোষণের মধ্য দিয়ে অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা আসতে পারে কিন্তু প্রশান্তি আসে না।

মনে রাখবেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করার নামই হচ্ছে শিরক। কারণ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো ওপর নির্ভর করেন না। কোরআনের বাংলা মর্মবাণী পড়বেন এবং বিষয়গুলো সম্বন্ধে নিজের ধারণাটা স্পষ্ট করবেন। তাহলে সত্যটা আপনি বুঝতে পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

ভালো জিনিসকে আমি পুরোপুরি গ্রহণ করব। তাহলেই আমি এ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারব।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে ব্লাড ক্যাম্প

১৫টি ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ ৪৯৭ ব্যাগ রক্ত

১৮ ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্ট দিবস উপলক্ষে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় একটি ব্লাড ক্যাম্প। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন।

১০ ডিসেম্বর ধানমণ্ডি আইডিয়াল কলেজে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় দিনব্যাপী রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এতে রক্তদান করেন ৬৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ব্লাড ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি।

১৯ ডিসেম্বর এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল)-এর প্রধান কার্যালয়ে (তেজগাঁও) ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. এহসানুল কবির।

১৫ ডিসেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজে অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্পে রক্তদান করেন কলেজের ৯০ জন শিক্ষার্থী। উল্লেখ্য, এদের অধিকাংশই জীবনে প্রথমবারের মতো রক্ত দেন। ব্লাড ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবু সাইদ।

দেশজুড়ে ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাত

দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত ১২টি ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাতে অংশ নিয়েছেন ১২ সহস্রাধিক মানুষ

২৩ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত গুরুজীর পরিচালনায় দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ধ্যানসন্ধ্যা ও ধ্যানপ্রভাত। ১২টি আয়োজনে অংশ নিয়েছেন কোয়ান্টাম পরিবারের ১২ সহস্রাধিক সদস্য। এবারের মূল বিষয় ছিল : *সুখী জীবনের পথে বাধা ও উত্তরণের প্রক্রিয়া*। এতে অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করে তোলা হয়েছে আগ্রাসী পণ্যদাসত্ব, ক্রেডিট কার্ড, ঋণ ও কিস্তির ফাঁদ সম্পর্কে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে এসেছে ২০০ নতুন শিশু

বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষালয় বান্দরবান, লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। ক্রীড়ায় পর পর দুই বছর দেশসেরা, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবস প্যারেডে পর পর চার বছর প্রথম স্থান অর্জন করেছে এই প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি পড়াশোনায়ও ধারাবাহিকভাবে ভালো করছে এর শিক্ষার্থীরা। এবছর বুয়েট, সরকারি মেডিকেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে কসমো কলেজের ২৩ জন শিক্ষার্থী।

প্রতি বছর সারা দেশ থেকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় এ স্কুলে। উদারনৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আবহে এ শিশুরাই হয়ে ওঠে মানব সম্পদ। এবছর এমনই আরো ২০০ শিশু এখানে ভর্তি হয়েছে; যাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

এতিমান ফান্ড ॥ আপনিও এগিয়ে আসুন

দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আলোকিত মানুষ হওয়ার সুযোগ দিতে চায় কোয়ান্টাম। এতে অংশ নিন আপনিও। আপনার দানে এই শিশুরা গড়বে আলোকিত জীবন। এখানে একজন শিশুর জন্যে প্রতি মাসে খরচ হয় প্রায় আট হাজার টাকা। আপনার সামর্থ্য অনুসারে এক বা একাধিক শিশুর দায়িত্ব নিন। কয়েকজন মিলেও এ দায়িত্ব নিতে পারেন।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন : ০২-৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

আগে জানুন, আপনার দানের অর্থে কী হচ্ছে

আমাদের দেশে যাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়, এদের প্রায় সবাই পেশাদার ভিক্ষুক। তাদের সুনিপুণ অভিনয়ে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাই সচেতন হতে হবে। কারণ আপনার দানের অর্থ কী কাজে লাগছে, সেই জবাবদিহিতাও আপনার ওপরই বর্তায়।

ধনাঢ্য ভিক্ষুক

নাম হাজী কামাল শেখ। হাতে ব্যান্ডেজ। রক্ত মাখানো। রাজধানীর রমনা পার্কের সামনে বসে ভিক্ষা করছিলেন। অনেকেই তাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার হাতে আসলে কিছুই হয় নি। পেটের দায়ে হাতে ব্যান্ডেজ করে লাল আলতা রং মেখে ভিক্ষা করছেন।

আগে হাত পেতে ভিক্ষা করতেন। আয় ভালো হতো না। তখন তার দৈনিক আয় ছিল ২০০-৩০০ টাকা। ব্যান্ডেজ লাগানোর পরই ভাগ্য ফিরল। প্রতিদিন অনায়াসে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা আয় হয়। নতুন নতুন এলাকায় গেলে আয় বেড়ে যায়। এক এলাকায় এক মাসের বেশি থাকেন না।

তার বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে। বউ-ছেলেমেয়ে সব গ্রামেই থাকেন। তার চার স্ত্রী। গ্রামের এক বাড়িতেই থাকেন চার জন। ভিক্ষা করে প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পাঠান। আর বাকি টাকা তিনি নিজের কাছেই রাখেন। চার ঘরে ১০ সন্তান। ছয় ছেলে, চার মেয়ে। এর মধ্যে চার ছেলে বিদেশে। দুই ছেলে গ্রামেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। চার মেয়েরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ভিক্ষা করায় এ পেশা ছাড়তে পারছেন না তিনি।

তার স্বপ্ন ভিক্ষা করেই ঢাকা শহরে বাড়ি করবেন। কারণ তাকে যিনি ভিক্ষা করে অধিক উপার্জনের পথ দেখিয়েছেন, তার এখন ঢাকা শহরে একাধিক বাড়ি। তাই হাজী কামাল শেখ চান ঢাকা শহরে তার প্রতিটি ছেলের নামে একটি করে ফ্ল্যাট থাকবে। কারণ সোনাইমুড়ীর এক ভিখারি ভিক্ষা করে ধনী হয়ে ইউপি মেম্বার পদে নির্বাচন করেছেন। তিনি দুবার হজ করেছেন। তাই নামের আগে হাজী। দুবারই ভিক্ষার টাকায়।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, বাংলাদেশে ভিক্ষুকের আয় নির্ভর করে তাদের শারীরিক আবেদন ও অভিনয়ের দক্ষতার ওপর। আপনি কোনো ভিক্ষুককে দেখবেন না রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডাল-ভাত খাচ্ছে। তারা মুরগি বা গরু ছাড়া ভাত খায় না। আর আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ টাকা বাঁচানোর জন্যে কখনো কখনো ভাত না খেয়ে রুটি-সবজি খাই। যারা রিকশা চালক বা দিনমজুর, তারা পাঁচ টাকার রুটি আর পাঁচ টাকার এক কাপ চা খেয়ে সারাদিন রিকশা চালান।

ভিক্ষাবৃত্তি হলো বিনা পুঁজিতে ব্যবসা, আর কেউ যদি হাজী কামালের মতো ব্যান্ডেজ আর লাল আলতায় পুঁজি বিনিয়োগ করেন, তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

তথ্যমতে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ ভিক্ষুক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করেন। সর্বনিম্ন দুই মাস থেকে দুই বছর পর নির্দিষ্ট এলাকা পরিবর্তন করেন।

তথ্যসূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
Phone : 9341441, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আমি এক অনন্য মানুষ আমরা এক মহান জাতি

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

কোয়ান্টাম স্টল ও মাসব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অষ্টম বারের মতো অংশ নিচ্ছে কোয়ান্টাম। স্টল নং-১০০/৩৭, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ। সেইসাথে মেলার মূল প্রাঙ্গণ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে চলবে মাসব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প।

প্রতি বছরের মতো গ্রন্থমেলাকে কেন্দ্র করে এবারও গ্রহণ করা হয়েছে নানা প্রস্তুতি। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে সেন্টার শাখা সেলের সর্বস্তরের সদস্যরা অংশ নেবেন কোয়ান্টাম প্রকাশনার ক্যাম্পেইনে। পাশাপাশি তারা মেলায় আগতদের মাঝে বিতরণ করবেন ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা, দেশপ্রেম ও সালামের বাণী-সম্বলিত স্টিকার। সবার কাছে পৌঁছে দেবেন সুখী জীবনের চিরন্তন বার্তা।

এ-ছাড়াও মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে রক্তদানের মতো পুণ্যময় একটি কাজে অংশ নেয়ার আহ্বান জানাবেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা।

কর্মসূচি ॥ ফেব্রুয়ারি

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-২
৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি । কাকরাইল

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন
৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি । কাকরাইল

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি । মিরপুর

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি । বনশ্রী

হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন
২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি । কাকরাইল

কোয়ান্টাম ইয়োগা ওরিয়েন্টেশন
২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি
পুরুষদের ব্যাচ : কাকরাইল
মহিলাদের ব্যাচ : শান্তিনগর

লামা কোয়ান্টায়ন
গ্রাজুয়েট : ৮-১০ ফেব্রুয়ারি
প্রো-মাস্টার : ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৫৫ ব্যাচ ॥ ঢাকা
১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি
স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

৪৫৬ ব্যাচ ॥ চট্টগ্রাম
৮, ৯, ১০ ও ১১ মার্চ
স্থান : হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু, চট্টগ্রাম

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

নিজেকে ভালবাসা থেকেই সকল ভালবাসার শুরু

একজন মানুষের মূল শক্তি হচ্ছে তার মমতা। এই মমতা যার কাছে পায়, মানুষ তাকেই ভালবাসে। সেই মানুষই থেকে যায় সবার স্মৃতিতে। সবাইকে মমতার দৃষ্টিতে দেখার জন্যে সর্বপ্রথম চাই নিজের প্রতি মমতা। নিজেকে যে ভালবাসে না, সে কাউকেই ভালবাসতে পারে না। আসলে নিজেকে ভালবাসা থেকেই শুরু সকল ভালবাসার। নিজের প্রতি ভালবাসা না থাকলে নিজের গুণগুলোকেও বিকশিত করা যায় না। আর মহান কিছু করার লক্ষ্যটাকেও একজন মানুষ তখনই লালন করতে পারে, যখন সে নিজেকে ভালবাসে ও নিজের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারে।

গত ৪ ও ৫ জানুয়ারি লামার কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নেয়া চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আলোচনায় একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। উল্লেখ্য, কোয়ান্টামের ২৭ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এ ক্যাম্পে অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের ১২৯ জন চিকিৎসক।

> মহান কিছু করার লক্ষ্যটাকে একজন মানুষ তখনই লালন করতে পারে, যখন সে নিজেকে ভালবাসে ও নিজের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারে।

দুর্গম জনপদে বঞ্চিত মানুষকে সেবা দেয়ার জন্যে চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে গুরুজী বলেন, প্রতি বছর এ মেডিকেল ক্যাম্পে দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আসেন একটু সেবা পাওয়ার আশায়। তারা লোকমুখে শুনেছেন, এখানে যে চিকিৎসকরা আসেন, তারা রোগীকে দেখেন মমতা ও যত্ন নিয়ে। আসলে একজন চিকিৎসক সৃষ্টির সেবায় যে অবদান রাখতে পারেন তা অতুলনীয়। তাই নিঃসন্দেহে আপনারা ভাগ্যবান– প্রভু এমন একটি মহান পেশার সাথে আপনাদের সংযুক্ত করেছেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, এবারের ক্যাম্পে ডাক্তার যারা এসেছেন, তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। নারীরা পিছিয়ে থাকলে কোনো জাতি এগোতে পারে না। কোয়ান্টাম শুরু থেকেই এটি বিশ্বাস করেছে। আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা মানুষ। এ-ক্ষেত্রে জাতিধর্মবর্ণ বিবেচ্য নয়। আমরা কখনো নারী-পুরুষে ভেদাভেদ করি নি। কারণ মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার কর্মে। মানুষ স্মরণীয় হয়ে থাকে তার কর্মের জন্যেই।

আর কর্মের বিচারে আমাদের সবার জীবনেই ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ভালোটাকে না দেখে ভুলের দিকটাই বরং বেশি দেখি; কিন্তু ভুলটা যে-রকম একটি ঘটনা, ভালোটাও একটি ঘটনা। তাই জীবনে ভালো ঘটনাকে আমরা যত মনে করব, তত আমাদের ভালোত্ব বিকশিত হবে এবং ভেতরের শক্তি জাগ্রত হবে। সম্ভব হবে লক্ষ্যপানে অগ্রসর হওয়া।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভালবাসা ও মমতাই সকল সুখ ও তৃপ্তির উৎস। এ মমতা লালন করতে হবে পরিবারের প্রতি, চারপাশের সবার প্রতি। সেইসাথে জীবনের নানা পর্যায়ে যত মানুষের কাছে আমরা ঋণী, সবার কল্যাণ কামনা করতে হবে। সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে সমমর্মিতা ও শান্তির অনুরণন। তাহলেই আমরা পারব ব্যক্তিজীবনে ও জাতীয় জীবনে যাবতীয় বাধা পেরিয়ে সফলতা ও সার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতে।

মহাপ্রয়াণ

হৃদয় রঞ্জন বিশী

স্বর্গীয় হৃদয় রঞ্জন বিশী ছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। ১৭ জানুয়ারি মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাকে সমাধিস্থ করা হয় লামার কোয়ান্টামমে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি অংশ নেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। তিনি ১৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট এবং দ্বিতীয় ব্যাচের প্রো-মাস্টার। কোর্স সম্পন্ন করার পর নিজেকে কোয়ান্টাম জীবনাচারের একজন মডেলে পরিণত করেন হৃদয় রঞ্জন বিশী। নিয়মিত মেডিটেশন, ইয়োগা, দমচর্চা, হাঁটা ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করতেন তিনি।

২০০১ সালে পেশাগত স্ট্রেসের কারণে পুনরায় কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকরা তাকে বাইপাস অপারেশন করাতে বলেন। সব শুনে গুরুজী তাকে বলেছিলেন, Bypass your bypass. আপনার অপারেশনের কোনো প্রয়োজন নেই।

মাদ্রাজে গিয়ে ঘটল সত্যিই এক অভাবনীয় ঘটনা। যাবতীয় পরীক্ষা করে ওখানকার চিকিৎসকরা বললেন– 'ন্যাচারালি আপনার বাইপাস হয়ে গেছে। অপারেশনের প্রয়োজন নেই।' সেই থেকে তিনি আমৃত্যু জীবনযাপন করেছেন স্বাভাবিক কর্মক্ষম একজন মানুষ হিসেবে।

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পর তিনি নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন কোয়ান্টামের সেবামূলক কার্যক্রমে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সঙ্গীতচর্চায়।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের পক্ষে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

স্মিতহাস্যোজ্জ্বল হৃদয় রঞ্জন বিশীর সমস্ত কাজ পরম করুণাময় সৎকর্ম হিসেবে কবুল করুন। আমরা তার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, প্রখ্যাত রবীন্দ্র গবেষক ও সাহিত্যিক আহমদ রফিক। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনা, গবেষণা, সংরক্ষণ ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মহান ভাষা আন্দোলন' শিরোনামে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়াতে পারবে তরুণরাই

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক

অভিভাবকদের আমি প্রায়ই প্রশ্ন করি, সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াচ্ছেন কেন? তাদের উত্তর একটাই–আমরা কি সন্তানের ক্যারিয়ারের কথা ভাবব না? যুক্তিসঙ্গত কথা এবং এতে আমি অন্যায়ের কিছু দেখিও না। কারণ শিক্ষা ও জীবিকার সঙ্গে যে ভাষা যুক্ত থাকে সে ভাষাকেই মানুষ গ্রহণ করবে, এটাই স্বভাবিক।

কিন্তু এতে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। আর বিভাজন সবসময়ই খারাপ। প্রথমত, লেখাপড়ার শুরুতেই একদল শিক্ষার্থী বাংলা মাধ্যমে এবং অন্যদল ইংরেজি মাধ্যমে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বাংলা মাধ্যমে যারা পড়ছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একটা হোঁচট খায়। কারণ এদেশে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমটা হলো ইংরেজি। স্বাভাবিকভাবেই সে তার ইংরেজি মাধ্যমের সহপাঠীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। তাই ভাষাকে সার্বজনীন না করা এবং ভাষাকে জীবিকা ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না করার পরিণামে সমাজের বৃহত্তর একটি শ্রেণি শিকার হচ্ছে বৈষম্যের। বিশেষত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা। এটা অন্যায়ও বটে।

এই বৈষম্য-মুক্তির উপায় কী? মুক্তির উপায় হলো আমাদের তরুণ প্রজন্ম। তরুণরাই পারে মহান ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় স্লোগানটি–'সর্বস্তরে বাংলা চালু করো' বাস্তবায়ন করতে।

আজকের তরুণদের বলতে চাই–তোমরা যদি উঠে দাঁড়াও অর্থাৎ মাতৃভাষার সঠিক চর্চা করো এবং সবার মাঝে আশাবাদের সঞ্চার করতে পারো, তাহলে সমাজের সবাই সচেতন হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমরা আমাদের ভাষাকে নিয়ে যেতে পারব। বিন্দু থেকে সিন্ধুর জন্ম হয় এভাবেই।

উদাহরণ দেই। ইউরোপে মধ্যযুগ ছিল ল্যাটিন ভাষার জন্যে স্বর্ণযুগ। সে-সময় বিভিন্ন জাতি নিজেদের মাতৃভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। মাতৃভাষা চর্চার পথ ধরেই ইউরোপে উদ্ভব ঘটে জাতিরাষ্ট্রের। সূচিত হয় রেনেসাঁ, জ্ঞানচর্চা, শিল্পবিপ্লব ও পৃথিবীব্যাপী উপনিবেশ স্থাপন।

চীনা ও জাপানি ভাষার বর্ণলিপি হলো প্রাগৈতিহাসিক লিপি, যা খুবই জটিল। সেই ভাষায় যদি ব্যবসা-বাণিজ্য, মহাকাশ গবেষণা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ চলতে পারে তাহলে বাংলার মতো উন্নত ভাষাতেও তা অবশ্যই করা যাবে।

ইদানীং অধিকাংশ তরুণদের দেখি, তারা শুধু নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তিত। তারা বিদেশি ভাষা শিখবে, বিদেশে যাবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিগত উন্নতি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রত্যেকের রয়েছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। যেমন, একজন কবি শুধু নিজের বিনোদনের জন্যে কবিতা লিখতে পারেন না, সমাজের বিকাশেও তার কিছু করা উচিত। ভাষার ক্ষেত্রেও তরুণদের এজন্যেই এগিয়ে আসতে হবে।

ভাষা আন্দোলনে তা-ই হয়েছে। কারণ তরুণদের অন্তরে থাকে সমাজ বদলের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যা তাদের সবকিছু বিসর্জন দিতে সাহস জোগায়। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধেও একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা। আমি নিজেও ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছি ২৩ বছর বয়সে। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

চল্লিশের দশকের শেষ দিকে পাকিস্তান নামের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন থেকেই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই বলতে থাকেন–উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাঙালি সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি নিয়ে সোচ্চার হন, যা ধীরে ধীরে গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন যখন বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু', তখনই সৃষ্টি হয় প্রতিবাদের দাবানল। এর মধ্যে জানা গেল, ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। সাধারণ ছাত্র-জনতা সিদ্ধান্ত নিল, সেদিনই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সারাদেশে হরতাল, সমাবেশ ও মিছিল করবে।

পাকিস্তানি সরকার ভয় পেয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করল, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে একমাস পর্যন্ত ঢাকায় সভা-সমাবেশ-মিছিল সবকিছু নিষিদ্ধ। ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। ঘোষণাটি শুনেই আমি বন্ধুদের সাথে দেখা করতে ছুটে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শহীদুল্লাহ হলে। গিয়ে দেখি সবাই বলছে, আমরা যে-কোনো মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙব। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও চিৎকার করে উঠল–১৪৪ ধারা মানি না।

সে-বছর শীতও ছিল বেশ। ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফোটার আগেই স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আনাগোনায় সরব হয়ে উঠল ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। তখনকার আর্টস বিল্ডিং, এখন যেটা ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সি। ওখানে একটা বিশাল আম গাছ ছিল। আমতলায় সভা হলো। সভায় ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন বক্তব্য রাখলেন। ১০ জন করে ছোট ছোট মিছিল করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আর বিরামহীন স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছিল–'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

মিছিল গেট পর্যন্ত যেতেই পুলিশের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ার পর বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে তারা পিকআপ ভ্যানে তুলতে লাগল। নিরস্ত্র ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের সাথে চলতে থাকল সশস্ত্র পুলিশের সংঘর্ষ।

আমার চোখে দেখা–মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকের মাথায় গুলি লেগে তিনি তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকতের উরুতে গুলি লাগে, অস্ত্রোপচার করেও তাকে বাঁচানো গেল না। আবদুল জব্বারের গুলি লাগল তলপেটে, ইমার্জেন্সিতে নিতে নিতেই মারা গেলেন।

ছাত্ররা নিহত হয়েছে–এই খবর পেয়ে সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলনকে রূপ দিল একটা গণ-আন্দোলনে। নিহতদের স্মরণে সবাই গর্জে উঠল নতুন স্লোগানে–'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'। দেশের সমস্ত জেলা, এমনকি গ্রামগুলোতেও শুরু হলো মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি।

পরের বছর থেকে শুরু হলো মহান একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' পালন, যা পাকিস্তানি শাসক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রেরণা জুগিয়েছে। এরই পথ ধরে রচিত হয়েছে ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, এমনকি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে জন্ম নেয় স্বাধীন ভাষিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে ১৯৯৯ সালে বাংলা ভাষা পেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি।

আজকের তরুণদের বলব, মাতৃভাষা বিকাশের এই মন্ত্রটা তোমরা গ্রহণ করো। যা এখনো সম্ভব হয় নি, তোমরা তা সম্ভব করো। আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করো যাতে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, উচ্চ আদালত এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা চালু হয়।

কোয়ান্টাম প্রকাশনা ॥ পাঠকের অনুভূতি

ভালো বই পড়লে অজানাকে জানাই হয় না শুধু, মানুষ জেগে ওঠে আত্মশক্তিতে। দূর হয় মনের ভেতরে জমে থাকা নেতিবাচকতাগুলোও। সাম্প্রতিককালে গবেষকরা বলছেন, জীবনঘনিষ্ঠ গ্রন্থ পাঠকের মস্তিষ্কে নিউরোনের সংযোগায়ন বাড়ায়, সেইসাথে বাড়ে তার বুদ্ধিমত্তা ও সমমর্মিতাবোধ। কোয়ান্টাম প্রকাশনার প্রতিটি বই-ই আত্ম উন্নয়নমূলক এবং ইতিবাচকতায় ঋদ্ধ। এ বইগুলো পড়ে উপকৃত হয়েছেন, এমন লক্ষ পাঠকের মধ্যে কয়েকজনের অনুভূতি এখানে প্রকাশ করা হলো।

ভাঙো দুর্দশার চক্র বইটি এমন একটি সময়ে কিনেছি, যখন আমি ব্যক্তিগত জীবনে খুব হতাশ ও অনিশ্চিত সময় পার করছিলাম। আমার স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরিতে যোগদান করা, কিন্তু হচ্ছিল না। এই বইটি পড়ে আমি আবার বিশ্বাস নিয়ে পড়ালেখা শুরু করলাম। আমার জন্যে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার শেষ বছর ছিল ২০১৮ এবং এ বছরই আমি প্রত্যাশিত চাকরিতে যোগদান করলাম।

আরমিন রহমান, তথ্যসেবা সহকারী, জাতীয় মহিলা সংস্থা

ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইটি পড়ে আমি ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পেরেছি এবং ধর্ম সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি সহজেই।

আমি মনে করি, কোয়ান্টামের সব প্রকাশনাই আমাদের আলোর দিশারী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং আমাদের জীবনযাপনকে আরো সহজ ও সুন্দর করতে সাহায্য করছে।

মো. মনিরুজ্জামান দাইয়ান, উদ্যোক্তা

এ বইয়ের প্রতিটি অটোসাজেশন আমাকে ইতিবাচক হতে সাহায্য করে। এ ভালো কথাগুলোর চর্চা নিজের ভেতর লুকানো হীনম্মন্যতাকে দূর করে এবং ভালো মানুষ হওয়ার ইচ্ছা জাগায়। আমার প্রিয় অটোসাজেশনগুলো আমি ঘরের বিভিন্ন স্থানে এবং বিছানার পাশে লিখে রেখেছি।

ডা. মিতা দত্ত, বারডেম হাসপাতালে কর্মরত

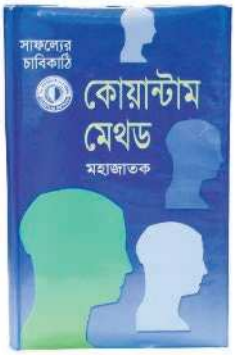

২০০৪ সালে একটা টিভি-প্রোগ্রাম থেকে এই বইয়ের কথা শুনি, তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম। গ্রামে থাকতাম বলে বহু চেষ্টা করে বইটা সংগ্রহ করি। এ বই পড়েই মেডিটেশন করতে শিখি। আগে হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। এসব সমস্যা দূর হয়েছে মেডিটেশন করে। দুঃসময়ে আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু এই বই। যখনই পড়ি, প্রতিবার নতুন অনুপ্রেরণা পাই।

পপি কোড়াইয়া, স্টাফ নার্স, আসগর আলী হাসপাতাল, ঢাকা

আমি নিয়মিত বইটি পড়ি। বইটি আমার অনেক উপকারে এসেছে। বইয়ের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে আমার চুল পড়া ও মুখের কালো দাগ অনেক কমে গেছে। ব্যায়ামচর্চা করে এবং বইয়ে উল্লেখিত খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করে পাইলস-এর সমস্যা থেকেও আমি অনেকটা নিরাময় লাভ করেছি।

প্রশান্তি রাণী দাশ, গৃহিণী

আমি এই বইটি পড়ে আমার খাবারের অভ্যাস পরিবর্তন করেছি। নিয়মিত হাঁটা ও ব্যায়ামচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলেছি। অনেক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছি। আমি পরিচিত সবাইকে এ বইটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করি।

আফরোজা আহমেদ, গৃহিণী

কীভাবে সুস্থ থাকা যায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে *সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন* বইতে। আছে সুষম খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, হাঁটা ও দমচর্চার গুরুত্ব।

নিলুফার ইয়াসমিন, প্রধান শিক্ষিকা, ওটমা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ

কর্মব্যস্ত সুখী জীবন বইটি পড়ে শিক্ষকতার কাজ আমার জন্যে সহজ হয়েছে। এ বই অনুসরণ করে আমি এখন শিশুদের পছন্দের শিক্ষক।

জান্নাতুল ফেরদৌস, শিক্ষিকা, শহীদ আব্দুল হামিদ কিন্ডার গার্টেন, ভোলা

মনের ভেতরে যত প্রশ্ন আসে, তার বেশিরভাগের উত্তর আমি *হাজারো প্রশ্নের জবাব* বইয়ের মাধ্যমে পেয়ে যাই। কারো সাথে যখন কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন বিষয়ে কথা বলতে যাই তখন এ বইগুলো খুব সাহায্য করে। *পর্ব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার* বইটিতে পরিবার-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরগুলো এক কথায় অসাধারণ। সুখী পরিবার গড়ার জন্যে সঠিক দিক-নির্দেশনাগুলো এতে খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই।

ড. শাহীদা রহমান, প্রাক্তন শিক্ষিকা, স্কলাসটিকা

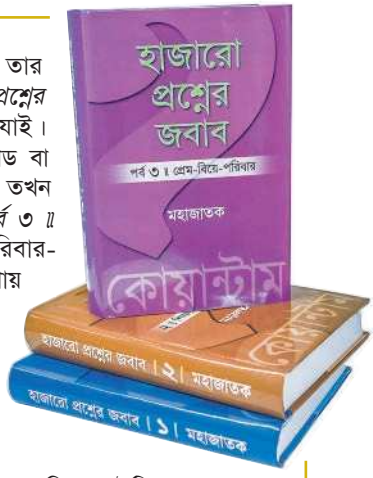

হাজারো প্রশ্নের জবাব ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার বইটি পড়ে আমার বেশ কিছু ভুল ধারণা দূর হয়েছে। সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার ব্যাপারে আমার দায়িত্ব এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জেনেছি।

সাদমান ফাতিন, শিক্ষার্থী, প্রথম বর্ষ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

নিরাময় ও সুস্থতার বৈজ্ঞানিক পথ ॥ মেডিটেশন

এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো
... ...
মণ্ডা-মিঠাই তেতো সেথা
ওষুধ লাগে ভালো।

কবি ও শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কল্পনার এই মজার দেশ এখন প্রায় দৃশ্যমান বাস্তবতা! কোন খাবারে এসিডিটি হয় তা জানার পরও সেই খাবার আমরা খাচ্ছি এবং এর সাথে বিকারহীনভাবে সেবন করে চলেছি এসিডিটির ওষুধ। ঘরে ঘরে এখন প্রায় অবধারিতভাবেই দেখা মেলে রঙবেরঙের ওষুধের বাক্স। দিনে দিনে সেই বাক্স সংখ্যায় বেড়েছে, বড় হয়েছে আকারেও।

ওষুধে মাথাপিছু খরচ হাজার টাকা!

উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা, এসিডিটি, পেটের সমস্যা, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগগুলোর জন্যে এখন আর চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। কোন রোগে কী ওষুধ খেতে হবে তা সবারই মুখস্থ প্রায়! রোগের ধরন ও মাত্রা না বুঝেই সবাই দেদারসে সাবাড় করছে হরেক রকমের ওষুধ। ওষুধ-আসক্তির এই আগ্রাসনের ফলে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ওষুধ বিক্রি হয়েছে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার। প্রায় ১৬.৫ কোটি মানুষের মধ্যম আয়ের একটি দেশের জন্যে ওষুধের পেছনে এ খরচটা বেশিই বৈকি! মাথাপিছু হাজার টাকার ওষুধ খাওয়া থেকে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থাও অনুমান করা যায় সহজেই।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোও স্বাস্থ্য নিয়ে ভুগছে কঠিন সমস্যায়। ক্ষমতাধর আমেরিকার সমস্ত ক্ষমতা পরাজিত হয়েছে স্বাস্থ্যের কাছে! ২০১৮ সালে রেকর্ড গড়ে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় ৩৫০ হাজার কোটি ডলার।

শতকরা ৭৫ ভাগ রোগের জন্যে প্রয়োজন নেই কোনোরকম ওষুধের

ওষুধের পেছনে এ বিপুল খরচ থেকে রেহাই পেতে পৃথিবীজুড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মানুষকে উৎসাহিত করছেন স্বাস্থ্যসচেতন হতে, সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করতে। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট পণ্য-আগ্রাসন আর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত মানুষ এখন নিজের স্বাস্থ্য ও পরিবারের প্রতিই মনোযোগ দিচ্ছে সবচেয়ে কম। স্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাই পারে মানুষকে এই বিপর্যয় থেকে বাঁচাতে। কারণ মেডিটেশনের স্তরেই মানুষ উপলব্ধি করে নিজের প্রতি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব।

শতকরা ৭৫ ভাগ রোগের ক্ষেত্রে ওষুধের কোনো প্রয়োজন নেই। এজমা, আইবিএস, এলার্জি, মাইগ্রেন, ব্যথা-বেদনাসহ এ ধরনের রোগগুলোকে চিকিৎসকরা মনোদৈহিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মনের দুঃখ-কষ্ট, রাগ-ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা-হতাশা দূর হলে স্বাভাবিক নিয়মেই ভালো হয়ে যায় এ রোগগুলো। আর নিজেকে স্ট্রেসমুক্ত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় মেডিটেশন।

মুক্ত হোন আসক্তি থেকে

সিগারেট থেকে শুরু করে চিনি, সফট ড্রিংকস থেকে এলকোহল কিংবা ভিডিও গেম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি নানান আসক্তিতে সারা বিশ্বের মানুষ আজ পথহারা। এ প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা দাওয়াই হিসেবে খুঁজে পেয়েছেন ধ্যান বা মেডিটেশনকে। শত শত গবেষণায় তারা দেখেছেন, যে-কোনো আসক্তি থেকে নিরাময়ে মেডিটেশনই সর্বাধিক কার্যকর।

গবেষণায় দেখা গেছে, আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের নিউরোনে এক ধরনের জড়তা বা স্থবিরতা চলে আসে। নতুন কিছু শেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তারা। ফলে আসক্তিমুক্ত হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাগুলো তারা অনুসরণ করতে পারে না। এ কারণে আসক্তরা চাইলেও সহজে আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

আশার কথা, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চায় নিউরোনের এ জড়তা কেটে যায়। নিউরোনগুলো সহজেই নতুন তথ্য ও ধারণায় উজ্জীবিত হয়, মস্তিষ্কের কাঠামোতে আসে ইতিবাচক পরিবর্তন। ফলে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে যে-কোনো আসক্তি দূর করা যায় সহজেই।

তাই আপনি যদি ফাস্টফুডের আকর্ষণ ছেড়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান বা অনাগত সন্তানের সুস্থতার জন্যে ছাড়তে চান ধূমপান, আজই শুরু করুন মেডিটেশন। ধ্যানের গভীরে আপনি সন্ধান পাবেন প্রকৃত শক্তির, যার সাহায্যে আপনি মুক্ত হবেন সকল আসক্তি ও ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে।

মেডিটেশন নিয়ে যুক্তরাজ্যের কভেনট্রি এবং নেদারল্যান্ডের র‍্যাডবাউড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের এক দশকের যৌথ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী *ফ্রন্টিয়ারস ইন ইমিউনোলজি*-তে (জুন ২০১৭)। এতে তারা প্রমাণ করেছেন, শরীরের ডিএনএ-তে স্ট্রেস তৈরির জন্যে দায়ী জিনগুলোতে স্থায়ী পরিবর্তন আসে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে। অর্থাৎ মেডিটেশনের মাধ্যমে একজন মানুষের ইতিবাচক অভ্যাসগুলো স্থায়ী হয়।

সুস্থ রাখুন আপনার হৃদযন্ত্র

ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশনের রিপোর্ট (মে ২০১৬) অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর এক কোটি ৭৯ লাখ মানুষ মারা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৮০ ভাগ। আমেরিকান হার্ট

এসোসিয়েশনের প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে প্রতিদিন গড়ে ২৩০০ আমেরিকান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

ভয়াবহ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দুই দশক ধরে পরিচালিত ২৪টিরও বেশি গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন–যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন, তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কম। পাশাপাশি তারা–

- জীবন নিয়ে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন
- সুস্থ জীবনাচার অনুসরণে অধিকতর আগ্রহী

যেমন, তারা পর্যাপ্ত ঘুমান এবং যে-কোনো ক্ষতিকর আচরণ-অভ্যাস ত্যাগেও তৎপর। *(জার্নাল অব আমেরিকান এসোসিয়েশন, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮)*

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা দেখেছেন, হার্ট রেট ভ্যারিয়েবল-এর (HRV) ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে মেডিটেশন। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চায় HRV বাড়ে, যা হৃদরোগীদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদরোগের ক্ষেত্রে রোগ পরবর্তী চিকিৎসার চেয়ে তা প্রতিরোধে সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই হৃদরোগী হওয়ার আগেই সবাইকে মেডিটেশন চর্চার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

কোয়ান্টাম নিরাময় : সুস্থ আছেন লাখো মানুষ

মেধাবী এক তরুণ চিকিৎসক। তার মূত্রথলিতে পাথর হওয়ায় পিঠে সবসময় ব্যথা অনুভব করেন। অপারেশন করে পাথর সরানো হলো, কিন্তু পিঠের ব্যথা দূর হলো না। চিকিৎসক বললেন, পাথর আবার তৈরি হতে পারে। ভয় আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে লাগল তার। এসময় এক বন্ধুর কাছে পেলেন *সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড* বইটি।

বই পড়ে শুরু করলেন মেডিটেশন চর্চা। নিরাময়ের মেডিটেশনে অবলোকন করতে লাগলেন, পাথর তৈরির আগেই দূষিত পদার্থগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে শরীরের নিজস্ব নিরাময় প্রক্রিয়া। তিন বছর ধরে চলল নিয়মিত অনুশীলন। একসময় ব্যথা দূর হলো। আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখা গেল, শরীরে কোনো পাথর নেই।

এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। মেডিটেশন চর্চার ফলে সুস্থতার পাশাপাশি সবদিক থেকেই তার জীবনে এসেছে সাফল্য।

সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মানুষকে মেডিটেশন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করছে কোয়ান্টাম। লাখো মানুষ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে মনোদৈহিক ৭৫ ভাগ রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন ওষুধ ছাড়াই। মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনাচার অনুসরণে তারা কমাতে পেরেছেন ওষুধের পেছনে অন্যায্য ব্যয়।

একজন ধ্যানীকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় গড়পড়তা মানুষের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ। আর অসুস্থ হলেও দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন তারা। তাই ওষুধ-আসক্তির আগ্রাসন থেকে রেহাই পেতে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করুন। দৈনিক একটি ঘণ্টা ব্যয় করুন নিজের জন্যে। একঘণ্টার এই বিনিয়োগ আপনাকে রাখবে সুস্থ ও কর্মক্ষম, জীবনকে করবে লক্ষ্যাভিসারী, অনাবিল প্রশান্তি হবে আপনার নিত্যসঙ্গী।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি

সফল ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই শুরু করেছিলেন শূন্য থেকে, তারপর পৌঁছেছেন পূর্ণতায়। একটি জাতির উত্থানেও তা-ই সত্যি। সাথে চাই উদ্যম ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ। এ বিষয়গুলোই নানাভাবে উঠে আসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। ২৭ বছরে লাখো মানুষের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়েছে এ কোর্সের ৪৫৪টি ব্যাচ। ৪৫৪ তম ব্যাচে অংশগ্রহণকারীদের কিছু অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো।

সন্তানসহ কোর্সে অংশ নেয়া জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত

ড. লুৎফুননেছা বারি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের রয়েছে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আর এ বিষয়টিই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। আমি যখন শিক্ষার্থী ছিলাম তখন থেকেই মেডিটেশন চর্চা করি এবং নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমার জীবনে সফলতাগুলো মেডিটেশনের জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

আমার ছেলে ও মেয়েকে সাথে নিয়ে এবার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছি। ওদের মধ্যে বেশ পরিবর্তনও লক্ষ করছি। আমার ছেলে বলছে, সে আর কোল্ড ড্রিংকস পান করবে না। এখানে এসে তারা জীবন গঠনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ওদেরকে সাথে নিয়ে এ কোর্সে অংশ নেয়া আমার জীবনের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার সময় শিক্ষার্থীদের প্রায়ই বলতাম, আমরা হচ্ছি বিবেকবর্জিত জাতি। কিন্তু এখানে এসে আমার ধারণা পাল্টেছে। আমাদের ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ এবং আমরাও পারব ভালো কিছু করতে। তাই কোয়ান্টামের সাথে আমিও বলতে চাই–'আমরা এক মহান জাতি।'

[সহযোগী অধ্যাপক, ফুড টেকনোলজি এন্ড নিউট্রিশন সায়েন্স, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি

তুহফাতুল জিনান

গত তিন মাস ধরে আমি শারীরিক কিছু সমস্যায় ভুগছিলাম। বৃদ্ধাঙ্গুলে ব্যথার কারণে আমি লিখতে পারতাম না। ক্যারিয়ার এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। হতাশা ও হীনম্মন্যতায় ভুগছিলাম। কিন্তু এ কোর্সে এসে মেডিটেশন করে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আঙ্গুলের ব্যথাটা আর নেই, স্বাভাবিকভাবে লিখতে পারছি। মনের যে শক্তিটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তা ফিরে পেয়েছি। আমার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেছে।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ]

ডাক্তারের পরামর্শে কোর্সে এলাম

মো. গোলাম মোস্তফা

আমি বেশ কয়েকটি রোগে আক্রান্ত ছিলাম। হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম না। উচ্চ রক্তচাপের জন্যে নিয়মিত ওষুধ খেতাম, কিছুতেই তা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিল না। আর পায়ে ছিল প্রচণ্ড ব্যথা। স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হতো।

কিছুদিন আগে এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তিনি আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে বললেন। প্রথমে একটু অবাক হলাম, কিন্তু সুস্থতার আশায় কোর্সে অংশ নিলাম। কোর্সের প্রথমদিনও আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। অনেক কষ্ট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছি। মেডিটেশন করে আমার পায়ের ব্যথাটা আর নেই। হজমের সমস্যাটা দূর হয়েছে। রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কোর্সে এসে জেনেছি, আমার সমস্যাগুলো ছিল মনোদৈহিক। নিজেকে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছে।

[সঙ্গীত শিক্ষক ও বিটিভি-র তালিকাভুক্ত সঙ্গীত শিল্পী]

মাইগ্রেনের জন্যে আর ওষুধ খেতে হচ্ছে না

মাহবুবুর রাজ্জাক

২০০৪ সাল থেকে আমি মাইগ্রেনের ব্যথায় ভুগছি। সূর্যের আলোতে আমার সমস্যা হতো। তাই দিনের বেলা বাসা থেকে বের হতে পারতাম না। গাড়ির হর্ন বা যে-কোনো শব্দে মাথাব্যথা বেড়ে যেত। প্রতিদিন আমি নয়টা করে ওষুধ খেতাম। বিদেশেও চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু কোনো ওষুধে সুস্থ হই নি।

গত বছর সিঙ্গাপুরে এক ডাক্তার আমাকে মাত্র একটি ওষুধ দিলেন। আর প্রতিমাসে একটি ইনজেকশন নিতে বললেন, যেটার দাম ৫৬ হাজার টাকা। বললেন, এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই! শুনে খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। এরপর আমার স্ত্রীর পরামর্শে শেষ ভরসা হিসেবে এ কোর্সে অংশ নিলাম। মেডিটেশন করে সত্যিই আমার মাইগ্রেন দূর হয়েছে। মাথাব্যথা আর অনুভব করছি না। ওষুধও খেতে হচ্ছে না।

[ব্যবসায়ী]

মনের বাগানে আবার ফুল ফোটাতে পারব

ডা. তাসলিমা পারভীন

কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, আমি একটুতেই রেগে যাচ্ছি। সবকিছু যেন বিরক্ত লাগছে এবং আমার ভেতরে প্রচণ্ড ঝড়। এর প্রথম শিকার হচ্ছিল আমার পরিবার। মাথাব্যথাও বেড়ে যাচ্ছিল আমার। কিছুতেই প্রশান্ত থাকতে পারছিলাম না। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। কারণ আমি ক্রমাগত দেয়াল তুলছি আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গায়–আমার পরিবারে। এখানে ঝড় তুলে কখনো ভালো থাকা যায় না। এজন্যেই কোর্সে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'–কোয়ান্টামের এ কথাটি শুনে আমি ভাবতাম–রাগ এলে আমি কেন এর প্রকাশ করব না? কিন্তু কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে উপলব্ধি করলাম, যে আচরণ আমি অন্যের কাছে প্রত্যাশা করি তা আগে আমার করা উচিত। তাহলেই আমি প্রশান্তি পাব।

মেডিটেশন করে আমার রাগ ও অস্থিরতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর প্রভাব আমার পরিবারেও দেখতে পাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আমার মনের বাগানে আমি আবার ফুল ফোটাতে পারব।

[মেডিকেল অফিসার, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা]

কোর্সে এসে সত্যটা জেনেছি

মুফতি মো. ইমরান হোসেন

উচ্চ রক্তচাপের কারণে আমি চার বছর ধরে খুব অসুস্থ ছিলাম। ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। নিয়মিত ওষুধ খেয়েও কোনো লাভ হচ্ছিল না। একপর্যায়ে ডাক্তারও হাল ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আপনার এই সমস্যা দূর হবে না। এটা শুনে আমার মৃত্যুভয় শুরু হয়ে গেল।

অবশেষে একজন চিকিৎসক আমাকে মেডিটেশনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না। আমার শ্বশুরের কাছে মেডিটেশন সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কারণ তিনি ছয় মাস আগে এ কোর্সটি করেছেন। এর আগে তিনি দুই বার স্ট্রোক করেছিলেন। মেডিটেশন করে এখন বেশ সুস্থ আছেন। আমিও কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! মেডিটেশন করে আমার রক্তচাপ এখন স্বাভাবিক, ঘাড়ের ব্যথাও দূর হয়েছে। এই কোর্সে এসে আমি নতুনভাবে জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা পেলাম।

আমি একসময় কোয়ান্টামের বিপক্ষে ছিলাম। কিন্তু কোর্স করে আমি সত্যটা জেনেছি। ইসলামের সাথে মেডিটেশনের রয়েছে গভীর সম্পর্ক–এই বিষয়টিও আমি আগে কখনো উপলব্ধি করি নি। আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ঘরে একদিন কোয়ান্টামের এই বাণী পৌঁছে যাবে।

[খতিব, বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, সাভার]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *গুরুজী, আমি চাই আমার আশেপাশের অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে। তাদের খাবার না থাকলে খাবার দেবো, গায়ে কাপড় না থাকলে কাপড় দেবো। আব্বা-আম্মা ও আমাকে নিয়ে আমাদের তিন জনের পরিবারে প্রায়ই কিছু খাবার ও কাপড় বাড়তি থাকে। কিন্তু ঢাকা শহরে ভিক্ষুকরাও যেহেতু সিন্ডিকেটের আওতায় চলে, তাই আসল ও নকল গরিব কীভাবে চিনব?*

উত্তর : ভিক্ষুকদের ব্যাপারে আপনি যে একটা ধারণা করতে পেরেছেন, এজন্যে আপনাকে অভিনন্দন। আসলে ভিক্ষা দিয়ে কখনো আপনি ভিক্ষুকের অভাব দূর করতে পারবেন না। নবীজী (স) সে-কারণেই ভিক্ষাবৃত্তিকে অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন। তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যে ভিক্ষা করে সে আসলে দোজখের আগুন নিজে ক্রয় করে।'

একজন বিপদগ্রস্ত মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা আর ভিক্ষা দেয়া–দুটো এক নয়। আমরা আশেপাশে যে ভিক্ষুকদের দেখি, তাদের পেশাই হচ্ছে ভিক্ষা করা। পরিশ্রম কম, উপার্জন অনেক। কিছুদিন আগে দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে এ নিয়ে রিপোর্টও এসেছে–'রাজধানীর রমনা পার্কের সামনে এক ভিক্ষুক হাতে ব্যান্ডেজ করে লাল রং মেখে ভিক্ষা করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তার আসলে কিছুই হয় নি। প্রতি সপ্তাহে সে পাঁচ-সাত হাজার টাকা পাঠায় গ্রামের বাড়িতে। তার চার স্ত্রী আর ১০ জন সন্তান। ভিক্ষার টাকায় সেই ভিক্ষুক ঢাকা শহরে তার ছয় ছেলের জন্যে ছয়টি ফ্ল্যাট কিনতে চায়।' *(দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮)*

অনেক বছর আগে আমার একবার কৌতূহল হলো ভিক্ষুকদের জীবন কেমন তা দেখা প্রয়োজন। তখন আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার। খুঁজতে খুঁজতে এক বস্তিতে গিয়ে দেখি এলাহি কারবার। ভিক্ষুকের ঘরে টেলিভিশনসহ আধুনিক নানা জিনিসপত্র। সে বিয়ে করেছে তিনটা। তার ভাষ্য হলো–'আমি পঙ্গু মানুষ। আমার খেদমত তো একজনে করতে পারে না, তাই দুই-তিন জন লাগে!'

আরো মজার ঘটনা আছে। বেশ কয়েক বছর আগে সিলেটে হযরত শাহজালাল (র)-এর মাজারে বোমা ফাটল। বোমার ঘটনার পরদিন সংবাদপত্রে দেখলাম–মাজারে এক ভিক্ষুককে প্রতিদিন ট্রলিতে অর্থাৎ চাকাওয়ালা গাড়িতে করে নিয়ে যেতে হতো। ২১ বছর ধরে সবাই এমনকি আশেপাশের অন্য ভিক্ষুকরাও জানত সে পঙ্গু। কিন্তু যেই বোমা ফাটল, সে ট্রলি থেকে উঠে দৌড় দিয়েছে!

এই হচ্ছে ভিক্ষুকদের অবস্থা। কোথাও কোথাও মদ-জুয়ার আসরও বসায় তারা। কারণ ভিক্ষার চেয়ে সহজ উপার্জনের ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। সে কিছুই করছে না, শুধু একটু অভিনয় করছে। অথচ প্রতিটি ধর্মই ভিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করেছে। ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে মেহনত করা।

যেহেতু আপনি অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে চান, মাটির ব্যাংকে দানের অর্থ জমা করুন। কারণ কোয়ান্টাম সঙ্ঘবদ্ধ দানের অর্থে পরিকল্পিতভাবে মানুষের জন্যে কাজ করছে। ব্যক্তির একার পক্ষে যা করা সম্ভব হয় না তা আমরা সম্মিলিতভাবে করছি। সবই সম্ভব হচ্ছে ছোট-বড় দান একত্র করে।

অতএব কোনো দানকেই ছোট মনে করবেন না। এই অল্প কাপড় অল্প খাবার, কিছুই অল্প নয়। অল্প অল্প পরিমাণ যখন জমা হয়, এটা অনেক হয়ে যায়। আপনার মতো সমমর্মী কিশোর-তরুণদের আমরা মোবারকবাদ জানাই, যারা সমাজের জন্যে দেশের জন্যে ভাবছেন এবং নিয়মিত দানে অভ্যস্ত হচ্ছেন।

প্রশ্ন : *যখন কেউ ছলে-বলে-কৌশলে আমাকে বিপদে ফেলে বা আমার খারাপ চায় তখন আমি কী করব? আমি তবুও তাদের ভালবাসি, তাদের আপন ভেবে যত্ন করি। মাঝে মাঝে একটু রাগ হয় কিন্তু কখনো কারো খারাপ চাই না।*

উত্তর : যে আপনার অমঙ্গল চাইবে, আপনি তার মঙ্গল চাইবেন–এটাই ধর্মের শিক্ষা। এটাই নবী-রসুলদের শিক্ষা। কেউ ছলে-বলে-কৌশলে আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাবেন। অর্থাৎ ছল-বল-কৌশলটা বোঝার চেষ্টা করবেন।

কারণ বিপদে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন বিপদে না পড়েন। আর যারা বিপদে ফেলতে চায় তাদের জন্যে দোয়া করবেন, যাতে তারা হেদায়েতের সাথে থাকে। সবসময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন এবং সৃষ্টির কল্যাণে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকবেন।

প্রশ্ন : *আমার বর্তমান স্বামী আমার আগের ঘরের সন্তানের সঙ্গে খুব রাগ-হিংসা দেখায়। এসব দেখে সহ্য করতে না পেরে আমিও রাগ করে থাকি। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?*

উত্তর : যদিও এমন হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। অধিকাংশ নারী যেমন তার সতীনের ছেলেকে পছন্দ করতে পারেন না, পুরুষের ক্ষেত্রেও তা-ই। আবার আমি এমন মাকেও দেখেছি যিনি নিজের ছেলের চেয়ে সতীনের ছেলেকে বেশি আদর করেন। এরা ব্যতিক্রম। ৯৯% ক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে, কেউ তার স্ত্রী বা স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তানদের পছন্দ করতে বা মেনে নিতে পারেন না।

প্রথমত, এই বাস্তবতাকে আপনার মেনে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রো-একটিভ থাকতে হবে। কারণ আপনিও রেগে থাকলে আপনার স্বামীর রাগ-হিংসার পরিমাণ কমবে না বরং বাড়তেই থাকবে। তাই মমতা আর ভালবাসা দিয়ে আপনাকে জয় করতে হবে।

রাগ করে বা হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসা ব্যক্ত করে কেউ কখনো কল্যাণ করতে পারে না। আর পারিবারিক জীবনে রাগ-ক্ষোভের পরিণাম তো আরো ভয়াবহ। অতএব আপনি যত সহনশীল হবেন এবং বাস্তবতাকে স্বীকার করে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন, পরিস্থিতি আপনার জন্যে তত সহজ হবে।

স্বামীর পছন্দ-অপছন্দকে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝাবেন যে, এই সন্তান আমার আগের স্বামীর নয় বরং এ হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত। কারণ কোনো পুরুষ ইচ্ছে করলে বাবা হতে পারে না বা কোনো মহিলা ইচ্ছে করলেই মা হতে পারে না। প্রতিটি শিশুই আল্লাহর দান। তার সাথে তুমি ভালো ব্যবহার করলে আল্লাহর রহমতে আমাদের ঘরে যে সন্তান আসবে, সে-ও ভালো সন্তান হবে।

যখন আলফা লেভেলে আপনার স্বামীর মধ্যে এই ভালো কথাগুলো যেতে থাকবে, আজ কাল বা পরশু–আপনি জয়ী হবেন। কেউ ভুল আচরণ করলে তার সাথে সবসময় ভালো আচরণ করবেন। ভালো আচরণের ফল আপনি পাবেনই।

প্রশ্ন : *একজন মনীষী বলেছেন, হাজার পয়সা দানের চেয়ে এক পয়সা ঋণ পরিশোধ অনেক মূল্যবান। আমার বেশ কিছু টাকা ঋণ আছে। মাটির ব্যাংক ও এতিমান ফান্ডে দান করছি। এই ফান্ড দুটো চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আবার দান বন্ধ করার কথা ভাবলে পাপবোধ কাজ করে। কারণ আমরা না দিলে লামার শিশুদের লালন করা হবে কীভাবে? আপনার দোয়া চাই যেন আমি দান চালিয়ে যেতে পারি এবং ঋণমুক্ত হতে পারি।*

উত্তর : ঋণ হচ্ছে অভিশাপ। যে মানুষের জীবনে ঋণ ঢুকবে, তার জীবন থেকে শান্তি চলে যাবে। রসুলুল্লাহ (স)-এর একটি দোয়া হচ্ছে, 'হে আল্লাহ! সব ধরনের পাপ এবং ঋণ থেকে আমি পানাহ চাচ্ছি।' একবার এক সাহাবী জানতে চাইলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! পাপ আর ঋণ কি এক? তাহলে পাপের সাথে ঋণ কেন?' নবীজী (স) বললেন, 'যে ব্যক্তি দেনাদার সে কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।'

কারণ ঋণটাকে ম্যানেজ করার জন্যে সে মিথ্যা বলবে। পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে নানারকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেবে। কিন্তু সে ওয়াদা রাখতে পারবে না। অতএব আল্লাহর কাছে সবসময় ঋণ থেকে পানাহ চাইবেন।

ঋণ পরিশোধ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপনি যেহেতু দান করছেন, তাই দান ও ঋণ পরিশোধের মধ্যে সমন্বয় করবেন। কারণ নিয়মিত দানের বরকত সীমাহীন। তাই যখনই দান বন্ধ করবেন বা দানে অনিয়মিত হবেন তখন আপনার আয়-সম্পদে বরকত কমে যাবে। কিন্তু দান অব্যাহত রাখলে এমনও হতে পারে যে, আপনি এর বরকতে ঋণমুক্ত হবেন।

তবে কখনো ঋণ করে দান করবেন না। আল্লাহর কাছে সবসময় কায়মনোবাক্যে চাইবেন যে, আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই। রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন–যে ব্যক্তি নিয়ত করে যে, আমি ঋণশোধ করব, আল্লাহ তায়ালা তার ঋণশোধের কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু নিয়তে গণ্ডগোল থাকলে পারবেন না। কেউ কেউ ঋণ করেই তা ফেরত না দেয়ার জন্যে। মনে রাখবেন, ঋণের কোনো ক্ষমা নেই। আপনি যদি আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দেন অর্থাৎ শহিদও হন, তারপরও ঋণের ক্ষমা নেই। অতএব সতর্ক থাকবেন। ঋণ করে কোনো ভোগ্যপণ্য কিনবেন না, ঋণ করে কখনো ফুটানি করতে যাবেন না।

এ মাসের অটোসাজেশন

পৃথিবীকে বদলানোর আগে আমি আমার বিশ্বাস ও চেতনার আলোকে নিজেকে বদলাব।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির পরিচালক ড. জালাল আহমেদ

সুস্থ ও মানবিক দেশ গড়তে অবদান রাখছেন রক্তদাতারা

১৬ জানুয়ারি কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ১৪৫ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ৯৯ জনকে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির পরিচালক (বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ) এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ড. জালাল আহমেদ।

রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'একজন মুমূর্ষের প্রয়োজনে রক্তদান করার চেয়ে বড় দান বা পরোপকার আর কী হতে পারে! এভাবেই নিজের অজান্তে আপনারা শত মানুষের সাথে রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। এই আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে আপনারা হয়ে উঠছেন সত্যিকারের যোদ্ধা, যারা দেশের সেবায় নিয়োজিত আছেন। আমি বলব, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আপনারাই সঠিক কাজটি করছেন–সুস্থ ও মানবিক একটি দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন।

আর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই স্বেচ্ছা রক্তদানের মতো একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্যে। এর মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে রক্তদানে সচেতন করে তুলছেন।'

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে অনুভূতি ব্যক্ত করেন কোয়ান্টাম ল্যাবের নিয়মিত রক্তগ্রহীতা মেহেদী হাসান। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থী বলেন, 'আমার যখন সাড়ে তিন বছর বয়স তখন থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়ে। আমার মা-বাবার জন্যে প্রতি মাসে রক্তের ব্যবস্থা করা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু কোয়ান্টাম ল্যাব আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই সম্মানিত রক্তদাতাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। তারা আমার কাছে সুপারম্যানের সমান।'

প্রধান অতিথির কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন তরুণ রক্তদাতা

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সেইসাথে প্রয়োজন আমাদের নৈতিক জাগরণ। এ লক্ষ্যেই কোয়ান্টাম গত দেড় যুগ ধরে মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। কারণ রক্তের বিকল্প রক্তই। আর রক্তদানের প্রতিদান কোনো মানুষের পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। আমরা শুধু রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, এর প্রতিদান আপনাদের দিতে পারেন একমাত্র স্রষ্টাই।'

ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারে কোয়ান্টাম প্রকাশনা

ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার The University Library of Languages and Civilizations-এ অন্তর্ভুক্ত হলো কোয়ান্টাম প্রকাশনার সাতটি বই। ১০ জানুয়ারি কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিসের পক্ষ থেকে বইগুলো জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিসের আহ্বায়ক আজমেরি নির্ঝর।

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী, সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড, হাজারো প্রশ্নের জবাব ॥ পর্ব ১ ও ৩, রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা, হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন বইগুলো প্রাথমিকভাবে সংরক্ষণ করতে সম্মত হয়েছেন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ।

গ্রন্থাগারটির বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন, 'এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে প্রায় সাড়ে সাত হাজার বাংলা বই। কোয়ান্টাম প্রকাশনার বইগুলো পাঠকদের মেডিটেশন শিখতে এবং ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে সাহায্য করবে। এখন থেকে কোয়ান্টাম প্রকাশনার প্রতিটি বই এ গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে।'

৪৮ তম জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯

কোয়ান্টাদের সাফল্য

৪৮ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (শীতকালীন)-২০১৯ আসরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মেয়ে কোয়ান্টাদের দল পাঁচটি এবং ছেলেরা সাতটি ইভেন্টে অংশ নেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলো, ভলিবল ইভেন্টে বালক দল জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। টেবিল টেনিস দ্বৈতে জাতীয় পর্যায়ে বালিকা দল রানার আপ এবং বালক দল একক ইভেন্টে রানার আপ ও দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়। এথলেটিক্সে বালক বড় গ্রুপে ২০০, ৪০০, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়, পোল ভল্ট এবং দড়ি লাফের প্রতিটিতে স্বর্ণপদক লাভ করে। বালক মধ্যম গ্রুপের দড়ি লাফেও অর্জন করে স্বর্ণপদক।

২২ জানুয়ারি চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতাটি উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি। ২৬ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এবং চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ইসলাম।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে

অধ্যাপক ডা. তাহমীনা বেগম

এই প্রথম লামায় গেলাম। এক যুগেরও বেশি সময় আগে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছি, কিন্তু লামায় মেডিকেল ক্যাম্পে যাওয়ার সুযোগ হলো এবারই প্রথম।

রাতের ট্রেন আর পরদিন সকালে মাইক্রোবাসে যাত্রা ছিল কিছুটা ক্লান্তিকর। কিন্তু কোয়ান্টামমে পৌঁছার পর পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল নিমেষেই। মমতায় ঘেরা কোয়ান্টামমের চারদিকে বৃক্ষের সবুজ, নীল আকাশ, পাখির কলতান আর প্রকৃতির নির্মল প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল।

সেন্টারে ঢুকে কিছুদূর এগোলেই সিঁড়ি বেয়ে রাহমাতান কটেজ। সহযাত্রীদের একজন বাঁশের তৈরি একটি লাঠি ধরিয়ে দিলেন, পথের বন্ধু। সেদিন বিশ্রাম।

গাইনি ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার ও অধ্যাপক ডা. মো. জাহাঙ্গীর কবির

প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ ও অধ্যাপক ডা. তাহমীনা বেগম

পরদিন (৪ জানুয়ারি) মেডিকেল ক্যাম্প। দূরদূরান্ত থেকে ছয় হাজারেরও বেশি রোগী এলেন। তাদের সেবা দিলেন বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞসহ ১২৯ জন ডাক্তার। রোগী নিবন্ধন, চিকিৎসা-পরামর্শ, ওষুধ বিতরণ সবকিছুই ছিল বেশ সুশৃঙ্খল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক্তাররা এসেছেন, কয়েকজন মহিলা ডাক্তার এসেছেন সুদূর খুলনা থেকে। জেনে অবাক হলাম। মানুষের জন্যে, কোয়ান্টামের জন্যে তাদের ভালবাসা দেখে মন আপ্লুত হলো।

রাতে সবাই মিলে উপভোগ করলাম প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা।

৫ জানুয়ারি। 'শাফিয়ান'-এ (কোয়ান্টামম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র) উদ্বোধন করা হলো অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার গাইনি ওয়ার্ড। প্রশমন সেবা চালুর লক্ষ্যে যাত্রা করল অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ প্যালিয়েটিভ কেয়ার কার্যক্রম।

তার আগে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম অবারিত প্রকৃতির প্রশান্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা স্কুল, কলেজ, শিশুসদন, জিমনেসিয়াম। উপভোগ করলাম ওদের মনোমুগ্ধকর শারীরিক কসরত। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে জানতে পেরে ভালো লাগল। আরো জানলাম এখানে প্রতি বেলায় রান্না হয় প্রায় ২,৫০০ মানুষের। শিশুদের পুষ্টি জোগাতে আছে সয়াদুধ উৎপাদন ব্যবস্থা, মুরগির খামার, পুকুরের মাছ, ফল ও সবজি বাগান।

লামায় সবকিছুই সুশৃঙ্খল, সুন্দর। কোয়ান্টামমের হাজারো নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী আপন আপন কাজ করে যাচ্ছেন সুন্দরভাবে, নীরবে, নিভৃতে। সদাহাস্যময় অভিব্যক্তি আর নম্র ব্যবহার ওদের করেছে ব্যতিক্রমী। বার বার মনে বাজছিল কবিগুরুর সেই গান– *জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে ...*।

আর সমস্ত কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে রয়েছেন একজন মানুষ, তিনি গুরুজী। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো নদীতে ফেলে দেয়ার পরিবর্তে তিনি এক অদৃশ্য মায়ায় ও পরম ভালবাসায় সবাইকে যুক্ত করেছেন সবার সঙ্গে, তাদের অন্তরকে করেছেন বিকশিত।

প্রতিটি কর্মী জোনাকির মতো অন্তরের শক্তি দিয়ে কোয়ান্টামমে আলো জ্বেলে চলেছেন, আলোকিত করছেন চারপাশকে। গুরুজী সার্থক তার চিন্তায়, তার কর্মে।

[তাহমীনা বেগম। বিশিষ্ট লেখিকা ও শিশু-চিকিৎসক। বারডেম জেনারেল হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান]

মেডিকেল ক্যাম্প ২০১৯ ॥ সেবা পেয়েছেন ৬,১৭৫ জন রোগী

৪ জানুয়ারি শুক্রবার লামার কোয়ান্টামমে দিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এবারের ক্যাম্পটি উৎসর্গ করা হয় কোয়ান্টাম পরিবারের প্রয়াত চিকিৎসক ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ রুবেলের স্মরণে। উল্লেখ্য, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে ৩৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এ ক্যাম্পে মেডিসিন, সার্জারি, নিউরোসার্জারি, নিউরোলজি, চর্ম, নাক-কান-গলা, দন্ত, হৃদরোগ, নেফ্রোলজি, অর্থোপেডিকস, ইউরোলোজি, চক্ষু, ফিজিওথেরাপি, গাইনি ও শিশু-সহ মোট ১৫টি বিভাগে রোগীদের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়। বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছেন ৬,১৭৫ জন দুস্থ বঞ্চিত পাহাড়ি-বাঙালি রোগী। রোগীদেরকে প্রয়োজনীয় ওষুধ (দুই লক্ষাধিক ইউনিট) বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

এবারের মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ কেয়ার বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে। এতে সেবাদান করেন ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে আগত কোয়ান্টাম পরিবারের ১২৯ জন চিকিৎসক।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

আমি এক অনন্য মানুষ আমরা এক মহান জাতি

কোয়ান্টাম বুলেটিন

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

স্মার্ট হোন ॥ ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে নিজে বাঁচুন, পরিবারকে বাঁচান

ফেসবুক
টুইটার
স্ন্যাপচ্যাট
ইনস্টাগ্রাম
সেলফি
ইউটিউব
ওয়েব সিরিজ
টিভি সিরিয়াল
ভার্চুয়াল গেম
অনলাইন শপিং
স্মার্ট টিভি
ইন্টারনেট
ও
স্মার্টফোন
আসক্তি

স্মার্ট হোন। সময়ের সাথে থাকুন। যে সচেতনতা শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী– তার সক্রিয় অংশ হোন। ফেসবুকসহ সব ধরনের ভার্চুয়াল ভাইরাসের মরণ ছোবল থেকে মুক্ত হোন। ভালো থাকুন। নিরাপদে রাখুন আপনার সন্তান ও পরিবারকে।

২০০৯ সাল থেকেই ফেসবুকসহ যাবতীয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও আধুনিক প্রযুক্তিপণ্যের আসক্তিকর দিক সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। শুরু থেকেই কোয়ান্টাম বলেছে– ব্যক্তিগত জীবন, মনোদৈহিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক শান্তির জন্যে এক ভয়ানক হুমকি হয়ে উঠতে যাচ্ছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সেই ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকেই কোয়ান্টাম দেশজুড়ে শুরু করে ভার্চুয়াল ভাইরাস বিষয়ক সচেতনতা প্রচারণা।

মাস পেরোতেই প্রমাণিত হয় এ কথার সত্যতা, লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি ও প্রতারণার দায়ে মার্চ ২০১৮-তেই বিশ্বজুড়ে শুরু হয় হৈচৈ। সর্বত্রই রব ওঠে– 'ডিলিট ফেসবুক'।

আমরা বলতে পারি, ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে এক দশক আগে যে কার্যক্রমের সূচনা করে কোয়ান্টাম–সময়ের প্রয়োজনে তা-ই একসময় সাদরে গ্রহণ করতে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ; কেবল দেশেই নয়, এমনকি বিদেশেও। কারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছেন–ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে আজ যেখানে যত অস্থিরতা হিংস্রতা নেতিবাচকতা, তার অন্যতম প্রধান কারণ এই ভার্চুয়াল ভাইরাস। যা একটু একটু করে ধ্বংস করে দিচ্ছে ব্যক্তির নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন ও বিশ্বস্ততা, সামাজিক সম্প্রীতি ও সমমর্মিতার মতো মানবিক উৎকর্ষতার চিহ্নগুলো।

গবেষকদের মতে, স্মার্টফোন-ইন্টারনেটের লাগামহীন ব্যবহার আর অনলাইন গেম-ইউটিউব-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি জীবনঘাতী মাদকের চেয়েও ভয়াবহ। যাকে গবেষকরা অভিহিত করেছেন 'ডিজিটাল কোকেন' হিসেবে। তাদের মতে, মাদকের চাহিদা সৃষ্টি হলে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক নিঃসৃত হয়, ঠিক একই ঘটনা ঘটে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত ব্যক্তিদের মস্তিষ্কেও। এ আসক্তির শিকার আজ ধনী-গরিব নির্বিশেষে বিশ্বের লক্ষ কোটি শিশু-কিশোর-তরুণসহ সব বয়সী মানুষ।

তাই আসুন, জ্ঞানে-উপলব্ধিতে সত্যিকারের একজন আধুনিক মানুষ হয়ে উঠি। নিজে সচেতন হই। যথাসাধ্য সচেতন করে তুলি আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী-সহকর্মীদের। ভার্চুয়াল ভাইরাসের মরণ-আগ্রাসন থেকে বাঁচাই সন্তান ও পরিবারকে। বাঁচাই প্রিয় দেশবাসীকে। এ সচেতনতার পথ ধরেই সূচিত হোক আমাদের নৈতিক পুনর্জাগরণ। মানবিকতার অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিক প্রিয় বাংলাদেশ।

স্মার্টফোন
শয়তানের বাক্স

স্মার্টফোন একটি জুয়া মেশিন। এটি তৈরিই করা হয়েছে এমনভাবে যেন ব্যবহারকারী এতে ক্রমান্বয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে। দিন-রাত এতে বুঁদ হয়ে থাকে। তাই সচেতন হোন। পেশাগত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া স্মার্টফোন ব্যবহার থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন। যোগাযোগের প্রয়োজনে ব্যবহার করুন সাধারণ ফিচার ফোন।

আর আপনার সন্তানের বয়স ১৮ হওয়ার আগে তার হাতে স্মার্টফোন তুলে দেবেন না। গবেষকরা বলছেন, স্মার্টফোনে আসক্তি তার পড়াশোনা, ক্যারিয়ার এমনকি জীবননাশের কারণ হতে পারে।

একবছরে ডিলিটকৃত ফেসবুক একাউন্ট ১৫০ কোটি

বিশ্বজুড়ে গত একবছরে ফেসবুকে ভিজিট কমেছে ৫০%, ডিলিটকৃত একাউন্টের সংখ্যা ১৫০ কোটি। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৭৪% ব্যবহারকারী হয় বদলেছে প্রাইভেসি সেটিংস, নয়তো স্থগিত বা ডিলিট করেছে ফেসবুক। তরুণদের মধ্যে এর হার ৪৪%।

২০১৮ সালে কোয়ান্টামের যুগান্তকারী উদ্যোগ ছিল ভার্চুয়াল ভাইরাস নিয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি। এতে দেশে ফেসবুকের অপ্রতিহত আগ্রাসন প্রথম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আমরা সেদিন বলেছিলাম– যত ক্ষুদ্রই হই, প্রতিপক্ষ যত বিশালই হোক, আমরা সত্যের শক্তিতে শক্তিমান।

সত্যের শক্তিই প্রমাণিত হলো আবার। সত্যের শক্তিতে নড়ে উঠল ফেসবুকের ভিত।

ফেসবুক নাকি ফেকবুক?

অর্ধেকটাই যে ভুয়া!

অর্ধেকের বেশি ফেসবুক-একাউন্টই ভুয়া। সম্প্রতি এ তথ্য দেন ফেসবুকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও মার্ক জাকারবার্গের তৎকালীন ঘনিষ্ঠ সহযোগী অ্যারন গ্রিনস্প্যান।

ফেসবুকের বিনিয়োগকারীরা এ প্রতিবেদন বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পরই ফেসবুকের শেয়ারদরে উল্লেখযোগ্য পতন ঘটে।

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১৯

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শিক্ষাবিদ ও লেখক। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন তরুণ প্রজন্ম ও অভিভাবকদের। এ বিষয়ে তার আলোচিত কয়েকটি কলাম ও বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো

আমার কোনো ফেসবুক একাউন্ট নেই

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

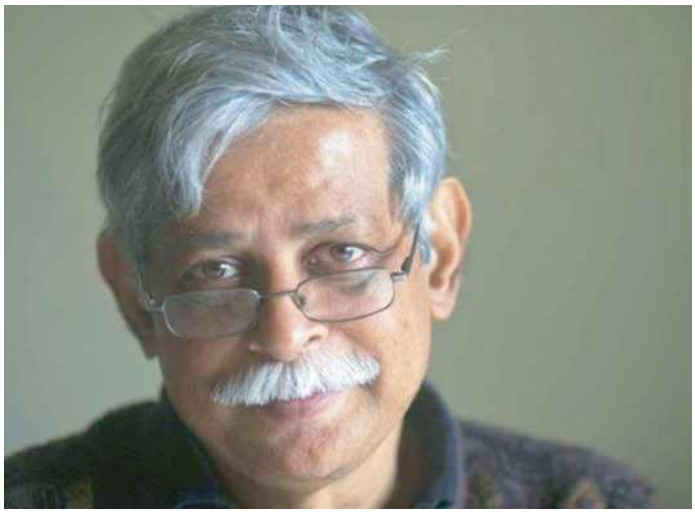

একটা দৃশ্য কল্পনা করা যাক।

আপনি একজন মা, আপনার ছেলেটি স্কুলে বা কলেজে পড়ে। একদিন বাসায় ফিরেছেন, দেখলেন, ছেলে টেবিলে পা তুলে সিগারেট টানছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করছিস বাবা?' আপনার ছেলে হাসি হাসি মুখে বলল, 'সিগারেট খাচ্ছি আম্মু।' তারপর টেবিল থেকে পা নামিয়ে বলল, 'খাওয়ার পর একটা সিগারেটে টান না দিলে ভালোই লাগে না।' কথা শেষ করে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করল। আপনি বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, সিগারেটটা শেষ করে হোমওয়ার্কগুলো করে ফেল।'

কথা শেষ করে আপনি ভেতরে গেলেন, মনে মনে ভাবলেন : 'আমার ছেলেটি কত লক্ষ্মী। বাইরে কোনো ঝুট-ঝামেলায় যায় না। ঘরে থাকে, মাঝে মাঝে সিগারেট খায়!'

আমি জানি, আপনারা যারা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ের মা-বাবা তারা আমার এই কাল্পনিক দৃশ্যটির বর্ণনা শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, একজন বাবা কিংবা মা তার ছেলে বা মেয়ের এরকম একটা আচরণকে কখনো এত সহজভাবে নিতে পারে না। অবশ্যই নিতে পারে না এবং কখনো নেয় না।

সিগারেট হচ্ছে নেশা। তাই কাল্পনিক দৃশ্যটিতে অন্য নেশাগুলোর কথা না বলে সিগারেটের উদাহরণটি দেয়া হয়েছে। আমাদের সন্তান কোনো নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা সেটা মেনে নিতে পারব না। আমরা বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। যদি এই বিষয়টা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

যে বিষয়টি এতদিন সন্দেহ বা আশঙ্কা ছিল, এখন সেই বিষয়টি গবেষণা জার্নালে বের হতে শুরু করেছে। কোকেন-আসক্ত একজন মাদকাসক্ত মানুষকে যদি মাদক খেতে দেয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে যে কেমিক্যালগুলো বের হয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, ফেসবুকে আসক্ত একজন মানুষকে যদি ফেসবুক করতে দেয়া না হয়, তাহলে তার মস্তিষ্কে সেই একই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি ছেলেমানুষী বিনোদন নয়, বিষয়টি মাদকে আসক্তির মতো গুরুতর একটি ঘটনা।

একজন ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হচ্ছে সেই সময়টাতে সে কীভাবে তার মস্তিষ্ক ব্যবহার করেছে, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে তার মস্তিষ্কের গঠন কেমন হবে। আজ থেকে ১০ বছর পরে হয়তো আমরা জানতে পারব শৈশব-কৈশোরে মাঠে-ঘাটে খেলাধুলা না করে দিন-রাত ছোট একটা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার কারণে আমাদের কী ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমাদের কিছু করার থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে একটুখানি কমনসেন্স আমাদের অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

সবাই হয়তো জানে না, যারা এই প্রযুক্তি গড়ে তুলছে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছলে-বলে-কৌশলে কোনো একজনকে তাদের ওয়েবসাইটে কিংবা পোর্টালে নিয়ে আসা এবং যত বেশি সম্ভব সেখানে আটকে রাখা। আপনার মনের জোর যদি যথেষ্ট বেশি না থাকে কিছু বোঝার আগেই আপনি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভিডিও দেখে দেখে ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করে ফেলবেন।

আপনি কোন ধরনের ওয়েবসাইটে গিয়েছেন সেটি বিশ্লেষণ করে আপনাকে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরা সেই ধরনের জায়গায় ঠেলে দেবে! এই সাইবার জগৎ কিন্তু আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানে।

'লাইক' দেয়া নিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা সত্যি ঘটনা শুনেছি। একটি বাচ্চা মেয়ে ফেসবুকে কিছু একটা পোস্ট করে দিয়ে অপেক্ষা করে আছে সেখানে কেউ 'লাইক' দেবে। যখন দেখতে পেল কেউ তাকে খেয়াল করে 'লাইক' দিচ্ছে না, তখন সে নিজেই আর একটা একাউন্ট খুলে সেই একাউন্ট থেকে নিজেকে 'লাইক' দিতে থাকল!

আমাদের সন্তান কোনো নেশায় আসক্ত হয়েছে জানতে পারলে আমরা বিচলিত হবো এবং সন্তানকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে পাগল হয়ে যাব। তাহলে আমরা কীভাবে আমাদের সন্তানদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে বসে থাকতে দেই?

বিষয়টা একটা কৌতুকের বিষয় কিন্তু তারপরও এটা শুনে আমি কেন জানি একটু আহত অনুভব করেছি। আমার মনে হয়েছে কেন আমার দেশের একটি ছোট মেয়ে জীবনের প্রতি এরকম একটা দীনহীন মনোভাব নিয়ে কাঙালের মতো বড় হবে? কে ঠিক করে দিয়েছে জীবনকে অর্থপূর্ণ হতে হলে ফেসবুকে 'লাইক' পেতে হবে? কেউ স্বীকার করুক আর না-ই করুক ইন্টারনেট আসক্তি কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয়, ফেসবুক আসক্তি একটি সত্যিকারের দুর্ভাবনার বিষয়।

স্মার্টফোনের জঞ্জাল থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে চাই বই পড়ার অভ্যাস

আমরা যখন বড় হয়েছি তখন বই ছিল আমাদের প্রধান বিনোদন। আমরা শৈশবে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে খেলেছি, ঘাড় গুঁজে গল্পের বই পড়েছি। এখন বিনোদনের কোনো অভাব নেই। দুধের শিশুটিও ইউটিউবে কার্টুন দেখতে দেখতে তার দুধের বোতল মুখে দেয়। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ আর টিভি স্ক্রিনের বিনোদন যত তীব্রই হোক না কেন বই পড়ার সাথে তার কোনো তুলনা নেই। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন নতুন পৃথিবীর সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কল্পনাশক্তি। আমাদের যদি কল্পনা করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে দামি একটা কম্পিউটারের জটিল এলগরিদমের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্যটা কোথায়?

আমাদের সন্তানরা একবার যদি বই পড়ার অভ্যাস করে তাহলে সারা জীবনের জন্যে আমরা তাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারব। সে তখন স্মার্টফোনের জঞ্জালে পা দেবে না, সময় কাটাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সাথে। আজ হোক কাল হোক এটি ঘটবেই। একটি সময় আসবে যখন পৃথিবীর মানুষ আর নিজ হাতে তাদের সন্তানদের ইন্টারনেটের কানাগলিতে ঠেলে দেবে না। তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবে বইয়ের অপূর্ব বৈচিত্র্যময় কল্পনার জগতে।

ফেসবুক ॥ মাদকের মতোই এক নেশা

আমার কোনো ফেসবুক একাউন্ট নেই। পৃথিবীতে তথ্যের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তথ্য রয়েছে গুগল, ফেসবুক এবং আমাজনের কাছে। তুমি তোমার পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে ফেসবুককে লাভবান করছ। তোমার পছন্দ-অপছন্দ সব জানে গুগল। এখান থেকে বের না হলে তোমরা আর স্মার্ট থাকবে না।

পৃথিবীতে এখন একটা সময় যাচ্ছে যখন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। তুমি তোমার জীবন নিয়ে কী করবে তা তোমাকে ভাবতে হবে। আগামী ১০ বছর পর এসব (ফেসবুক) থাকবে না বলে আমার মনে হয়। ফেসবুক মাদকের মতো এক ধরনের নেশা।

তথ্যসূত্র : বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ও ২৪ মার্চ ২০১৭। ঢাকা ট্রিবিউন, ২৯ জানুয়ারি ২০১৯

ভার্চুয়াল বিপদ সত্য জানুন

ফেসবুকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে কখন যে আপনি আসক্ত হয়ে যাবেন, টেরই পাবেন না। হুঁশ ফিরবে যখন, ততক্ষণে শরীর-মন আর পরিবারে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। ফিরে পাবেন না আপনার ক্ষয়ে যাওয়া মেধা-সময়-অর্থ। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য-উপাত্তগুলো এমনটাই বলছে। আসুন, জেনে নিই বিশ্বব্যাপী নানা গবেষণায় উঠে আসা তথ্যগুলো :

প্রিয়জনের চেয়েও প্রিয় স্মার্টফোন!

সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইন্ড ব্রেন বিহেভিয়ার ও সায়েন্স অব হ্যাপিনেস ও টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা *মটোরোলা*-র যৌথ উদ্যোগে একটি জরিপে দেখা গেছে, ৬৫ শতাংশ ভারতীয় তরুণদের কাছে প্রিয়জন বা ঘনিষ্টজনের চেয়েও প্রিয় হলো তাদের স্মার্টফোনটি! এমনকি এটি সাথে না থাকলে বা হারিয়ে ফেলার ভয়ে প্রায়শই তারা ভীষণ অস্থিরতা-আতঙ্কে ভোগেন। এতে আরো বলা হয়, স্মার্টফোন-আসক্তরা ক্রমশ জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

(দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮)

বিশ্বজুড়ে হুমকির মুখে শিশুরা

২০১৬ সালে ইউনিসেফ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি অঙ্গরাজ্যে কিন্ডারগার্টেন থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত জরিপ করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের লেখার প্রতি আগ্রহ দিন দিন কমে টাইপিং শেখানোর প্রবণতা বেড়েছে। ফলে তৃতীয় শ্রেণির শিশুদের হাতের লেখা শেখাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন শিক্ষকরা। *(ডয়েচে ভ্যালে, ১ নভেম্বর ২০১৩)*

যেসব শিশুরা দিনে তিন ঘণ্টার বেশি সময় স্ক্রিনের সামনে কাটায় তারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে আছে। ২০০৪-২০০৭ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের তিনটি শহরের নয় থেকে দশ বছর বয়সী সাড়ে চার হাজার শিশুদের নিয়ে গবেষণাটি করেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর একদল বিশেষজ্ঞ।

(দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ১৫ মার্চ ২০১৭)

অনলাইন ও ভিডিও গেম ॥ মেধাশূন্য ও আগ্রাসী হয়ে উঠছে তরুণেরা

ভিডিও গেম খেলার সময় ব্যক্তির মনে হয়, গেমের জগতটাই বাস্তব, এখানকার সবকিছু সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে। গেমে আসক্ত ব্যক্তি বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে পার্থক্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ বোঝে না–সে সাজানো নাটকের অংশমাত্র। এ কথাগুলো বলেছেন আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট ডগলাস জেনটাইল।

আঁতকে ওঠার মতো একটি ঘটনা ঘটে ২০১০ সালে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক দম্পতি অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে সারাদিন সাইবার ক্যাফেতে পড়ে থাকত। একপর্যায়ে গেমের মধ্যে কাল্পনিক একটি শিশুকে নিয়ে তারা এতই মনোযোগী ছিল যে, বাস্তবে নিজেদের তিন মাস বয়সী সন্তানকে দিনে খাবার দিত মাত্র একবার। অনাহারে-অযত্নে শেষ পর্যন্ত মারা যায় ছোট্ট শিশুটি। *(সিএনএন, ৫ মার্চ ২০১০)*

জার্মানির মিউনিখে ১৮ বছরের এক তরুণ অতর্কিত হামলা চালিয়ে নয় জনকে নিহত ও ১৬ জনকে আহত করে। তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় সে ছিল সহিংস গেমে আসক্ত। দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, সহিংস গেমগুলো কিশোরদের প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংস্র করে তুলছে।

(টাইম ম্যাগাজিন, ১৭ আগস্ট ২০১৫)

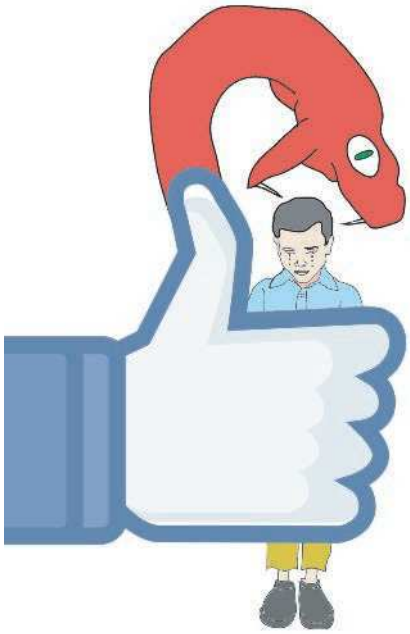

সোশ্যাল মিডিয়া ॥ মাদক এবং জুয়ার চেয়েও আসক্তিকর

ফেসবুকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথ। নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এমন ১৪-২৪ বছর বয়সী ১৫০০ জন তরুণ-যুবক এতে অংশ নেয়। দেখা যায়, এদের শতকরা ৯১ জনই সোশ্যাল মিডিয়ায় এতটাই আসক্ত, যা সিগারেট বা অ্যালকোহলে আসক্তির চেয়েও বেশি।

বিশেষত ছবি শেয়ারিং অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সবচেয়ে ভয়ংকর প্রভাব ফেলছে। প্রতি পাঁচ জনে একজন তরুণের ভাষ্য হচ্ছে, তারা মাঝরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো নতুন মেসেজ এলো কিনা তা চেক করে, যার ক্লান্তি পরদিন সারাক্ষণই তারা বয়ে বেড়ায়।

(দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন, ২১ মে ২০১৭)

জার্নাল সাইকোলজিক্যাল রিপোর্ট: ডিজঅ্যাবিলিটি এন্ড ট্রমা-তে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এমন মানুষদের মস্তিষ্কের প্যাটার্নের সাথে মিলে গেছে মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় আসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের প্যাটার্ন।

ছবিতে লাইক পাওয়ার আগ্রহ মস্তিষ্কে নিঃসরণ করে ডোপামিন নামক হরমোন। ড্রাগ গ্রহণের সময় বা জুয়ায় জিতলে মস্তিষ্কে এই একই হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। *(দ্য সান, ৬ জুলাই ২০১৬)*

নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্নতায় আক্রান্ত কৈশোর ॥ পরিণতি হতে পারে আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের তথ্য হলো, ২০১০ থেকেই ১৩-১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের স্মার্টফোন ও প্রযুক্তিপণ্যের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিষণ্নতায় ভোগা ও আত্মহত্যা-প্রবণতা বেড়ে গেছে। পরবর্তী পাঁচ বছরে যা আরো বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগে। যেসব কিশোর-কিশোরী স্মার্টফোন বা অন্যান্য ডিভাইসে দিনে পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করছে, তাদের ৪৮ ভাগ অন্তত একবার হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

(হিন্দুস্তান টাইমস, ১৫ নভেম্বর ২০১৭)

গুরুতর মানসিক রোগ 'সেলফিটিস' সেলফি নিষিদ্ধ হলো কান চলচ্চিত্র উৎসবে

ঘন ঘন সেলফি তোলা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্যে ব্যাকুল হওয়ার নামই সেলফিটিস। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। সাধারণত যারা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং অনুকরণপ্রিয় (ট্রেন্ডি), তারাই মূলত সেলফি রোগে আক্রান্ত।

(দ্য টেলিগ্রাফ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭)

চলচ্চিত্র-বিষয়ক বিশ্বখ্যাত আয়োজন ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসব। অনাকাঙ্ক্ষিত বিশৃঙ্খলা এড়াতে ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য এর ৭১ তম আয়োজনে সেলফি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উৎসবের প্রধান আয়োজক থিয়েরি ফ্রামোঁ-র মতে, সেলফি একটি ব্যাধি, যা সত্যিই উদ্ভট ও ভীতিকর।

(দ্য গার্ডিয়ান, ২৪ মার্চ ২০১৮)

সাইবার বুলিং ॥ নৃশংসতার নতুন ফাঁদ

অনলাইনে অশালীন কথা ও ছবি, অকথ্য গালিগালাজ, এমনকি হত্যার হুমকির নামই সাইবার বুলিং। আমাদের দেশেও ঘটছে এ ধরনের ঘটনা।

ঢাকার উত্তরায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তৈরি হওয়া পাঁচটি গ্রুপের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। পারস্পরিক বিবাদ প্রথমে ফেসবুকে অশোভন ভাষায় হুমকি দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে তা রূপ নেয় বাস্তব নৃশংসতায়। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি একটি গ্যাং-এর কিশোররা খুন করে তাদেরই সহপাঠীকে।

দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে চোখ-কান ও মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-সমস্যা

ম্যাসাচুসেটস-এর চোখ-কান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্মার্টফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিজনিত সমস্যা এবং মাথাব্যথার রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

(দ্য বোস্টন গ্লোব, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬)

দ্য স্পাইনাল জার্নালের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘক্ষণ ঝুঁকে স্মার্টফোন ব্যবহারে ঘাড়ে ক্রমাগত চাপ পড়ে। এ চাপের পরিমাণ একজন ব্যক্তির মাথার ওজনের প্রায় ছয়গুণ। ফলে স্মার্টফোন আসক্তরা আক্রান্ত হচ্ছে 'টেক্সট নেক' নামক ঘাড়ব্যথায়।

আবার আমেরিকার ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়া, স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণও হচ্ছে দীর্ঘসময় ইলেকট্রনিক ডিভাইসের স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে থাকা।

(নিউইয়র্ক টাইমস, ২৫ জানুয়ারি ২০১৮)

সচেতন হওয়ার দায়িত্ব আপনার

একজন সাধারণ ব্যবহারকারীও দিনে অন্তত দেড়শ বার স্মার্টফোনের মেসেজ বা নোটিফিকেশন চেক করেন। শুধু তা-ই নয়, স্মার্টফোনের স্ক্রিন টাচ করেন দিনে অন্তত দু-হাজার বার।

(দ্য গার্ডিয়ান, ১১ নভেম্বর ২০১৭)

প্রিয় পাঠক, ভার্চুয়াল জগতের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সত্যটা তো জানলেন। এবার সচেতন হওয়ার পালা। এ দায়িত্ব একান্তই আপনার।

প্রযুক্তি যেন সর্বনাশের বাহন না হয়

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মোবাইল ফোন জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হওয়া ভালো না। আজকাল ফেসবুক-গেমস ইত্যাদি নিয়েই সময় কাটায় সবাই।

পরিবারে কেউ কারো সাথে কিছু শেয়ার করতে চায় না। এতে একদিকে যেমন পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলকে সচেতন হতে হবে। ইতিবাচকতা ও মানবকল্যাণে লাগানোর মধ্য দিয়েই প্রযুক্তির সার্থকতা নিহিত। এ প্রযুক্তি যেন সর্বনাশের বাহন না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

[খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ, ৪ এপ্রিল ২০১৮]

ফেসবুক নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

অধিকাংশ মানুষ বিশেষত তরুণরা এখন এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। আজ পরিবারগুলোও বিচ্ছিন্নতাবোধের নির্মম শিকার। একটা সময় সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো ছিল মানুষে মানুষে মিলনের কার্যকর ক্ষেত্র। যেমন : গ্রন্থাগারে যাওয়া, গান-আবৃত্তি-নাটকে সবাই মিলে অংশ নেয়া, একসাথে সিনেমা দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের প্রায় কিছুই এখন নেই। এর প্রতিকারের জন্যে চাই সামাজিক যোগাযোগ। ফেসবুকের যোগাযোগ নয়, দরকার প্রত্যক্ষ মানবিক যোগাযোগ।

[শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যে আসক্তির কারণে কমে যাচ্ছে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা

অধ্যাপক ডা. আবিদ হোসেন মোল্লা

এখনকার শিশুরা অনেক রাত করে ঘুমাতে যায়। রাত জেগে টিভি দেখাটা সে শিখছে বাবা-মা ও পরিবারের বড়দের কাছ থেকে। কম ঘুমের ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা কমে যাচ্ছে। এতে বাড়ছে মেদস্থূলতা, চোখ-কানেরও ক্ষতি হচ্ছে। লেখাপড়াতেও তাদের মনোযোগ কমে যাচ্ছে। স্মার্টফোনসহ এ ধরনের সকল প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবহার সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

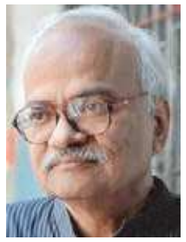

শিশুদের নিয়ে ৪১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি–সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, সে চায় দৃষ্টান্ত। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকেই আয়ত্ত করে।

মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য।

[কবি, লেখক ও কলামিস্ট। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

তরুণদের ২৪ ঘণ্টাই আসক্ত করে রাখছে স্মার্টফোন

অধ্যাপক ডা. জহির উদ্দিন আহমাদ

মাদকাসক্তরা সাধারণত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে মাদক গ্রহণ করে। কিন্তু স্মার্টফোন-ইন্টারনেট-ফেসবুক আসক্তি ২৪ ঘণ্টাই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। এতে আসক্তরা কর্মক্ষেত্রে, খাবার টেবিলে, এমনকি টয়লেটে গিয়েও স্মার্টফোন চালাতে থাকে।

আমি মনে করি, ১৮ বছর বয়সের আগে কেউ স্মার্টফোন পেলে এর অপব্যবহার বেশি হবে। এসব থেকে বাঁচতে হলে সন্তানকে ধর্মের শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পরিবারে নৈতিক শিক্ষা শুরু করতে হবে। এ-ছাড়াও মেডিটেশন চর্চা তরুণ প্রজন্মকে ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

[বিভাগীয় প্রধান, মানসিক ও স্নায়ুরোগ বিভাগ, শাহাব উদ্দিন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

স্মার্টফোন-ফেসবুক আসক্তিতে মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

স্মার্টফোন ও ফেসবুক আসক্তি তরুণ প্রজন্মের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে চলেছে। এতে তাদের মানসিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। আমি মনে করি, অন্যান্য রোগের মতো এসবে আসক্তিও এক ধরনের রোগ, যার চিকিৎসা প্রয়োজন।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কোয়ান্টাম রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি

অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না, শান্তি ছিল। এখন ফেসবুক না দেখে আমরা দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না–কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে রাতে আমাদের ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না! এভাবে নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, সচেতনতা বাড়ে নি। এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

[মনোচিকিৎসক ও কথাসাহিত্যিক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম

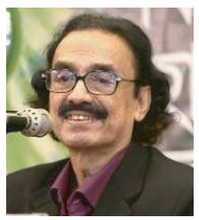

সারাদিন যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে করতে যে মানুষ একেবারে যন্ত্রের বশীভূত হয়ে গেছে, তাকে যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে। কিন্তু পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নৃশংসতা লোভ ঘৃণা যুদ্ধ ও গণহত্যা! কমছে মমত্ববোধ ও সম্প্রীতি। তাই এ কালে আমাদের অর্জন অনেক–এটা সত্যি, কিন্তু বিসর্জনও কম নয়।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনতত্ত্বের অধ্যাপক ও লেখক। মুক্ত আলোচনায় প্রদত্ত বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ]

যারা ফেসবুক নিয়ে আছে, তাদের মধ্যে বড় কিছু নেই

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আজো যারা ফেসবুক নিয়ে পড়ে আছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই বড় কিছু নেই। তারা খুবই সাধারণ। যাদের মধ্যে বড় কিছু আছে, যারা উচ্চতর মানুষ, তারা সবসময় বই চায়। কারণ তারা চিন্তা করতে চায়, গভীর জায়গায় যেতে চায়। জীবনকে সার্থক করতে চায়।

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে একথা বলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯]

গ্যাং কালচার শেখায় গেমস

অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বর্তমান পরিস্থিতির দায় প্রথমত পরিবারের, দ্বিতীয়ত শিক্ষাব্যবস্থার। পরিবারগুলোর চিন্তা এখন বৈষয়িক উন্নতিকেন্দ্রিক। এতে করে দুর্নীতির বিশাল বিস্তার ঘটেছে এবং পরিবারগুলো নৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে। এর একটা প্রভাব শিশু-কিশোরদের ওপর পড়ছে। সনদনির্ভর লেখাপড়া শিশুদের বিনোদন বা অবসর দিতে পারে না। তারা গেমস খেলে বা ফেসবুক ব্যবহার করে। গেমস গ্যাং কালচার শেখায়, খেলার মাঠে দলের যে ধারণা তৈরি হয় তা শেখায় না।

[ঢাকার উত্তরায় কিশোরদের গ্যাং কালচার-এর দৌরাত্ম্য এবং নৃশংসতার প্রসঙ্গে একথা বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। দৈনিক প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮]

আধুনিক গ্যাজেট ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের অন্তরায়

অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতার

নবজাতকের মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটে। আর এভাবেই বিকশিত হয় তার মস্তিষ্ক। যোগাযোগের সুবিধার্থে শিশুর মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে তৈরি হয় প্রায় ৭০০টি সিন্যাপস। এ পুরো প্রক্রিয়াটির ফলাফল ভালো না মন্দ হবে, তা নির্ভর করে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ওপর।

তাই শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজন পরিবেশের যথাযথ উদ্দীপনা ও সাড়া দেয়ার সুযোগ। যেমন : শিশু যখন কিছু নিয়ে প্রশ্ন করে বা কৌতূহলী হয় তখন পরিবারের সদস্যরা সেটির সাথে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু টিভি, মোবাইল ফোন, ট্যাব শিশুকে একতরফা কিছু উদ্দীপনা দিতে থাকে– যেখানে শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বা ভাবের আদান-প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। এটি তার মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়। এতে শিশুর মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও নবজাতক ইউনিটের প্রধান, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে

আসাদুজ্জামান নূর

ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কার্টুন, এখন এই হলো একটা শিশুর জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথাবার্তা হয়, তা-ও না। সবাই টিভি-সিরিয়াল আর খেলার চ্যানেলে ব্যস্ত। এভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

[মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন সংস্কৃতিমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর]

১৬ বছর বয়সের আগে মোবাইল ফোন ব্যবহার নয়

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বিপজ্জনকের চেয়েও বেশি কিছু। মোবাইলে ১৫ মিনিট কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়ে, শিশুদের ক্ষেত্রে যা আরো বেশি। তাই ১৬ বছর বয়সের নিচে মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

দেশে এখন থাইরয়েড ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব আগের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। এর সম্ভাব্য প্রধান কারণ লোকালয়ে অনিরাপদ উচ্চতায় মোবাইল ফোনের টাওয়ার স্থাপন এবং মোবাইল ফোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

[মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বিএসএমএমইউ-এর প্রাক্তন উপাচার্য ও নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত]

সন্তানকে প্রযুক্তিপণ্য দেয়ার আগে শতবার চিন্তা করুন

অধ্যাপক ডা. মনীষা ব্যানার্জী

বর্তমানে অধিকাংশ মা-বাবাই শিশুকে ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখিয়ে খাবার খাওয়ান। এতে করে শিশুটি কী খাচ্ছে, খাবারটির স্বাদ-গন্ধ কেমন, রঙের তফাৎ কতটা–কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সাধারণত শিশু খাবার মুখে নিয়ে প্রথমেই এর স্বাদ বোঝার চেষ্টা করে। পাকস্থলী এবং হজম প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সব অর্গান এসময় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনমতো পাচক রস নিঃসরণ করে। ফলে খাবার সঠিকভাবে হজম হয়।

অথচ শিশুটি ভিডিও দেখে খেতে অভ্যস্ত হলে তার মনোযোগ থাকে টিভি বা স্মার্টফোনের দিকে, খাবারের দিকে নয়। এভাবে চলতে থাকলে তার হজম প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে যায়। সন্তানকে কোনো প্রযুক্তিপণ্য দেয়ার আগে অভিভাবকদের শতবার চিন্তা করতে হবে, এর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, নবজাতক বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

বর্তমানে মোবাইলসহ অন্যান্য গ্যাজেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। স্মার্টফোন আর এ ধরনের ডিভাইসগুলোর কারণে ক্রমেই চিন্তাভাবনা করার সামর্থ্য আমরা হারিয়ে ফেলছি।

আমরা যদি কায়িক পরিশ্রম না করি, দৌড়াদৌড়ি না করি তাহলে হাত-পায়ের পেশি সবল হবে না। তেমনি আমরা যদি চিন্তা না করি, তাহলে মস্তিষ্কও সবল হবে না। যদি মোবাইলে কথা বলায় ব্যস্ত থাকি, তাহলে চিন্তাশক্তিও কখনো বিকশিত হবে না।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, দেখা করা, অনুভূতির আদান-প্রদান, সবকিছুই এখন মোবাইলে আর ইন্টারনেটে। এগুলো অর্থেরও অপচয়। এ যুগে তরুণদের অনেকের মধ্যেই নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠছে না। তাই স্মার্টফোনসহ প্রযুক্তিপণ্যের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

[শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক। কোয়ান্টাম বুলেটিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ]

আসক্তি মুক্তির অভিজ্ঞতা

ভার্চুয়াল ভাইরাস মুক্ত হতে সম্প্রতি উদ্যোগী হতে শুরু করেছেন চারপাশের সচেতন মানুষ। ব্যক্তিভেদে আসক্তির মাত্রা ও ভোগান্তি যেমন আলাদা, তেমনি বৈচিত্র্যময় একেকজনের আসক্তি মুক্তির পদক্ষেপ। এ পথে কখনো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মা-বাবা, পরিবারের সদস্যরা; কখনো স্রোতের বিপরীতে উদ্যোগী হতে হয়েছে নিজেকেই। ভার্চুয়াল ভাইরাস নামের প্রবল এ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, এমনই কয়েকজন কোয়ান্টাম সদস্য জানিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা।

আমি আসক্ত নই, তাই দৃঢ়তার সাথে সন্তানদের বলতে পারি

আমার ছেলে এখন কলেজে পড়ে। সে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় ফেসবুক ও ভার্চুয়াল গেম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সারাদিন কম্পিউটারের সামনে বসে থাকত, পরিবারের কারো সাথে সেভাবে কথাও বলত না। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। একসময় লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া শুরু করল। কিছু বললে রাগ করত, মারমুখী হয়ে যেত।

ছেলের এ পরিবর্তন আমাকে খুব কষ্ট দিত, দুঃশ্চিন্তাও করতাম। এর মধ্যে কোয়ান্টামের এক প্রোগ্রামে গুরুজীর আলোচনায় অটোসাজেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম। I can I will এই অটোসাজেশনটি চর্চা করে লেখাপড়ায় সাফল্য পেয়েছে, এমন দুই বোনের ঘটনা শুনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হলাম সেদিন। মনে হলো, ছেলেকে আবার সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে আনতে হলে আমাকেও এ চর্চাগুলো করতে হবে ও প্রো-একটিভ হতে হবে।

আমি প্রতিদিন ঘুমানোর সময় ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম, ভালো ভালো কথা বলতাম, কোরআন পড়ে শোনাতাম, সবসময় I can I will বলতে উদ্বুদ্ধ করতাম। ছেলের জন্যে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দানের টাকা রাখতাম। সাধ্যমতো সদকা হিলিংয়ে নাম দেয়া ও কোরআন মর্মবাণী বিতরণ চলতে থাকল। আমি প্রতি শুক্রবার সপরিবারে সাদাকায়নে যেতাম। সন্তানকে নামাজ ও মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতাম।

ছেলের সাথে কখনো রাগারাগি বা ঝগড়ায় যেতাম না, কৌশল অবলম্বন করতাম। কোনো অন্যায় করে সে ধরা পড়লে এবং অনুতপ্ত হলে কঠোর না হয়ে তাকে শোধরানোর সুযোগ দিয়েছি। ভালো অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করায় প্রশংসা করেছি।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! বর্তমানে আমার ছেলে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত এবং সে তার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছে। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে কী কী করতে হবে তা সে পড়ার টেবিলের সামনে বোর্ডে লিখে রেখেছে। সারাদিনের একটি রুটিন তৈরি করেছে এবং তা অনুসরণ করছে।

সন্তানকে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে আমার দেড় বছর সময় লেগেছে। আর এ কাজটি সহজ হয়েছে দুটো কারণে। প্রথমত, কোয়ান্টামের আত্ম উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজে আমি যুক্ত থেকেছি। ফলে সবসময় বিশ্বাস করতে পেরেছি– আমি পারব। দ্বিতীয়ত, টিভি সিরিয়াল, ফেসবুক, আড্ডা–এ ধরনের কোনো আসক্তি আমার নেই। এজন্যে সন্তানদেরও আমি ভালো কাজের কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি। কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্যে।

সন্তানদের ফেসবুক থেকে দূরে রাখতে কুশলী হয়েছি

বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজন আছে ভেবেই বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ নিয়েছিলাম। সন্তানরা কম্পিউটার নিয়ে প্রায় সারাদিন পড়ে থাকছে দেখেও আমি সেভাবে গুরুত্ব দেই নি। পরবর্তীতে কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে জানতে পারলাম এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে। সচেতন হলাম এবং বুঝতে পারলাম বাসায় ইন্টারনেটের ব্যবহার বেশি হচ্ছে।

একদিন বাসায় ফিরে বেশ কঠোরভাবে বললাম যে, এ বাসায় হয় ইন্টারনেট থাকবে বা আমি থাকব। খুবই বিস্মিত হলাম যখন আমার বাচ্চারা বলল– 'ইন্টারনেট লাইন থাকবে, তুমি বাসা থেকে বের হয়ে যাও।' বুঝলাম, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং পরিবারের সাথে লড়াই করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম, জোর করে সন্তানদের সাথে সুবিধা করতে পারব না, আমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

সমস্যা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না করে আমি সমাধানের দিকে মনোযোগী হলাম। প্রথমেই যোগাযোগ করলাম ইন্টারনেট সংযোগ অপারেটরদের সাথে। তাদেরকে বললাম, বাসার ইন্টারনেটের স্পিড কমিয়ে দিতে। একই পরিমাণ বিল দিতে আমি রাজি, কিন্তু ফেসবুক-ইউটিউব চালানোর মতো স্পিড যেন না থাকে।

এ কৌশল অবলম্বন করার পর দেখলাম, বাচ্চারা ইন্টারনেটে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। দুই মাসের মধ্যে তাদের অপ্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহার কমে গেল।

ভার্চুয়াল ভাইরাস বুলেটিন, ফোল্ডার, স্টিকার বিতরণ করার ও ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা লিখে পাঠান– bulletin@quantummethod.org.bd

এখন আমি সময়কে কাজে লাগাতে পারছি

সামাজিকতা রক্ষার নাম করে আমি সারাদিন ফেসবুকিং করতাম। এটা কীভাবে একজন সামাজিক মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে, সেটা আমি বুঝতাম না। তবে আমি বলব, আমার এ অভ্যাসের ক্ষেত্রে মা-বাবার মৌন উৎসাহ ছিল। সমাজের অধিকাংশ মা-বাবার মতো তাদেরও ধারণা ছিল, ছেলে বাইরে গিয়ে অন্যদের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং মোবাইল-কম্পিউটার নিয়ে ঘরে থাকুক। সন্তান চোখের সামনে আছে, তার মানেই ভালো আছে।

এভাবেই ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়া আমার জীবনের অংশ হয়ে গেল। ফেসবুকে সময় নষ্টের বিষয়টা সবসময় আমার চোখ এড়িয়ে যেত।

যখন কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নিতে শুরু করলাম, দেখতাম কোয়ান্টাম খুব জোর গলায় বলছে ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক নিয়ে। ফেসবুক-ইন্টারনেট কীভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যাহত করছে, মূল্যবান সময় নষ্ট করছে, সে-সম্পর্কে কোয়ান্টামের অনেক লেখা পড়লাম। তারা বলছে ভার্চুয়াল জগৎ থেকে দূরে থাকলে আপনি ভালো থাকবেন, জীবন সুন্দর হবে।

প্রথমদিকে এ কথাগুলো আমাকে সেভাবে প্রভাবিত করে নি। কখনো কখনো ব্যবহার কমিয়েছি কিন্তু ফেসবুক পুরোপুরি বন্ধ করি নি। কিন্তু এবছর ভার্চুয়াল ভাইরাস স্টিকার ক্যাম্পেইনের সময় আমার মনে হলো, একবার চেষ্টা করেই দেখি। ফেসবুকের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাদেরকে বললাম, আমাকে ফেসবুকে পাবে না। খুব জরুরি হলে ফোন করবে।

> ফেসবুক না থাকাতেই বরং আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুদের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো হতে শুরু করেছে।

ফেসবুক বন্ধ করার পর প্রথমদিন আমার সাধারণভাবেই কেটে গেল, করার কিছু পাচ্ছিলাম না বলে বই পড়তে শুরু করলাম। রাতে দীর্ঘসময় ফেসবুকে বসে থাকা নেই, তাই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন অবাক হয়ে দেখলাম, আমি ভোর ৬টায় ঘুম থেকে উঠে গেছি এবং অনেকদিন পর ফজরের নামাজ পড়লাম।

এভাবে তিন দিন যেতে না যেতেই আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা হতে লাগল ফেসবুকে লগ ইন করার–'আমার বন্ধুরা কী করছে? তারা কোথায় বেড়াতে গেল কিনা? কারো নতুন কোনো খবর আছে কিনা? আড্ডার নতুন টপিকটা মিস করলাম নাকি? নিউজফিডের নিউজগুলো মিস হয়ে যাচ্ছে! অন্যদের সাথে আমার সম্পর্কগুলো তো হালকা হয়ে যাচ্ছে।' মাথায় এমন নানা চিন্তা ঘুরতে লাগল।

আবার একইসাথে বিপরীত চিন্তাও আসতে লাগল। কেন আমি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারছি না? ফেসবুক কি আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ? একসময় উপলব্ধি করলাম আমি আসলে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। যেভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণ করে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্ককে, ঠিক সেভাবে ফেসবুকও নিয়ন্ত্রণ করছে আমাকে। তখন আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠলাম আমি।

ফেসবুক বন্ধ করার পর আমার জীবন অনেক সুশৃঙ্খল হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় যেসব কাজ আমি করব করব বলে ভাবতাম কিন্তু করা হতো না, এখন অনায়াসেই সে কাজগুলো করতে পারছি। প্রতিদিন ঠিকমতো খাওয়া, পড়ালেখা, পর্যাপ্ত ঘুম, মেডিটেশন, ব্যায়াম, পরিবারের কাজে সহযোগিতা করাসহ অনেক কিছু করা যায়। এখন আমি সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ফেসবুক না থাকাতেই বরং বন্ধু ও আত্মীয়-পরিজনদের সাথে আমার সম্পর্ক আরো ভালো হতে শুরু করেছে। আর এসব সম্ভব হলো ছোট্ট একটি সিদ্ধান্তের কারণে– আমি আর ফেসবুক ব্যবহার করব না।

মনোযোগ লুটের অর্থনীতি

আপনার স্মার্টফোনটির কল্যাণে গুগল ম্যাপের মতো কোম্পানিগুলো খোঁজ রাখে আপনি কোন রেস্তোরাঁয় খেতে যান, কোন শপিং মলের কোন দোকান থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করেন। আবার ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো জানে, আপনার বন্ধু কারা, তাদের সাথে কোন বিষয়ে কথা বলতে আপনি আগ্রহী, কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনার আড্ডার রসদ পান।

একজনের ওয়েবসাইট ভিজিটের তথ্য মিলিয়ে তার দৈনন্দিন অভ্যাসের প্রোফাইল তৈরি করা টেক কোম্পানিগুলোর জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার। যেহেতু দৈনন্দিন কাজের বেশিরভাগই আমরা করি অভ্যাসচক্রের অংশ হিসেবে, তাই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা না হয়েও বলতে পারে, কী হতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড!

ফেক ব্লগ ও ওয়েবসাইট তৈরি করে তারা বাধ্যও করতে পারে ব্যক্তিকে তাদের বেছে দেয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে। কীভাবে? যেমন, চ্যাটিং-এর সময় বন্ধুকে আপনি জানালেন ইদানীং বেশ দুর্বল লাগে। এরপর হঠাৎ দেখলেন, আপনার নিউজফিডে *দুধের চেয়ে শক্তিদায়ক* খাবারের বিজ্ঞাপন আসছে। প্যাকেটজাত খাবারের চেয়ে দুধ যে স্বাস্থ্যকর, তা আপনি জানেন। কিন্তু কয়েকদিন বিজ্ঞাপন দেখার পর আগ্রহবশত ইন্টারনেটে সেরা দশ স্বাস্থ্য-বিষয়ক ওয়েবসাইট খুঁজে বের করলেন। এরপর সেরা দুটো ওয়েবসাইটে সেই খাবারের গুণাগুণ পড়ে সেটা কিনলেনও।

আপনি মনে করছেন, আপনি খাবারটি কিনছেন দেখে-শুনে। কিন্তু সত্য হলো, আপনি কিনছেন টেক কোম্পানিগুলোর সাজানো ফাঁদে পা দিয়ে।

ঠিক এভাবেই কেমব্রিজ এনালিটিকা, ফেসবুক ও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে পণ্য কিনতে; এমনকি ভোটাধিকার প্রয়োগের বেলায়ও। যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ কোটি ভোটারকেও তারা প্রভাবিত করেছে এভাবেই। ফেক ব্লগ তৈরি করে, ফেক আইডি থেকে গুণকীর্তন করে প্রতারিত করেছে ভোটারদের সিদ্ধান্ত নিতে।

কারণ ফেসবুক, ইউটিউব, স্ন্যাপচ্যাট, টুইটার প্রভৃতি কোম্পানিগুলোর আয়ের উৎস ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়া বিজ্ঞাপন। যত বেশি বাড়বে ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং যত বেশি সময় মানুষ কাটাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, তত বেশি বিজ্ঞাপন সে পাবে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে।

গুগলের সাবেক ডিজাইন নীতি-নির্ধারক ত্রিস্তান হ্যারিস একে ব্যাখ্যা করেছেন *মনোযোগ লুটের অর্থনীতি* হিসেবে। ২০১৭ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এ কৌশল প্রয়োগ করে বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকা মাত্র!

সিএনএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকানরা দিনে গড়ে প্রায় ১১ ঘণ্টা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যয় করে। অর্থাৎ ঘুম বা কাজের চেয়ে বেশি সময় তারা সেঁটে থাকে ডিভাইসের স্ক্রিনের সাথে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নয় পুঁজিপতিরা।

বিনোদন প্রতিষ্ঠান নেটফ্লিক্স-এর প্রধান নির্বাহী রিড হ্যাস্টিংস বলেছেন, 'ফেসবুক বা ইউটিউব নয়। আমাদের প্রধান প্রতিযোগী মানুষের ঘুম।' বর্তমানে প্রতি তিন জনে একজন আমেরিকান অনিদ্রায় ভোগে, তারপরও এমন বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়– এ প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সেবা (!) দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র : বিবিসি, ৩০ মার্চ ২০১৮ ও এইচবিও-তে প্রকাশিত ত্রিস্তান হ্যারিসের সাক্ষাৎকার, ২ জুন ২০১৭

আপনি কতটা আসক্ত?

ড. কিম্বারলি ইয়াং। ইন্টারনেট আসক্তি বিষয়ে বিশ্বের প্রথমসারির একজন বিশেষজ্ঞ। ১৯৯৫ সালে তিনি আমেরিকায় সেন্টার ফর ইন্টারনেট অ্যাডিকশন প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্ভাবিত প্রশ্নমালা অনুসারে জেনে নিন ইন্টারনেটে আপনি কতটা আসক্ত—

উত্তর	না	কদাচিৎ	মাঝে মাঝে	প্রায়ই	সবসময়
স্কোর	১	২	৩	৪	৫

- কখনো কি মনে হয় প্রয়োজনের বেশি সময় ইন্টারনেটে ব্যয় করেন?
- পরিবারকে সময় দেয়ার চেয়ে ইন্টারনেট চালাতে বেশি পছন্দ করেন?
- কাজ বা পড়াশোনা কি ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে প্রায়ই বিঘ্নিত হয়?
- 'ইন্টারনেটে এতক্ষণ কী করেন?' এর উত্তরে কি সত্য বলতে পারেন?
- দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার চেয়ে কি সোশ্যাল মিডিয়ায় অলস সময় কাটাতে ভালো লাগে?
- অফলাইন বা কাজের সময় কি প্রায়ই মনে হয়, কখন অনলাইন হবো?
- রাত জেগে ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে ক্লাসে বা অফিসে কি প্রায়ই আপনার ঘুম পায় বা ক্লান্তিবোধ করেন?
- সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা অবস্থায় কি মনে হয় 'আর মাত্র কয়েক মিনিট' কিন্তু বের হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়?

স্কোর ৮-১৮ : স্বাভাবিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।

স্কোর ১৯-২৯ : ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহার মাঝে মাঝে আপনার স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটায়। এখনই সময় সচেতন হওয়ার।

স্কোর ৩০-৪০ : আপনি আসক্ত। ইন্টারনেট আপনার জীবন থেকে কী নিচ্ছে, তা ভালোভাবে পর্যালোচনা করুন। বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করুন, ব্যবহারের মাত্রা ঠিক করুন।

ওদের পৌষমাস আমাদের সর্বনাশ

কোটি কোটি শিশু-কিশোর-তরুণের মস্তিষ্কের চূড়ান্ত সর্বনাশ করলেও প্রযুক্তি-উদ্ভাবকরা ঠিকই আগলে রাখেন নিজ সন্তানদের। অ্যাপলের কর্ণধার স্টিভ জবস কখনো সন্তানদের আইপ্যাড ব্যবহার করতে দেন নি। ফেসবুকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট চামাথ পালিহাপিতিয়া সাত বছর ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর গুরুদায়িত্বে থাকলেও নিজে ফেসবুক ব্যবহার করেন না। তিনি এ-ও বলেছেন, My kids are not allowed to use that shit.

ফেসবুক পোস্ট/ ছবিতে 'লাইক' পাওয়ার জন্যে মানুষ কত উদ্ভট কাণ্ডই না করে! এই লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে সযত্নে *লাইক* বাটনটি সরিয়ে দিয়েছেন আসক্ত হয়ে পড়ার ভয়ে। টুইটারের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও ইভান উইলিয়ামসের দুই শিশুপুত্র আইপ্যাডের জন্যে বহু আবদার করলেও তিনি নাকচ করে দেন। আইপ্যাডের বদলে ওদের তিনি কিনে দিয়েছেন কয়েকশ বই।

শৈশবেই কম্পিউটার ও স্মার্টফোন জাতীয় যন্ত্র ব্যবহারে শিশু অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সৃজনশীলতা, মনোযোগ ও ভাব আদান-প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। গুগল অ্যাপল ইয়াহু-র এক্সিকিউটিভরা এ সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানেন। তাদের কয়েকজন স্বীকার করেছেন, তেল ও জলের মতো লেখাপড়া ও কম্পিউটারও মিশ খায় না। তাই সন্তানদের এমন স্কুলে পাঠান যেখানে কম্পিউটার-স্মার্টফোন-ট্যাবের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল দেশে শিক্ষা-সংশ্লিষ্টরা একটি সমস্যা নিয়ে বেশ চিন্তিত। তা হলো–ক্লাসরুমেও ছাত্রছাত্রীরা মোবাইলে মেসেজ চালাচালি করছে। টিফিনের বিরতিতেও খেলাধুলায় আগ্রহ নেই। আসক্তের মতোই তারা ডুবে থাকছে ভার্চুয়াল জগতে। এ সমস্যার বিহিত করতে না পেরে ফ্রান্স ২০১৮ সাল থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্কুলে মোবাইল ফোন আনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি ২০১৮

ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার শিশুদের জন্যে গাইডলাইন

যুক্তরাষ্ট্রের শিশু বিশেষজ্ঞদের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস। ২০১৬ সালে তারা শিশুদের সুরক্ষায় একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এতে বলা হয়েছে, সব বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করা উচিত।

আসক্তির নতুন ফাঁদ অনলাইন শপিং

অনলাইন শপিং বিশ্বজুড়ে রূপ নিয়েছে আসক্তির এক নতুন ফাঁদে। এ কেনাকাটা এখন আর প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ নেই, পৌঁছে গেছে আসক্তির পর্যায়ে। গ্রিনপিস-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, হংকংবাসী প্রতি বছর যে অতিরিক্ত পোশাক ফেলে দেয় তার পরিমাণ এক লক্ষ ১০ হাজার টন! অর্থাৎ জনপ্রতি ১৫ কেজি। এর অধিকাংশই ক্রেডিট কার্ড ও অনলাইনে কেনা।

বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বর্তমানে ফেসবুকসহ ওয়েবভিত্তিক অনলাইন শপ রয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি। বছরে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার পণ্য কেনাবেচা হচ্ছে অনলাইনে!

অস্বাভাবিক পণ্যপ্রীতি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। তাই অনলাইনে পণ্য যতই আপনার হাতের নাগালে থাকুক, আসক্তির কানাগলিতে ঢুকে পড়ার আগেই সচেতন হোন।

তথ্যসূত্র : ডয়েচে ভ্যালে, ১৬ মে ২০১৭
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, ৫ আগস্ট ২০১৭

ফেসবুক ডিলিট করুন সুখে থাকুন

জীবনকে সহজ করতে চান? হতে চান সুখী? তবে আপনার ফেসবুক একাউন্টটি ডিলিট করুন। আজই। আপনার ভালো থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে বহুগুণ। এমনটাই মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকবৃন্দ।

আড়াই সহস্রাধিক ফেসবুক ব্যবহারকারীর ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করেন গবেষক দলটি। যার অর্ধেকই একমাসের জন্যে বন্ধ রেখেছিল নিজেদের ফেসবুক একাউন্ট। মাস শেষে দেখা যায় উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন। যারা ফেসবুক বন্ধ রাখতে পেরেছিল তাদের দুশ্চিন্তা ও হতাশার পরিমাণ কমে গেছে, উপরন্তু জীবনের প্রতি বেড়েছে আশাবাদ।

বিশ্বজুড়ে ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন এখন রূপ নিয়েছে গণসচেতনতায়। তথ্যচুরির ঘটনায় গত একবছরে বিশ্বব্যাপী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই ফেসবুকের সাথে সম্পর্কের ইতি টেনেছেন। ডিলিট করে দিয়েছেন নিজেদের ফেসবুক একাউন্ট।

ইতোমধ্যেই রকেট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান *স্পেসএক্স* ও ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা *টেসলা*-র উদ্যোক্তা এলন মাস্ক ফেসবুক একাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছেন, ফেসবুকে যার অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২৬ লক্ষ। এদিকে *অ্যাপল*-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক সরে দাঁড়িয়েছেন ফেসবুক থেকে। হলিউড-বলিউড তারকারাও তথ্য-নিরাপত্তার শঙ্কায় ডিলিট করছেন ফেসবুক একাউন্ট।

কারণ ফেসবুক ও মেসেঞ্জারে দেয়া তথ্য বা ছবি আপনি ডিলিট করলেও তা ঠিকই সংরক্ষণ করছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ও ২৩ মার্চ ২০১৮
ইউএসএ টুডে, ৯ এপ্রিল ২০১৮

আপনার করণীয়

বর্জন করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

বিনোদনের জন্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবেন না। ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন করুন।

রাত জাগার অভ্যাস ত্যাগ করুন

প্রয়োজন ছাড়া রাত্রি জাগরণ ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এ থেকে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাত ১১টার পর মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটার-জাতীয় সকল গ্যাজেট বন্ধ রাখুন। সন্তান সারাক্ষণই রুমের দরজা বন্ধ করে রাখছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

সন্তানের বন্ধু হোন, তাকে পরিবারের অংশ করে নিন

সন্তানকে বকাঝকা নয়, উদ্বুদ্ধ করুন। তাকে ঘরের কাজে সম্পৃক্ত করুন। সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। আসক্ত হওয়ার মতো অবসর সময় যেন সন্তানের না থাকে। ভাইবোনের সাথে শেয়ার করতে শেখান তাকে। আপনিই হোন তার প্রথম ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু।

পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মের শাশ্বত শিক্ষা মেনে চলুন

নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী নিয়মিত পাঠ করতে, অনুধাবনে ও অনুশীলনে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও অনুশীলন করুন।

আপনার সন্তানের রোল মডেল আপনিই

আপনার কথা নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার আচরণ। আপনি ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত হলে সন্তানকে এ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। তাই আগে নিজে ফেসবুক বর্জন করুন, সন্তানকেও এ থেকে দূরে রাখুন।

১৮'র আগে স্মার্টফোন নয়

সন্তানের আবদার মেটাতে বা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে গিয়ে ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দেবেন না। ঘরে শিশুরা থাকলে স্মার্ট টিভিকে না বলুন। কারণ কৌতূহলের বশে সে সহজেই ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। শোবার ঘরে মোবাইল ফোন বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস রাখবেন না।

মেডিটেশনকে পারিবারিক রেওয়াজে পরিণত করুন

যেসব সঙ্গ আসক্তির কানাগলিতে ঠেলে দেয়, তাদের পরিত্যাগ করুন। পরিবারের সবাই মিলে প্রতি বৃহস্পতিবার পারিবারিক মেডিটেশন করুন। সপরিবারে ফাউন্ডেশনের সাদাকায়ন, আলোকায়ন ও আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে অংশ নিন।

এগিয়ে আসুন সৃষ্টির সেবায়

গবেষণা বলছে, মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কাজ হতাশা-বিষণ্ণতা-একাকিত্বের অনুভূতি হ্রাস করে। বাড়ায় আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা। তাই সাধ্যমতো নিবেদিত হোন সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে।

প্রযুক্তিদক্ষ হোন
ভার্চুয়াল ভাইরাস
থেকে বাঁচুন!

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

মার্চ ২০১৯

মহাজাগতিক সফরে

মওলানা ছায়ীদুল হক

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও খতিব এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল মওলানা ছায়ীদুল হক। ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি যাত্রা করেছেন মহাজাগতিক সফরে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯ ব্যাচে অংশ নেন মওলানা ছায়ীদুল হক। মনেপ্রাণে ও জীবনাচারে ধারণ করেন কোয়ান্টামের বাণী ও শিক্ষাকে। এরপর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি ফাউন্ডেশনের সাথে ক্রমশ হয়ে ওঠেন আরো একাত্ম।

২০১২ সালে লামায় মসজিদ উদ্বোধনকালে পাঁচ সহস্রাধিক কোয়ান্টাম সদস্য ও এলাকাবাসীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম জুমা তিনিই পরিচালনা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর রমজানে প্রথম জুমার দিনে তার পরিচালনায় ইফতারপূর্ব দোয়া অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে ফাউন্ডেশনের একটি উল্লেখযোগ্য বাৎসরিক কার্যক্রম।

তার পরিচালনায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে লামার কোয়ান্টামমে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল রমজানে এতেকাফ এবং প্রো-মাস্টার ও গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন।

এসব কার্যক্রমে তিনি তার সহজাত পাণ্ডিত্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরতেন ইসলামের আলোকে ধ্যান, দান ও সঙ্ঘবদ্ধতার গুরুত্ব। ব্যাখ্যা করতেন কোয়ান্টাম চেতনার উপযোগিতা।

মওলানা ছায়ীদুল হকের সামগ্রিক অবদান আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমরা তার মাগফেরাত কামনা করি।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সেবার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে তুলছে কোয়ান্টাম

মানবসেবা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। রক্তদাতারা স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে এমন একটি সেবা করে যাচ্ছেন। আমি বলব এটা একটা বড় সেবা–যার মধ্যে আনন্দ আছে, তৃপ্তি আছে। সেবার মধ্য দিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়, এগিয়ে যায়। নানারকম কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সমাজে এমনই একটি ঐক্য গড়ে তুলছে কোয়ান্টাম।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি। জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ন্যূনতম ১০, ২৫ ও ৫০ বার রক্তদান করেছেন এমন ৩০৯ জন রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, রক্ত তো তৈরি করা যায় না। একজন মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে সে আরেকজন মানুষের কাছ থেকেই সেটা পায়। আমি নিজেও দেখেছি, জরুরি রক্তের প্রয়োজনে রোগীর পরিবারের লোকজনকে কীভাবে হাসপাতালে ছোটাছুটি করতে হয়। স্বেচ্ছাদাতার কাছ থেকে না পেলে বাধ্য হয়ে তাদেরকে পেশাদার রক্তদাতার শরণাপন্ন হতে হয় এবং তাতে নানা জটিল ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, এমনকি থাকে সেই রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। কোয়ান্টাম এ-পর্যন্ত ১০ লক্ষ ইউনিটেরও বেশি রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে। তাই আমি বলব– কোয়ান্টামের এ কাজটি অব্যাহত থাকুক। সেইসাথে স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের জানাই আমার অভিনন্দন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশে এখন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও ক্যান্সারের মতো রোগগুলোর প্রকোপ বাড়ছে। তাই আমি আপনাদের আহ্বান জানাই–আমরা যেন খাবারের ব্যাপারে যত্নবান হই, চর্বিজাতীয় খাবার কম খাই, ফলমূল-শাকসবজি বেশি খাই। পরিশ্রমটা বেশি করি। আর বর্তমান যুগে আধুনিক মানুষের জীবনে টেনশন অনেক বেশি। সে বিবেচনায় বলা যেতে পারে, কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। মানুষের কল্যাণে কোয়ান্টাম এ ধরনের ভালো উদ্যোগ ও কাজগুলো চালিয়ে যাবে–এটাই আমার প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এবিএম ইউনুস।

মহাজাগতিক সফরে

শাহ আলমগীর

দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহ আলমগীর ২৮ ফেব্রুয়ারি মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

শাহ আলমগীর সম্প্রতি (নভেম্বর ২০১৮) কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৫২ ব্যাচে অংশ নেন। প্রত্যয়নে তিনি বলেন, খুব অল্প মানুষই সমাজ ও দেশ নিয়ে ভাবেন। আমরা সমাজের যত রূপান্তর দেখছি, তা সেই অল্প সংখ্যক মানুষই করেছেন। কোয়ান্টাম তা-ই করে যাচ্ছে। কোয়ান্টামের বাণী যত ছড়িয়ে পড়বে এদেশ তত সমৃদ্ধ হবে।

উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক কিশোর বাংলা পত্রিকায় যোগ দিয়ে তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। এরপর দৈনিক জনতা, বাংলার বাণী, আজাদ, সংবাদ, প্রথম আলো এবং চ্যানেল আইয়ের প্রধান বার্তা সম্পাদক, একুশে টেলিভিশনে হেড অব নিউজ, যমুনা টেলিভিশনে পরিচালক (বার্তা) ও মাছরাঙা টেলিভিশনে বার্তা প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

কোয়ান্টামের একনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী মরহুম শাহ আলমগীরের সামগ্রিক অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তার অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৫৭ ব্যাচ ॥ ঢাকা

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ মার্চ

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

দৃঢ় সংকল্পই দেয় এগিয়ে চলার শক্তি

ডা. এম এ হাসান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডা. এম এ হাসান। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির আহ্বায়ক। পেশায় তিনি একজন এলার্জি-এজমা বিশেষজ্ঞ। তার লেখা ২০টিরও বেশি গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন কবিতা ও সংগীতসহ নানা বিষয়। ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ মুক্ত আলোচনায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

১৯৭১ সালে আমি ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ২৫ মার্চ রাতে বড় ভাই এসে খবর দিলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে-কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তিনি ছিলেন পাকিস্তান রাইফেল ক্লাবের একজন শুটার। তার কাছ থেকে আমিও বন্দুক-রাইফেল চালানো শিখেছিলাম।

সে রাতে কিছু পুলিশ সদস্যকে সাথে নিয়ে তেজগাঁওয়ে একটা ব্যারিকেড তৈরি করলাম। পরে শুনেছি ঢাকার আরো কিছু স্থানে প্রতিরোধ গড়া হয়। এভাবেই আমি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম। তবে এটা হঠাৎ করে হয় নি, পাকিস্তানি বৈষম্যমূলক নীতির কারণে এদেশের সচেতন তরুণদের একটা অংশ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল বেশ আগেই, বলা যায় ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় থেকেই।

২৭ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায় গেলাম। পুরো এলাকাটা জনমানবহীন, সুনসান। ঢাকা মেডিকেলে গেলাম। দেখলাম জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা তার গলায় গুলি করে। তাই কথা বলতে পারছিলেন না। পরে তিনি মারা যান।

সর্বত্রই তখন ভয়াবহ অবস্থা। রাজারবাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সারি করে অসংখ্য মৃতদেহ শুইয়ে রাখা। এসব দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তায় পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়লাম। এই বুঝি ধরে নিয়ে যায়, এই বুঝি মেরে ফেলে! কিন্তু আমি খুব ভালো উর্দু বলতে পারতাম বলে সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।

পরদিন আমি আর বড় ভাই হেঁটে ভৈরবের দিকে রওনা হলাম। রাস্তায় কত যে মরদেহ দেখেছি! ভৈরবে পৌঁছে যা দেখলাম সেটা আরো মর্মান্তিক। নির্যাতনের পর নারীদের হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। বীভৎস একেকটা মরদেহ।

একসময় দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিলাম। পাকিস্তানিদের সাথে আমাদের প্রথম যুদ্ধটা হলো ১৪ এপ্রিল, আশুগঞ্জের পাশে লালপুরে। ওদের ছিল আধুনিক সব মারণাস্ত্র। কিন্তু আমরা পিছপা হই নি। টানা ৩৬ ঘণ্টা যুদ্ধ হলো। শেষের দিকে রণক্ষেত্রে আমরা মাত্র তিন জন বেঁচে ছিলাম। সেদিন কোনোমতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনায় আমি সবসময় তাদের কথাই বলতে চেয়েছি, যারা কোনোদিন নিজেদের কথা বলতে বা লিখতে পারবে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানকারী সাধারণ মানুষ, দিনের পর দিন নির্যাতিত সাড়ে চার লাখ নারী, তাদের অবদান ও ত্যাগের কথাই আমি আমার লেখা এবং গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

সহযোদ্ধা দুলা মিয়ার কথা বলি। সুঠামদেহী গ্রাম্য যুবক। এক যুদ্ধে তার পেটে গুলি লাগল। তবু লড়াই থামান নি, সমানে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একসময় পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল! শত্রুর প্রবল আক্রমণের মুখে উদ্ধার করাও সম্ভব হচ্ছিল না তাকে। কিন্তু দুলা মিয়া ব্যথায় কাতরান নি, কারো সাহায্যও চান নি।

দেখলাম, মাটিতে পড়ে যাওয়া নাড়িভুঁড়ি ঘাস-ময়লাসহই তিনি একহাতে পেটে ঢোকাচ্ছেন আর অন্য হাতে মেশিনগান চালাচ্ছেন। জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত তিনি এভাবেই যুদ্ধ করে গেছেন। নিজের জীবনের চেয়ে স্বাধীনতার মূল্য তার কাছে অনেক বেশি ছিল।

আরেকজনের কথা মনে পড়ে। তিনি হাবিলদার ইসমাইল। হবিগঞ্জে আমরা একসাথে যুদ্ধ করেছিলাম। একদিন তেলিয়াপাড়ার পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় আমাদেরকেই আক্রমণ করে বসল ওরা।

তৎক্ষণাৎ ইসমাইল আর আমি একটি গাছের আড়ালে পজিশন নিলাম। দুজনই গুলি চালাচ্ছি, পাল্টা জবাবও আসছে। হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল ইসমাইলের তলপেটে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। কোনোরকম গোঙানি বা আর্তনাদ নয়, বরং দৃঢ়কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন, 'স্যার, আমার হাতিয়ারটা দেখবেন, এইটা ছাইড়া যাবেন না।' বলেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আমাদের তখন অস্ত্রশস্ত্র খুব কম ছিল। তাই ইসমাইল মৃত্যুর আগমুহূর্তে হাতিয়ারের কথা চিন্তা করেছে, নিজের কথা নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাধারণ মানুষের এই যে আত্মত্যাগ, এর প্রকৃত মূল্য আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারি নি। যে ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এর মূল্য বুঝতে পারলেই আমাদের আত্মপরিচয় সৃষ্টি হবে।

যা-ই হোক, ২৭ নভেম্বর আমার নতুন পোস্টিং হলো। সামরিক অফিসারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। কিন্তু আমি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালাম। কারণ ডাক্তারি পড়া ছেড়ে আমি যুদ্ধ করতেই এসেছি, বসে বসে খাতা-কলমের কাজ করতে নয়। তখন আমাকেসহ পাঁচজনের একটি দল গঠন করা হলো। নতুন একটি মিশনের দায়িত্ব দেয়া হলো।

মিশনটি ছিল, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলায় রঘুনন্দন পাহাড়ে পাকিস্তানিদের একটা গ্যাস ফ্যাক্টরি উড়িয়ে দিতে হবে। বড় চ্যালেঞ্জটি ছিল, ওখানে পৌঁছাতে হবে নিঃশব্দে। তারপর মূল দলকে বার্তা পাঠাতে হবে আক্রমণের জন্যে। ভারতীয় কমান্ডোরা দীর্ঘ ট্রেনিং দিল আমাদের। কীভাবে শব্দ ছাড়া চলতে হয়; শুধু ছোলা এমনকি সাপ খেয়েও কীভাবে বেঁচে থাকা যায়।

আমরা মিশন শুরু করলাম। প্রথমেই পড়ল আখাউড়া বর্ডার থেকে ছ'মাইল দীর্ঘ একটি মাইন ফিল্ড। ওটা পেরিয়ে টার্গেটের যথাসম্ভব নিকটে পৌঁছে শেয়ালের গর্তের মতো গর্ত করে তাতে লুকিয়ে থাকতে হবে। বড় কোনো বিপত্তি ছাড়াই আমরা কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কিন্তু মূল স্থানে পৌঁছার আগেই পাকিস্তানিরা শেল ছুঁড়তে শুরু করল। আমরা আর এগোতে পারলাম না।

পরদিন আবার চেষ্টা করলাম এবং সফল হলাম। জায়গামতো পৌঁছে মূল দলকে খবর দিলাম। যুদ্ধ শুরু হলো। ভীষণ কুয়াশা ছিল সেদিন। অল্প দূরেরও কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এর মধ্যেই পর পর পাঁচ দিন ছয় রাত আমরা বিভিন্ন কৌশলে যুদ্ধ করলাম। শেষ পর্যন্ত ৬ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হলো আখাউড়া।

এবার আমাদের গন্তব্য ঢাকা। ঢাকার পথে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করতে হলো। ঢাকায় এসেও আক্রমণ চলতে থাকল। অবশ্য বুঝতে পারছিলাম– আমরা স্বাধীনতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর এলো সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। দেশ স্বাধীন হলো।

আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। কিন্তু ততদিনে আমার জীবনে, আমার পরিবারে বহু কিছু ঘটে গেছে। আমার বড় ভাই মিরপুরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তিনিসহ আমার পরিবারের মোট পাঁচ জন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

৭১ সালে আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম একটা সংকল্প নিয়ে–দেশ স্বাধীন করবই। দৃঢ় সংকল্পই তো মানুষকে দেয় নতুন পথে এগিয়ে চলার শক্তি। সে কারণেই আমরা পেরেছিলাম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম আমাদের একটি আত্মপরিচয় নির্মাণের জন্যে। আর আত্মপরিচয় না থাকলে ভালো-মন্দের পার্থক্য করা যায় না। একটা সময় ছিল যখন কোনো অপরাধ হতে দেখলে আমরা সাধ্যমতো প্রতিবাদ করতাম। এখন উল্টো, অধিকাংশ মানুষই মনে করে যে, এটাই তো স্বাভাবিক।

এসময় তাই প্রয়োজন কোয়ান্টামের মতো সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা। যারা মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করবে, ধ্যানের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি ঘটাবে। আত্মপরিচয় ও আত্মসম্মান খুঁজে নিতে শেখাবে। মানুষের মাঝে শুভবোধের বিকাশ ঘটাবে। মেডিটেশন ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে পরিচ্ছন্ন করে চলেছে কোয়ান্টাম। আমি তাই মনে করি, বর্তমান সময়ে কোয়ান্টাম একটি শুদ্ধচিন্তার আশ্রম।

পর্যাপ্ত আঁশযুক্ত খাবার আপনাকে রাখবে সুস্থ, দেবে দীর্ঘায়ু

যত আঁশ তত রোগনাশ

সুস্থ থাকতে চান? নিজের ও পরিবারের জন্যে গড়ে তুলতে চান একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস? সহজ পন্থা আছে। এবং বিজ্ঞানসম্মত। আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় বাড়ান ফাইবার বা আঁশ-জাতীয় খাবারের আধিক্য।

সম্প্রতি (জানুয়ারি ২০১৯) এ-সংক্রান্ত একটি গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট*-এ। ২৪৩টি গবেষণার সূত্র ধরে তাতে বলা হয়েছে, আপনার প্রতিদিনকার খাবারে যোগ করুন পর্যাপ্ত আঁশ-জাতীয় খাবার, তাতে ক্রমশ কমতে থাকবে হৃদরোগ ডায়াবেটিস স্ট্রোক ও কোলন ক্যান্সারের মতো জীবনঘাতী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি। অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কমবে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ। নিশ্চিতভাবেই বাড়বে আপনার সুস্থতা, উদ্যম আর প্রাণবন্ততা।

গবেষকরা বলছেন, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ফলমূল, শাকসবজি ও পূর্ণ খাদ্যশস্য জাতীয় খাবার থেকে প্রতিদিন ২৫-২৯ গ্রাম পরিমাণ আঁশ গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, আঁশে ঘটে বিস্তর রোগনাশ। বাড়ে আয়ু।

নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওটাগো-র গবেষক এবং এ গবেষণা-প্রতিবেদনের মূল লেখক এন্ড্রু রেনল্ডের মতে, এ গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে, সারা দিনে যা আমরা খাই তার একটা বড় অংশই হওয়া চাই আঁশসমৃদ্ধ ও পূর্ণ শস্যদানা জাতীয় খাবার, যা রোগঝুঁকি হ্রাস করবে এবং কমাবে অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা।

খাদ্যআঁশ কমায় মেদস্থূলতা, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের ঝুঁকি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্যে প্রণীত ডায়েটারি গাইডলাইন অনুসারে, প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নারীর দৈনিক খাদ্যতালিকায় আঁশের পরিমাণ থাকতে হবে ন্যূনতম ২৫ গ্রাম এবং পুরুষের ৩৮ গ্রাম। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান মতে, গড়পড়তা আমেরিকানের দৈনন্দিন খাবারে আঁশ গ্রহণের পরিমাণ মোটে ১৫ গ্রাম।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, মানবদেহে আঁশ-জাতীয় খাবারের উপকারিতা দূরপ্রসারী। এ ধরনের খাবার অনেকক্ষণ ধরে চিবোতে হয় বলে এটা পাকস্থলিতে পূর্ণতার অনুভূতি যোগায়, ফলে অতিভোজনের সম্ভাবনা কমে। যা মেদস্থূলতা, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি রোধ করে।

জানা জরুরি, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া। পরিপাকতন্ত্রেও আছে এমন কিছু উপকারি ব্যাকটেরিয়া। সুখবর হলো, খাদ্যআঁশ এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর লালনে রাখে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—কোলন ক্যান্সার ঠেকাতে যা অত্যন্ত কার্যকরী।

ফাইবার বা আঁশ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। কীভাবে? আমরা যখন অতিরিক্ত চিনি বা শর্করা-জাতীয় কোনো খাবার খাই, তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা এমনভাবে বেড়ে যায় যে, ইনসুলিন অনেক সময় সবগুলো গ্লুকোজকে ভাঙতে পারে না। এতে রক্তে বাড়ে গ্লুকোজের মাত্রা। এ অবস্থা ক্রমাগত চলতে থাকলে একসময় তা রূপ নেয় ডায়াবেটিসে। আর খাবার থেকে শরীরে চিনি শোষণ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে ডায়াবেটিস হওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটিকে বাধাগ্রস্ত করে খাদ্যআঁশ।

ভাজাপোড়া খাবারে জীবনটাই যে হচ্ছে ভাজা!

অতিরিক্ত ভাজাপোড়া ও তৈলাক্ত খাবার যে ক্ষতিকর, এ আর নতুন কিছু নয়। কমবেশি সবাই এটা জানেন। নতুন খবরটি হলো, এ ধরনের খাবার অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী! সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য। ৫০ থেকে ৭৯ বছর বয়সী এক লক্ষ মার্কিন নারীর ওপর ২০ বছর ধরে বড় পরিসরে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল এটি।

গবেষণায় বলা হয়েছে, এদের মধ্যে দৈনিক অন্তত একবার যারা ভাজাপোড়া খাবার খেয়েছেন তাদের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় বেড়ে গেছে শতকরা আট ভাগ।

আয়েশে চিবোচ্ছেন মুচমুচে চিকেন ফ্রাই ॥ কামড়ে কামড়ে এগিয়ে আসছে মৃত্যু!

চিকেন ফ্রাই এখন বিশ্বজুড়ে বেশ সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও লোভনীয় একটি খাদ্য। কখনো মূল খাবারের সাথে, কখনো-বা স্ন্যাক্স হিসেবে এটি রেস্টুরেন্টে-বাড়িতে হরদম খেয়ে চলেছেন ছেলে-বুড়োসহ সব বয়সী মানুষ। আমাদের দেশেও একই অবস্থা। ফ্রাইড চিকেন এখন বহু পরিবারের শিশু-কিশোরদের নিত্যদিনের মেন্যু।

অথচ সাম্প্রতিককালে পুষ্টিবিদরা যত ধরনের খাবার নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাণসংহারী রূপে চিহ্নিত করেছেন এই চিকেন ফ্রাইকে! অকালমৃত্যু ঘটাতে এটি নাকি অব্যর্থ। তারা বলছেন, যারা সপ্তাহে অন্তত একবার চিকেন ফ্রাই খেয়ে থাকেন তাদের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে শতকরা ১৩ ভাগ। এদের মধ্যে আবার ১২ জনই আক্রান্ত হতে পারেন হৃদরোগে।

কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন, ফ্রাইড চিকেন অধিকাংশ সময়ই খাওয়া হয় রেস্টুরেন্টে এবং সেখানে এতে মেশানো হয় অতিরিক্ত সোডিয়াম অর্থাৎ লবণ। উপরন্তু যে তেলে ভাজা হয় সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ব-ব্যবহৃত তেল। আর একই তেলে বার বার ফ্রাই করার ফলে যে-কোনো খাবারই হয়ে ওঠে চরম অস্বাস্থ্যকর।

মাছ ভাজাও তা-ই। ভাজা মাছ উল্টে বা সোজা, যেভাবেই হোক, না খেলেই ভালো। কুড়মুড়ে বা ক্রিসপি করে যারা মাছভাজি খান, তারা জেনে রাখুন—নিজের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা আপনি বাড়াচ্ছেন শতকরা ৭ ভাগ। আর হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছেন শতকরা ১৩ ভাগ পর্যন্ত।

ভিটামিন ট্যাবলেটে নয়, বরং আঁশেই মিলবে নানা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান

প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর ভিটামিন-মিনারেলের জন্যে অনেকেই আজকাল নানারকম ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট সেবন করে থাকেন। লাভ কতদূর হয় সে বিতর্ক পরে, খরচ যে ভালোই হয় তা বলাই বাহুল্য।

পুষ্টিবিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন, ভিটামিনের জন্যে কৌটাভর্তি ট্যাবলেট-পাউডারের চেয়ে বরং ফলমূল, শাকসবজি ও আঁশ-জাতীয় খাবার বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তটা ঢের বুদ্ধিমানের।

কারণ তাতে ভিটামিন আর খনিজ নয় কেবল, আপনি পাবেন দেহের জন্যে দরকারি আরো হরেক প্রকারের পুষ্টি উপাদান। এ-ছাড়াও আছে এন্টি-অক্সিডেন্ট, যা ক্যান্সার প্রতিহত করে। প্রদাহ কমায়। সেইসাথে দেহকোষ ও টিস্যুগুলোকে করে তোলে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম। আর এভাবেই সার্বিক সুস্থতা হয়ে ওঠে ত্বরান্বিত।

কারো কারো আবার ভুল ধারণা যে, খাবারে আঁশ বাড়ানো মানে স্বাদু ভোজনের সমাপ্তি। কিন্তু সত্যটা আসলে তা নয়। এটা মূলত নির্ভর করে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

আপনার চারপাশে সহজলভ্য ফলমূল, শাকসবজি, শস্যদানা, মটর, বাদাম জাতীয় খাবারের মধ্যে সহজেই আপনি পেতে পারেন পর্যাপ্ত আঁশ। এবং এসব খাদ্য উপাদান নানা ভাবে ও নানা ধরনে আপনার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় যোগ করে আপনি খাবারকে করে তুলতে পারেন সুস্বাদু ও প্রকৃত অর্থেই স্বাস্থ্যকর।

সবমিলিয়ে বলা যায়, আপনার পারিবারিক খাদ্যাভ্যাসে যতদূর সম্ভব পরিহার করুন অতিরিক্ত তেল-ঝাল-চিনিযুক্ত এবং ভাজাপোড়া ও প্রক্রিয়াজাত খাবার। বরং সাধ্যমতো বাড়ান আঁশযুক্ত খাদ্য। প্রাকৃতিক ও বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাচারে সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকুক আপনার পরিবার।

ডা. আতাউর রহমান
তথ্যসূত্র : টাইম, ১০ জানুয়ারি ২০১৯

মওলানা ছায়ীদুল হক

আমৃত্যু স্বেচ্ছাসেবী ও সঙ্ঘে লীন

২০১৮ সালের রমজান মাসের প্রথম জুমার দিন। বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম মসজিদে সমবেত হয়েছেন স্থানীয় এলাকাবাসীসহ সারাদেশ থেকে আগত কোয়ান্টাম পরিবারের সহস্রাধিক সদস্য। ইফতারের পূর্বমুহূর্তে অঝোরে কাঁদছেন সবাই। সকাতর প্রার্থনায় পাপ-গ্লানি থেকে মুক্তি চাইছেন মহান আল্লাহর নিকট। ঠিক এসময়ে স্রষ্টার করুণাস্বরূপ নামল এক পশলা বৃষ্টি। শীতল হাওয়ার পরশে প্রাণ জুড়িয়ে গেল সবার। পবিত্র রমজানের এই দিনটিতে আগত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় আলোচনা উপস্থাপনের পাশাপাশি স্রষ্টার কাছে গভীর আকুতি জানিয়ে দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ছায়ীদুল হক।

সে-বছরই শুধু নয়, ২০১২ সাল থেকে প্রতি রমজানে তিনি হাজারো মানুষকে নিয়ে এ মসজিদে পরিচালনা করেছেন ইফতার মাহফিলের এই বিশেষ দোয়া। সারা বছর যার জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। এ-ছাড়াও বছরজুড়ে কোয়ান্টামের যে-কোনো আয়োজনে শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার অংশগ্রহণ ছিল প্রায় অবধারিত।

ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে কোয়ান্টাম চেতনার সাযুজ্য এবং কোয়ান্টাম মেথড যে সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত–একথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যথার্থই সাহসী, সাবলীল এবং অকপট। এমনকি ২০১২ সালে পবিত্র হজব্রত পালনকালে মক্কায় অর্ধশতাধিক বাংলাদেশি হজযাত্রীকে নিয়ে পরিচালনা করেছেন বিশেষ সাদাকায়ন।

অর্থাৎ যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, দৃঢ়চিত্তে বলেছেন কোয়ান্টামের কথা। কখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে আলোচনা করেছেন, কখনো-বা পরামর্শপ্রার্থী কোয়ান্টাম সদস্যদের সুস্থ ও সুখী জীবন গড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত ব্যস্ততার বাইরে পুরোটা সময় তিনি দিতেন কোয়ান্টামের বাণী প্রচার ও ফাউন্ডেশনের সেবাধর্মী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার মাঝে আমৃত্যু পৌঁছে দিয়েছেন শাশ্বত সত্যপথের আহ্বান।

দুদশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ছিলেন কোয়ান্টামের একজন অক্লান্ত স্বেচ্ছাসেবী এবং আমৃত্যু সঙ্ঘে একাত্মতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যখনই সুযোগ পেয়েছেন কোয়ান্টাম সদস্যদের আত্মিক উন্নয়নে ধর্মের আলোকোজ্জ্বল ও সেবামুখী দিকটি পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুসারে তুলে ধরেছেন তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়। মওলানা ছায়ীদুল হকের স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তার কিছু আলোচনার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

সঙ্ঘের সাথে একাত্মতাই দেবে সত্যিকার মুক্তি

একবার নবীজী (স) তার সাহাবীদের সঙ্ঘে একাত্ম থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তি সঙ্ঘ থেকে এক বিঘত দূরে সরে গেল, সে যেন তার বিশ্বাসের মালা নিজ হাতে গলা থেকে খুলে রেখে দিল।'

তাই আমাদেরও উচিত সবসময় সঙ্ঘে একাত্ম থাকা এবং অবশ্যই সেটা হতে হবে সৎসঙ্ঘ। আমার অভিজ্ঞতায় বুঝেছি এবং আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন হচ্ছে একটি সৎসঙ্ঘ। তাই নিজের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এই সঙ্ঘে একাত্ম হতে হবে। সঙ্ঘের কাজগুলো নিজের কাজ মনে করতে হবে।

এর শুরুটা করতে পারেন সাদাকায়ন দিয়ে। নিয়মিত সাদাকায়নে অংশগ্রহণ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাদাকা বা দান থেকেই মূলত 'সাদাকায়ন' শব্দটার উৎপত্তি। আপনি সাদাকায়নে আসছেন মানে আপনি নিজের এবং সৃষ্টির কল্যাণে ভালো কাজ করছেন। একজনকে সালাম দিচ্ছেন, হাসিমুখে কথা বলছেন। এর সবই হলো সাদাকা।

এভাবে ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম চেতনার সাথে আপনি যুক্ত হতে পারেন। কোয়ান্টামের আরো অন্যান্য যে কার্যক্রম আছে সেগুলোর সাথে একাত্মতা আপনার সত্যিকার মুক্তির পথে সহায়ক হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

করসেবার মাধ্যমে নিজের শুদ্ধতা নিশ্চিত করুন

সৃষ্টির সেবামূলক কাজের মাধ্যমে একজন মানুষের আত্মশুদ্ধি ঘটে। এই আত্মশুদ্ধিমূলক কাজগুলো হলো মহান স্রষ্টার নির্দেশ এবং তাঁর পছন্দনীয়। এজন্যে শ্রদ্ধেয় গুরুজী আমাদের সামনে কিছু কর্মপন্থা উপস্থাপন করেছেন, যেগুলোকে আমরা 'করসেবা' হিসেবে নামকরণ করেছি।

কোয়ান্টামে সাফল্যের পঞ্চসূত্রের একটি হলো সেবা। সূরা *আন-নহল*-এর ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'বিশ্বাসী পুরুষ হোক বা নারী, যে-ই সৎকর্ম করবে তাকে দুনিয়ায় সার্থক জীবন দান করব এবং পরকালে সে তার কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে।'

আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়–কোয়ান্টামে মহিলারাও বিভিন্ন কাজ করছে, মাটির ব্যাংক নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে–এটা ঠিক কিনা? আমি তখন তাদের এই আয়াতটির কথা উল্লেখ করি। এখানে স্রষ্টা কিন্তু শুধু পুরুষের কথা বলেন নি, বলেছেন 'বিশ্বাসী পুরুষ হোক বা নারী', অর্থাৎ যার যতটুকু সুযোগ আছে তাকে সেটা করতে হবে।

সূরা বাকারা-র ১৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য আছে; যা তার কর্মধারাকে পরিচালনা করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে (নিজের সাথে) প্রতিযোগিতা করো। ...'

এই আয়াতটি গুরুজী প্রায়ই বলেন। প্রতিযোগিতা কখনো কখনো প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। তাই প্রতিযোগিতা করতে হবে নিজের সাথে। আমরা যারা স্বেচ্ছাসেবী তারা মনে করব, গত বছরের তুলনায় এই বছর বা গত দিনের তুলনায় আজ কতদূর করলাম। অর্থাৎ আগের 'আমি'র তুলনায় বর্তমান আমি কতটুকু এগোতে পেরেছি।

২৮ মার্চ ২০১৮

বয়স যা-ই হোক, সেবার কোনো সুযোগই কখনো হাতছাড়া করতেন না মওলানা ছায়ীদুল হক। ২০১৩ সালের মেডিকেল ক্যাম্প পরবর্তী করসেবায় ভারী পাথর তুলছেন কোয়ান্টামমের আরোগ্যশালায়

এতিমের দায়িত্ব নিন
পরিবার ও সমাজের দুঃখ-অশান্তি দূর হবে

নবীজীর (স) এতিম হওয়ার ঘটনা আমরা জানি। আল্লাহ তাকে *সূরা দোহা*-র ৬-১০ আয়াতে বলেছেন, 'তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পান নি এবং তারপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? পথহারা অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে সত্যপথের সন্ধান দেন নি? নিঃস্ব অবস্থা থেকে তিনি কি তোমাকে অভাবমুক্ত করেন নি? অতএব তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার কোরো না।'

এটা পড়ে আমি চিন্তা করতাম, নবীজীকে (স) কোনো এতিমখানায় পাঠানো হয় নি, তাহলে আশ্রয় পেলেন কীভাবে? আসলে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাই আমি বিশ্বাস করি, এতিমের দায়িত্ব পালনের যে দিক-নির্দেশনা আল্লাহ দিয়েছেন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এতিমান কার্যক্রম সেভাবেই পরিচালনা করা হচ্ছে।

আবার নবীজীকে (স) এতিমের প্রতি কঠোর হতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই যেন আমরা এতিমদের অবজ্ঞা-অবহেলা না করি। তাদের হারিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ এতিমের দায়িত্ব নিতে হবে। আর নবীজী (স) এ দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করেছেন। নিজে গ্রহণ করেছেন, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ কারণেই রসুলুল্লাহর (স) নবুয়তের পরে কোনো এতিম কিংবা বিধবা হারিয়ে যান নি বা অপমানিত হন নি।

তাহলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর নিজস্ব কার্যক্রমের দায়িত্ব দিয়েছেন নবীজীকে (স) এবং তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে তিনি কিছু দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন। সহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত : নবীজী (স) তার একহাতের দুটো আঙুল উঁচু করে দেখালেন এবং বললেন, 'আমি এবং একজন এতিমের লালনপালনকারী বা দায়িত্ব গ্রহণকারী এভাবে জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করব।' আমি মনে করি, এই শুভ সংবাদ জানার পর কোনো বিশ্বাসী কোনো এতিমকে আর ফাউন্ডেশনের এতিমান কার্যক্রমকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখবেন না।

কোরআনের *সূরা ফজর*-এর ১৫-২০ নং আয়াত সম্পর্কে জানলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। এখানে আল্লাহ বলেছেন, 'আসলে মানুষের অবস্থা এই যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করার জন্যে সম্মান ও প্রাচুর্য দান করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক (সঙ্গত কারণেই) আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করার জন্যে রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসম্মান করেছেন। না, একথা সত্য নয়। আসলে (এটা তোমাদের কর্মফল) তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না, অভাবী অসহায়কে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না, অন্যের উত্তরাধিকারের সম্পদ নিজেরা আত্মসাৎ করো, আর ধনসম্পত্তির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।'

আল্লাহ বলছেন, আমি একজনকে ধনসম্পত্তি দান করে এবং মর্যাদা প্রশান্তি প্রাচুর্য দিয়ে পরীক্ষা করি। অন্যদিকে একজন মানুষের দারিদ্র্যতা ও অশান্তির জন্যে আল্লাহ দায়ী নয়। কারণ আমরা জানি, আল্লাহ আমাদের ভালবাসেন। আর ভালবেসে তো কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না। তিনি দেনও না।

তাহলে সমস্যাটা কী? সমস্যাটা হলো, অশান্তি বা দারিদ্র্যতার মূল কারণ হচ্ছে আমরা এতিমকে সঠিক মর্যাদা দেই নি। আসলে গুরুজী এই এতিমান কার্যক্রম নিয়ে কাজ শুরু করার আগে আমি নিজেও এতিম নিয়ে এতটা গভীরভাবে চিন্তা করি নি।

তাই শুধু কিছু দানই নয়, বরং এতিমের দায়িত্ব নিতে হবে। বাসায় রেখে একজন এতিমকে আমরা যতটা না লেখাপড়া-খেলাধুলায় নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব, তার চেয়ে সঙ্ঘ এটা ভালোভাবে করতে পারবে। আপনি শুধু তার মাসিক খরচটা দিচ্ছেন। আজকের যুগে এটাই সবচেয়ে সময়োপযোগী এবং সহজ একটি প্রক্রিয়া।

২৪ অক্টোবর ২০১৮

মেডিটেশন ছিল তার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ধ্যান উৎসবে কোয়ান্টামম লামার জাবলে শামস পাহাড়ে সহযাত্রীদের সাথে ধ্যানমগ্ন মওলানা ছায়ীদুল হক

সঙ্ঘবদ্ধভাবে সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করুন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মূলত দুধরনের কাজ করে। একটি আত্মনির্মাণমূলক, অন্যটি সৃষ্টির সেবামূলক। যে-কোনো সৎসঙ্ঘই এটা করবে। মহান আল্লাহ মানুষকে এই দুধরনের কাজের কথাই বলেছেন।

সৃষ্টির সেবামূলক কাজের জন্যে স্বাভাবিকভাবেই অর্থের প্রয়োজন। যেমন : একজন দরিদ্র শিক্ষার্থীর বই কেনা বা তার পড়াশোনায় সাহায্যের জন্যে টাকা লাগবে, কোনো অসহায় মানুষের ঘর নদীভাঙনে ধসে গেল বা কোনো বিপদের সময় অর্থ দরকার।

এই নিমিত্ত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ১৯৯৬ সাল থেকে যাকাত ফান্ড গঠন করেছে। শরিয়ত অনুসারে আটটি খাতে ব্যয় হচ্ছে যাকাত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থ।

সহজ ভাষায় যাকাত হচ্ছে যিনি সামর্থ্যবান তিনি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বছরে একবার পরিশোধ করবেন। এটা পরিশোধ করলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উপকার হবে। একদিকে ঐ ব্যক্তির সম্পদ পবিত্র হবে। অন্যদিকে সমাজের দরিদ্রতা দূর হবে।

কিন্তু এই যাকাত একা একা আদায় করা যায় না, এটা দিতে হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং একটি সুন্দর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। নবীজীর (স) ওপর যখন যাকাত ফরজ হলো তিনি যাকাত ফান্ড গঠন করেছিলেন। কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন।

নবীজী (স) বলেছেন, যাকে যাকাত দেবে তাকে পুরো করে দাও। ফলে দেখা গেল, সম্মিলিতভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে যখন যাকাত বিতরণ করা হলো, সে-বছর থেকেই দরিদ্রের সংখ্যা কমে গেল এবং ওমরের (রা) সময় ঐ এলাকায় যাকাত গ্রহীতা কাউকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই যাকাতদাতায় পরিণত হয়েছিল। তাই কয়েকটি লুঙ্গি-শাড়ি দিয়ে দিলেই সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা হয় না। এটা সুসংগঠিত পদ্ধতিতে দিতে হবে।

অনেক তরুণ-তরুণী আমার কাছে এসে বলে, আঙ্কেল! আমি যাকাত দিতে শুরু করেছি। আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানিতে তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলও হচ্ছে। তাদের সম্পদের পরিমাণ বাড়ছে। তাই যাকাত আদায়ে যারা এখনো সচেষ্ট হন নি, তাদের অনুরোধ করব এটা নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

২০ জুলাই ২০১১

২০১০ সালে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় লামা কোরবানি উৎসব। পাহাড়ি-বাঙালি দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে গোশত বিতরণের মুহূর্তে

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *স্রষ্টা আমাকে কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা কীভাবে বুঝব?*

উত্তর : এটা কি আমি বলে দিতে পারব? আর বলে দিলেও কী হবে জানেন? শয়তান আপনাকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ ও সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলবে। এজন্যে আমার কাছ থেকে না শুনে নিজে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন, নিজে বোঝার চেষ্টা করুন। তাহলে শয়তান আপনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবে না।

আর নিজে বোঝা ও উপলব্ধি করার জন্যে নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করুন এবং আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে চাইলে ৪০ দিনের জন্যে লামায় গিয়ে খেদমতায়নে অংশ নিন। কারণ স্রষ্টা আপনাকে কী দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেটা আপনার নিজের উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং সেজন্যে নিজের ভেতরে ডুব দেয়াটা জরুরি।

প্রশ্ন : *একজন কিডনি রোগীর অবস্থা এমন যে, ডাক্তার বলেছেন ডায়ালাইসিসের বিকল্প নেই। তাকে কি কোর্সের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে?*

উত্তর : কোর্সের জন্যে যে-কাউকেই উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। যিনিই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেবেন তিনি শারীরিক মানসিক পেশাগত পারিবারিকসহ জীবনের নানা দিকে উপকৃত হবেন। কিন্তু তাকে এটা বলতে যাবেন না যে, 'কোর্স করুন, আপনার ডায়ালাইসিস লাগবে না। এই বোকামি কখনো করতে যাবেন না।'

ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হচ্ছে মানে তার কিডনির অবস্থা খারাপ। এখন কোর্স করার পর নিয়মিত মেডিটেশন করলে নিঃসন্দেহে তিনি উপকৃত হবেন। আগের তুলনায় শারীরিক-মানসিকভাবে ভালো বোধ করবেন। কিন্তু তিনি যদি চান যে, চার দিন পরেই তার ক্রিয়েটিনিন লেভেল একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং ডায়ালাইসিসও আর লাগবে না– তাহলে তো হবে না।

আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই পারেন কিন্তু কখনো কাউকে কোনো গ্যারান্টি দেবেন না। 'আসুন, কোর্স করুন, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা ও কোয়ান্টাম জীবনাচার অনুসরণ করলে আপনি অবশ্যই আগের চেয়ে ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ'–এটুকু বলা পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব। এর বেশি নয়।

হতে পারে যে, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চায় আপনার রোগীর ডায়ালাইসিস কম করতে হবে, এমনকি আল্লাহ চান তো যেখানে সপ্তাহে দুবার ডায়ালাইসিস লাগার কথা, তার হয়তো সপ্তাহে একবার লাগবে। কিন্তু সেটার নিশ্চয়তা কোনোভাবেই আপনি দিতে যাবেন না। তাহলে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে পারবেন।

আবার যদি এমন হয় যে, একজনের বুকে ব্যথা, হার্টের আর্টারি ব্লকড হয়েছে, এনজিওগ্রামে একাধিক ব্লক পাওয়া গেছে, আপনি নির্দ্বিধায় তাকে বলতে পারেন–মেডিটেশন করুন, কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব নির্দেশিত জীবনধারা অন্তত একবছর অনুসরণ করুন, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। বুকে কোনো ব্যথা থাকবে না।

আবার ধরুন, হাঁটুতে বা কোমরে ব্যথা, রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারেন না, অনেক ওষুধ খেয়েও লাভ হচ্ছে না কিন্তু কোর্সে এসে চার দিনেই ভালো হয়ে যাচ্ছেন। কেন? কারণ তিনি এখানে এসে উপলব্ধি করছেন যে, এসব অসুবিধা যতটা না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক ও স্ট্রেসজনিত। সাইকোসোমাটিক যত অসুখ আছে, এগুলোর জন্যে মেডিটেশনই যথেষ্ট।

তাই যা বলবেন যুক্তির মধ্যে থেকে বলবেন, কোনো অলৌকিক বা অযৌক্তিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাউকে কোর্সে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : *আমার সালামের অভ্যাস আগে থেকেই ছিল। একজন মহিলা হিসেবে আমি কি শুধু মহিলাদেরই সালাম দেবো?*

উত্তর : আমি এখন পর্যন্ত কোথাও পাই নি যে, মহিলারা শুধু মহিলাদেরকেই সালাম দেবে। সালাম তো সবার জন্যেই। তবে প্রশ্ন যখন করেছেনই এ প্রসঙ্গে কিছু বলা যেতে পারে। একজন মহিলা হিসেবে আপনি যদি একজন পুরুষকে বিশেষত অপরিচিত বা অর্ধপরিচিত কোনো পুরুষকে আগে সালাম দেন, সে-ক্ষেত্রে সালামের আগে-পরে আলাপচারিতায় কতটুকু কথা বলবেন, কতটুকু হাসবেন, সেই সীমাটা সবসময় আপনাকেই বুঝতে হবে।

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সীমানাটা যদি আপনি রক্ষা না করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো পুরুষ এটা করবে না। সাধারণত কোনো পুরুষই একজন মহিলার দিকে অযাচিতভাবে অগ্রসর হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বুঝতে পারে যে, মহিলার দিক থেকে সাড়া পাওয়া যাবে। তখন সেই পুরুষের হাসি ও কথার ধরনটাও বদলে যায়।

তাই একজন মহিলা হিসেবে আপনাকেই বিষয়টা বুঝতে হবে। আপনার স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও সম্মান আপনাকেই বজায় রাখতে হবে। আপনি যদি দূরত্ব রক্ষা না করেন বেশিরভাগ পুরুষই তা করবে না।

অতএব সালাম অবশ্যই দেবেন কিন্তু দুই হাত দূরত্ব রক্ষা করবেন সবসময়। তাতে আপনিও শান্তি পাবেন, যাকে সালাম দিচ্ছেন তিনিও শান্তিতে থাকবেন। কারণ যে নারী সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখে, তাকে সবাই সম্মান করে। সমঝে চলে। যে এটা পারে না, তাকে কোনো পুরুষ সম্মান করে না। তেল দেয়, তাল দেয় কিন্তু সম্মান করে না।

প্রশ্ন : *প্রায় পাঁচ/ ছয় বছর আগে আমি ১৫ দিনের একটা হিলিং কার্ড নিয়েছিলাম। কিন্তু দুই/ তিন দিন পর আর হিলিং করি নি, কাগজটি জমাও দিয়েছি অনেক পরে। সেই থেকে আমি প্রতিনিয়ত অপরাধবোধে ভুগছি। অপরাধের ক্ষমা কীভাবে পেতে পারি?*

উত্তর : আসলে এখানটাতেই আমরা ভুল করি। আপনি চার-পাঁচ বছর ধরে অপরাধবোধে ভুগছেন, কী কারণে? আপনি এখন ১৫ দিন তাকে হিলিং করুন। তার জন্যে দোয়া করুন। তাহলে তো হয়ে গেল।

কাফফারা হিসেবে প্রয়োজনে একমাস দোয়া করুন। অপরাধবোধে ভোগার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি তো কোনো অন্যায় করেন নি। একজনের জন্যে হিলিং করার কথা ছিল, করতে পারেন নি। তার তো কোনো ক্ষতি করেন নি।

অকারণে অপরাধবোধে ভুগবেন না। মাত্রাতিরিক্ত অনুশোচনা, অপরাধবোধ আমাদের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। কর্মক্ষমতাকে বিঘ্নিত করে। এখন তার জন্যে দোয়া করে দিলেই হলো। বিষয়টা সহজভাবে নিন, সমাধানটাও আপনি সহজে করতে পারবেন।

নিজের ভুল, অন্যায়, পাপের জন্যে অনুশোচনা করবেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইবেন সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যে ভুলগুলো সংশোধন করে নেয়া যায় সেটার জন্যে অনুশোচনা না করে সবসময় সংশোধন করে নেবেন।

হয়তো একজনকে গালি দিয়েছেন, অনুশোচনা না করে তার কাছে গিয়ে হাত-পা ধরে মাফ চেয়ে নেবেন। তাকে গিয়ে বলবেন, ভাই/ আপা, মাফ করে দিন। না হলে ইচ্ছামতো বকা দিন আমাকে। আমি আপনাকে গালি দিয়েছিলাম, আপনিও দিন। আমি চোখ বন্ধ করে আছি, আপনি যাতে ইচ্ছামতো বকতে পারেন। আর যদি না বকেন তাহলে আমাকে মাফ করে দিন।

অর্থাৎ যা শুধরে নেয়া যায় সেটা সবসময় শুধরে নেবেন। অযথা অনুশোচনায় সময় নষ্ট করবেন না। নিজের শান্তি নষ্ট করবেন না। বরং যে সময়টাতে অনুশোচনা করছেন, সেসময় ভালো কাজ করবেন।

প্রশ্ন : *আমার বন্ধু তার একটি জমি বিক্রির ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়। সে বলেছে, নির্দিষ্ট দামের চেয়ে বেশিতে বিক্রি করতে পারলে বাড়তি টাকাটা সে আমাকে দেবে। এভাবেই কথা হয়েছে। কিন্তু আমি এ ধরনের পেশার সাথে জড়িত না। সে-ক্ষেত্রে এই টাকা নেয়া আমার উচিত হবে কিনা? আবার কিছু ঋণশোধ করার জন্যে টাকাটা আমার প্রয়োজনও।*

উত্তর : প্রথমত, জায়গাজমির বিষয় খুব জটিল। কার টাকা নিয়ে কে যে কী করবে, কাকে দেবে না দেবে, সেটা বোঝা খুব মুশকিল। তার ওপর আবার এ ধরনের ব্যবসার সাথে আপনি জড়িত না অর্থাৎ এসব ভালো বোঝেন না।

আর জমি ব্যবসার সাথে অনেক ধরনের লোকজন জড়িত। তাই আপনি নিজে কীসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন, কাকে জড়াবেন, এটা চিন্তার বিষয়। যা নিজে বোঝেন না তার মধ্যে জড়াতে না যাওয়াই ভালো। কারণ আপনার বন্ধুর চেয়ে আপনি যে এই ব্যাপারে খুব বেশি দক্ষ, আপনার প্রশ্ন থেকে তা মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, আপনি এখন ঋণগ্রস্ত। ঋণের ফাঁদ থেকে বেরোতে চেষ্টা করছেন, তাই এখন এ ধরনের বহু প্রলোভন আপনার সামনে আসবে। যে-কারণে আমরা ঋণ, ক্রেডিট কার্ড নিয়ে এত কথা বলছি। অতএব যা করবেন খুব সতর্কতার সাথে করবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

পণ্যঋণ টেনশন ও অশান্তির দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে। ঋণ করে ভোগ্যপণ্য কেনা থেকে আমি সবসময় বিরত থাকব।

ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম

কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করে সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তির খোঁজ পেয়েছেন লাখো মানুষ। সুস্থতার পাশাপাশি এখন সৃজনশীলতা ও কর্মোদ্যম বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শেখানো হচ্ছে কোয়ান্টাম ইয়োগা। মেধা বিকাশের লক্ষ্যে দেশের প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করছে কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চায়। ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত কিছু ইয়োগা কার্যক্রম এখানে তুলে ধরা হলো।

৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম। এতে অংশ নিয়েছেন ৬৪ জন পুরুষ ও আট জন মহিলাসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মোট ৭২ জন উপ-সচিব।

১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি বিয়াম ফাউন্ডেশন অডিটরিয়ামে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তারা। এতে মোট ৩৩ জন কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন।

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রীম কোর্ট বার মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনব্যাপী এ কার্যক্রমে ২৫ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষসহ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের মোট ৬৫ জন আইনজীবী অংশ নেন।

১১ ফেব্রুয়ারি সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ইয়োগা ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। 'ইয়োগা শিখুন, স্মার্ট জীবনযাপন করুন' শীর্ষক দুঘণ্টাব্যাপী এ ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫ জন শিক্ষার্থী।

ফ্রান্সে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় কোয়ান্টাম প্রকাশনা ও ভাষা শহিদদের স্মরণে রক্তদান কার্যক্রম

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ফ্রান্স কমিটির উদ্যোগে প্যারিসে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টামের বিভিন্ন প্রকাশনা নিয়ে এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিস। এখন থেকে নিয়মিত এ বইমেলায় কোয়ান্টামের প্রকাশনাগুলো নিয়ে অংশ নেবে প্যারিসের কোয়ান্টাম সদস্যবৃন্দ।

এ-ছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিস আয়োজন করে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি। দিনব্যাপী এ কার্যক্রমটি আয়োজিত হয় প্যারিসের বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ (Bichat-Claude Bernard) হাসপাতালে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ কার্যক্রমে রক্তদান করেন ১৯ জন রক্তদাতা।

কর্মসূচি ॥ মার্চ ২০১৯

হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ওরিয়েন্টেশন
৮ ও ৯ মার্চ । যশোর

লামা কোয়ান্টায়ন
প্রো-মাস্টার : ১১-১৩ মার্চ
গ্রাজুয়েট : ২৯-৩১ মার্চ

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন
২২ ও ২৩ মার্চ । কাকরাইল

হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন
২২ ও ২৩ মার্চ। কাকরাইল

প্রথমায়ন ওরিয়েন্টেশন
২৯ ও ৩০ মার্চ । কাকরাইল

কোয়ান্টাম ইয়োগা ওরিয়েন্টেশন
২৯ ও ৩০ মার্চ
পুরুষদের ব্যাচ : কাকরাইল
মহিলাদের ব্যাচ : শান্তিনগর

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

সুস্থ ও ভালো মনের মানুষ গড়তে কাজ করছে কোয়ান্টাম

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত ১৪৭ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব কাজী রিয়াজুল হক। কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ৫৯ জনকে এ সম্মাননা জানানো হয়।

রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে কাজী রিয়াজুল হক বলেন, 'স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে সুস্থ ও ভালো মনের মানুষ গড়তে কাজ করে চলছে কোয়ান্টাম। রক্তদানের মতো সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকায় সমাজের অনেক মানুষ এখন সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হচ্ছে।

যেমন : একজন স্বেচ্ছা রক্তদাতা যখন রক্তদানে নিয়মিত হন তখন তিনি তার স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন। এ কাজটিই করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম। রক্তদানের মাধ্যমে অন্যের জীবন বাঁচাতে এ মানবিক কাজটি তারা করছে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে। এর পাশাপাশি মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষার দায়িত্ব তারা নিয়েছে ধনী-গরিব নির্বিশেষে।'

সভাপতির বক্তব্যে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী বলেন, মানবতার সেবায় রক্তদাতারা তাদের জীবনের একটি অংশ দান করছেন। নতুন প্রজন্মের জন্যে এটি খুব সুন্দর একটি উদ্যোগ। রক্তদাতাদের এ দানের প্রতিদান কারো দেয়া সম্ভব নয়। একমাত্র স্রষ্টাই এর উত্তম প্রতিদান দেবেন।

সবশেষে প্রত্যেক রক্তদাতা প্রধান অতিথির হাত থেকে সম্মাননা স্মারক ও সনদপত্র গ্রহণ করেন।

একজন স্বেচ্ছা রক্তদাতার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব কাজী রিয়াজুল হক

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় কোয়ান্টাম

এবারের বইমেলায় কোয়ান্টামের নতুন প্রকাশনা 'বিকশিত হোক শত ভাবনা' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং জনপ্রিয় রম্যসাহিত্যিক ও কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব।

২৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে কোয়ান্টাম স্টলে 'ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন' ও সদ্য প্রকাশিত 'বিকশিত হোক শত ভাবনা' বইটিতে পাঠকদের অটোগ্রাফ দেন পদার্থবিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক ও লেখক ড. এম শমশের আলী।

মোড়ক উন্মোচনের পর কোয়ান্টাম স্টলে আগত পাঠকদের নতুন বইতে অটোগ্রাফ দেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ ও আহসান হাবীব। উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এই দুই শুভানুধ্যায়ীসহ দেশের বিভিন্ন অঙ্গনের সফল ও খ্যাতিমান ৩৩ জন বরেণ্য ব্যক্তির চিন্তা ও দর্শনের এক অনবদ্য সংকলন 'বিকশিত হোক শত ভাবনা'।

ভাষা শহিদদের স্মরণে এবারের বইমেলায় মাসব্যাপী ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তমঞ্চের পাশে এ ক্যাম্পে শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-বয়সের ৯০৫ জন মানুষ রক্তদান করেন।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মার্চ ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

এপ্রিল ২০১৯

কোয়ান্টাম বুলেটিন

শুভ নববর্ষ
বঙ্গাব্দ ১৪২৬

মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব

সৃষ্টির সেবায় সার্থক হোক বর্ষবরণ ১৪২৬

বঙ্গাব্দ ১৪২৬। প্রতিবছরের মতো এবারও কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা বাংলা নববর্ষকে বরণ করবেন সেবা, পারস্পরিক একাত্মতা ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পুরো এপ্রিল মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব। আর এ উপলক্ষে ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ) অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করসেবা।

এ হালখাতা উৎসবে দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলোতে সমবেত কোয়ান্টাম সদস্যবৃন্দ অংশ নেবেন মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ইতঃপূর্বে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং সেইসাথে সবার কাছে নতুন মাটির ব্যাংক পৌঁছে দেয়াই এ করসেবার লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, বছরজুড়ে পরিচালিত এ মাটির ব্যাংক কার্যক্রমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গতিশীল একাধিক সেবা-কার্যক্রমের অন্যতম অর্থায়ন-উৎস। যা দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে গত দু-যুগ ধরে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে কোয়ান্টাম।

পরম করুণাময়ের নিকট গভীর শুকরিয়া জানিয়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ২০১৮ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক থেকে সারা বছরে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি ৪৯ লক্ষাধিক টাকা।

মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণের পাশাপাশি বিশেষ উপহার হিসেবে সবাইকে পৌঁছে দেয়া হবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৫৮ ব্যাচে পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কোর্স কার্ড, বুলেটিন এবং ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সার্বজনীন বাণী-সম্বলিত একাধিক স্টিকার, যার মধ্যে 'নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম' ও 'দেশকে ভালবাসুন, বৈশাখে ইলিশ বর্জন করুন' উল্লেখযোগ্য।

বরকতান বরকতান! কোয়ান্টাম মেথড ৪৫৮

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে একধাপ এগিয়ে থাকুন

পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা-র ১৪৮ নং আয়াতে উঠে এসেছে মানবজীবনের একটি চিরন্তন সত্য। আল্লাহ বলেন, *প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য আছে; যা তার কর্মধারাকে পরিচালনা করে ...*। বাস্তবেও আমরা যখন নিজেদের জীবনের দিকে তাকাই, বন্ধু-স্বজন-পরিচিতদের জীবন দেখি, আমরা সহজেই বুঝতে পারি এ আয়াতের চিরসত্যতা। সচেতনভাবে হোক কিংবা অবচেতনে, আমাদের সবারই একটা লক্ষ্য আছে। একজন শিক্ষার্থীর লক্ষ্য শিক্ষায় সাফল্য, পেশাজীবীর লক্ষ্য পেশাগত সাফল্য কিংবা যিনি অসুস্থ, তার সমস্ত ইচ্ছা ও চেতনাজুড়ে থাকে সুস্থ হওয়ার আকুতি।

আর এ লক্ষ্য পূরণের জন্যে সবার আগে দরকার জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেইসাথে দৈনন্দিন জীবনে এটি প্রয়োগের কৌশলগুলো জানা, যা সবচেয়ে কার্যকরভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। গত সিকি শতাব্দির পথ পরিক্রমায় দেশে-বিদেশে হাজার হাজার কোয়ান্টাম মেথড চর্চাকারীর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের মধ্য দিয়ে এটি আজ এক পরীক্ষিত সত্য।

তাই আপনিও অংশ নিন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। শিখুন জীবনযাপনের সর্বাধুনিক বিজ্ঞান। আপনার লক্ষ্য পূরণের পথে একধাপ এগিয়ে থাকুন। সাফল্য ও সার্থকতায় ভরে উঠুক আপনার জীবন। জীবনজয়ী লাখো মানুষের মতো আপনিও বলে উঠুন–আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী। আমি পারি আমি করব। আমার জীবন আমি গড়ব।

১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকেই কোয়ান্টাম মেথড চর্চার সাথে যুক্ত হয়েছেন দেশের নানা শ্রেণি-পেশা-বয়সের লাখো মানুষ। নিরাময় ও দৈহিক সুস্থতা, মানসিক প্রশান্তি ও উদ্যম আর কর্মতৃপ্ত সুখী জীবন লাভের চিরায়ত সূত্রগুলো আয়ত্ত করেছেন তারা। দৈনন্দিন চর্চায় পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছেন নিজের লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণের পথে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, জীবনের সকল নেতিবাচকতা অতিক্রম করতে প্রয়োজন ধ্যান ও ইতিবাচকতার চর্চা। এতে আপনার দেহ-মন হয়ে উঠবে টক্সিনমুক্ত, প্রশান্ত ও উদ্দীপ্ত। বাড়বে আপনার উদ্যম ও প্রাণবন্ততা। ফলে বাধা-প্রতিকূলতা যতই আসুক, ঠিকই তা পেরিয়ে আপনি থাকবেন লক্ষ্যে অটল। ফলে সবদিক থেকেই আপনি হবেন সুখী ও তৃপ্ত।

আসন্ন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৫৮ ব্যাচে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে থাকুন সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ ও সুখী জীবনের পথে। সক্রিয়ভাবে যুক্ত হোন কল্যাণ ও মানবিকতার অগ্রযাত্রায়।

রক্তদান কার্যক্রমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে কোয়ান্টাম

–মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আমি নিজেও বহুবার রক্তদান করেছি। তাই রক্তদাতাদের সম্মান জানাতে পেরে আজ আমি নিজেকেই গর্বিত মনে করছি। সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখছি সেজন্যে প্রয়োজন আপনাদের মতো ত্যাগী মানুষ, যারা কোনোকিছুর প্রত্যাশা ছাড়াই মানুষের প্রয়োজনে রক্তদান করেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই যে, গত ১৮ বছরে তারা ১০ লক্ষাধিক ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে, যা দেশের মোট রক্ত চাহিদার সাত ভাগের একভাগ। রক্তদান কার্যক্রমে দেশে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে কোয়ান্টাম।

কোয়ান্টামের আরেকটি জনপ্রিয় কার্যক্রম হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স, যার মাধ্যমে দেশের লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। টেনশন ও নানা রোগ থেকে মুক্তির জন্যে মেডিটেশন বর্তমানে বিশ্বজুড়ে একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল গত ১৫ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন।]

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৫৮ ব্যাচ ॥ ঢাকা

১৯, ২০, ২১ ও ২২ এপ্রিল

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদই আমার কাছে বীরশ্রেষ্ঠ

শহীদজায়া মিলি রহমান

মিলি রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শনকারী বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের সহধর্মিণী। ১১ মার্চ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় স্বাধীনতাযুদ্ধে মতিউর রহমানের অসামান্য অবদানের স্মৃতিচারণ করেন তিনি। এ নিবন্ধটি তার আলোচনার অনুলিখন

আগস্ট ১৯৭১। মতিউরের কর্মসূত্রে আমরা তখন থাকি পাকিস্তানের মৌরীপুরে, মাশরুর বিমানঘাঁটিতে। ২০ আগস্ট ছিল শুক্রবার। জুমার আজান হচ্ছিল, এমন সময় কিছু মিলিটারি পুলিশ আমাদের বাড়িটা ঘিরে ফেলল। আমার তখন ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু মনে মনে খুশি হলাম–আমার স্বামী মতিউরের এতদিনের স্বপ্ন হয়তো সার্থক হতে চলেছে। নিশ্চয়ই সে এতক্ষণে প্লেন নিয়ে পাকিস্তানের আকাশসীমা অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছে গেছে।

এদিকে মতিউরের কথামতো তার বিমান ছিনতাই পরিকল্পনার সব কাগজপত্র ও ছবি পুড়িয়ে টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে দিলাম। দুজন পুলিশ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল–'মিসেস মতিউর কে?' আমি এগিয়ে গেলাম। মতিউর কোথায় আছে জানতে চাইল। বললাম, সকালে অফিসে গেছে। এখনো ফেরে নি।

আমাদের গৃহবন্দি করা হলো। বাড়িতে ছিলাম আমি, আমার দুই শিশুকন্যা ও তাদের দেখাশোনার জন্যে একটি কিশোরী এবং বাবুর্চি। অন্য কারো প্রবেশ তখন সম্পূর্ণ নিষেধ। দফায় দফায় বাড়ি সার্চ করা হলো। সব লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল মিলিটারিরা।

পরদিন ওরা আবার এলো। দেয়ালে টাঙানো মতিউরের ছবিটা নামিয়ে বুট দিয়ে সমানে লাথি মারতে থাকল এক অফিসার। এটা দেখে আমার বড় মেয়ে, তার বয়স তখন মাত্র দুই বছর আট মাস, চিৎকার করে কাঁদছিল–'আব্বার ছবি ভেঙে ফেলছে!' আর আমি আমার আট মাস বয়সী ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে নীরবে এসব দেখছিলাম।

কিছুক্ষণ পর বিমান বাহিনীতে মতিউরের কমান্ডিং অফিসার রান্দাভা এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি সাহসের সাথে কথা বললাম। কারণ মতিউর আমাকে বলে গিয়েছিল, 'কোনো অবস্থাতেই তুমি ভেঙে পড়বে না। ওরা তোমার কিছু করতে পারবে না।' কমান্ডিং অফিসার জানালেন, এই বাড়িতে আর থাকা যাবে না। শহরের একটা বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।

রাত ১২টায় একটি গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে গেল দূরের এক ক্যান্টনমেন্টে। কালো কাপড়ে ঘেরা একটি ঘরে ঢোকানো হলো আমাদের। বাচ্চাদের শোয়াব কোথায়, খাওয়াব কী–কিছুরই কোনো ব্যবস্থা নেই। এসব জানতে চাইলে তারা আমার সাথে ভীষণ দুর্ব্যবহার করতে লাগল।

আবার শুরু হলো ইন্টারোগেশন পর্ব। পাশের একটি ঘরে নিয়ে আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হতো। এদিকে বাচ্চারা আমাকে না পেয়ে কান্না শুরু করে দিত। কিন্তু আমাকে আটকে রাখত, যাতে ওদের কান্না শুনে আমার যন্ত্রণা হয়।

তখনো জানি না মতিউর কোথায় আছে কীভাবে আছে। মিলিটারি অফিসারটি বলল, ২০ আগস্ট মতিউর একটি প্লেন নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। সেদিন রানওয়েতে একটি যুদ্ধবিমান উড্ডয়নের অপেক্ষায় ছিল। যেহেতু মতিউর একজন ফ্লাইট সেফটি অফিসার, বিমানটির যন্ত্রাংশে ত্রুটির মিথ্যা ইশারা দিয়ে সে ওটা থামানোর চেষ্টা করে। বিমানে ছিল তরুণ পাকিস্তানি পাইলট রশিদ মিনহাজ, সে বিমান থামিয়ে ক্যানোপি অর্থাৎ ওপরের ঢাকনাটি খুলতেই মতিউর লাফ দিয়ে পেছনের সিটে বসে ক্লোরোফর্মের মাধ্যমে ঐ পাইলটকে অজ্ঞান করার চেষ্টা করে। অজ্ঞান হওয়ার আগে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে রশিদ ওয়ারলেসে জানিয়ে দিল–'আই হ্যাভ বিন হাইজ্যাকড!' ব্যস্, এটা রেকর্ড হয়ে গেল।

মতিউর প্লেন উড়িয়ে দিল ভারতের দিকে। একজন দক্ষ পাইলট ছিল বলে সে রাডার ফাঁকি দিয়ে মাত্র ২০ ফুট উচ্চতায় উড়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্লেনটা ভারতীয় সীমান্তবর্তী থাট্টা নামক স্থানে ক্র্যাশ করল। রশিদের মৃতদেহ পুড়ে গেল প্লেনেই। আর সিট বেল্ট বাঁধা ছিল না বলে মতিউর ছিটকে পড়ল সিন্ধু নদের পাড়ে এবং প্রাণ হারাল। শুনে আমার পুরো পৃথিবীটাই দুলে উঠল। মতিউর নেই!

পাকিস্তানি অফিসারটি মতিউরের প্রতি আক্রোশ ঝেড়ে বলল, পৃথিবীকে আমরা এতদিন বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যা হচ্ছে সেটা একটা গৃহবিবাদের মতো ব্যাপার, তেমন গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু তোমার স্বামী এই কাণ্ডটা করায় সমস্ত পৃথিবী এখন জেনে গেল–এটা একটা যুদ্ধ এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে বিভেদটাও স্পষ্ট হয়ে গেল।

টানা ২৩ দিন সেই অন্ধকার ঘরে আমাদের আটকে রাখা হলো। ঘরের ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে শুধু দুপুরে খাবার দেয়া হতো। আমার সন্তান দুটি খাবারের কষ্টে আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওদের বমি-পায়খানায় সারা ঘর একাকার। উপরন্তু আছে জিজ্ঞাসাবাদের মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু মনে সাহস ছিল, মতিউরের বিশ্বাস আমার সাথে আছে।

২৯ সেপ্টেম্বের দেশে ফেরার অনুমতি পেলাম। কিন্তু জানাল, আমার ওপর কড়া নজরদারি থাকবে। দেশে ফেরার আগে মতিউরের কবরটা দেখতে চাইলাম। ওখানে গিয়ে দেখি একপাশে মতিউরের ছবি, নিচে লেখা 'গাদ্দার' আর অন্য পাশে রশিদ মিনহাজের ছবি, তাতে লেখা 'হিরো'। কবরের কাছে যেতেও দিল না ওরা। দূর থেকে দেখেই চলে আসতে হলো আমাকে।

পরিচিতদের অনেকেই আমাকে পরে বলেছেন, 'মতিউরের পরিকল্পনা সম্পর্কে তুমি সবই জানতে, তাহলে ওকে বাধা দাও নি কেন?' কিন্তু আমি জানি, ইচ্ছা করলেও এটা আমি পারতাম না। আর এরকম অন্যায় ইচ্ছা আমি করতামও না।

মতিউরের সাথে আমার বিয়ে হয় ১৯৬৮ সালের ১৯ এপ্রিল। মতিউর একজন পাইলট কিন্তু ওকে প্লেন চালাতে দেখতাম না। শুধু অফিসে যায় আর আসে। একদিন কারণ জানতে চাইলাম। সে বলল, 'আমি ও এক পাঞ্জাবী সহকর্মী গত বছর অনুমতি ছাড়াই বিমান নিয়ে ডগফাইট করেছিলাম, এটা এক ধরনের খেলাও বটে। আমার শাস্তি হলো–দুবছর প্লেন চালাতে পারব না। অথচ পাঞ্জাবী পাইলটটি কোনো শাস্তিই পেল না!'

শুরু থেকেই দেখেছি, সামাজিক অর্থনৈতিক নানা ক্ষেত্রে পাকিস্তানিদের শোষণ ও বৈষম্যগুলো মতিউর সহজভাবে মেনে নিতে পারত না। সবসময় একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখত সে। আমাকে এবং সন্তানদের কখনোই উর্দু বলতে দিত না। মাতৃভাষাকে খুব সম্মান করত। তার মুখে প্রায়ই শুনতাম–'এভাবে চলতে পারে না, একদিন এই বৈষম্যের অবসান ঘটবেই।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মতিউরের জন্যে প্রায়ই খুব কান্নাকাটি করতাম। এটা দেখে আমার বাবা একদিন আমাকে নিয়ে বের হলেন, দেখালেন ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হাজারো নারী-পুরুষ-শিশুর মরদেহ। বাবা বললেন, 'তুমি একজন মতিউর হারিয়েছ। এরকম লাখো পরিবার তাদের স্বজনদের হারিয়েছে এবং এই ত্যাগের বিনিময়েই আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। তাই তোমাকে এই কষ্ট ভুলতে হবে।'

আসলে মতিউরের জন্যে আমার যেমন কষ্ট হয়, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের স্বজনদেরও কষ্টটা একই রকম। বীরশ্রেষ্ঠ তো একটি উপাধি মাত্র, কিন্তু যুদ্ধে স্বজন হারানো কষ্টের অনুভূতিগুলো তো সবার একই। আমার কাছে তাই মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদই বীরশ্রেষ্ঠ।

যুদ্ধ সাময়িক। কিন্তু ভালবাসা চিরস্থায়ী। ভালবাসাই পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তরুণদের বলি–তোমরা দেশটাকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের মানুষের যে অসামান্য ত্যাগ, সেই ত্যাগকে উপলব্ধি করে নিজেদের বদলাও। কোনো তরুণকে যখন ভালো কাজ করতে দেখি, আমি আমার মতিকে অনুভব করি। মতিউর তার বিশ্বাস ও দেশের প্রতি ভালবাসা নিয়ে আমাদের সাথেই আছেন।

একটি সিদ্ধান্ত ॥ বদলে দিতে পারে আপনার জীবন

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর কমপ্যাশন এন্ড অ্যালট্রুইজম রিসার্চ এন্ড এডুকেশনে ধ্যানমগ্ন শিক্ষার্থীরা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হচ্ছে ক্যারিয়ার ও জীবন সাজানোর কোর্স 'ডিজাইনিং ইয়োর লাইফ'। সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সটির ফি ২,১৪,২০০ টাকা।

২০১৮ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ল্যারি স্যান্তোস-এর 'সাইকোলজি এন্ড গুড লাইফ' কোর্সে অংশ নেয়া ১২০০ শিক্ষার্থীর একাংশ। এর মূল বক্তব্য : সুখী হওয়ার জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্জন এবং পরিবার, আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটমান কনফারেন্স সেন্টারে চলছে মেডিটেশন চর্চা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে মেডিটেশন ও সুখী হওয়ার কোর্স 'দ্য সায়েন্স এন্ড এপ্লিকেশন অব পজিটিভ সাইকোলজি'। কোর্সটির ফি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যথাক্রমে ১,৩১,৭৫০ ও ২,২৯,৫০০ টাকা।

এমআইটি-তে (ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়) বার্কার লাইব্রেরিতে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত মেডিটেশনে অংশ নেন শিক্ষার্থীরা। এ-ছাড়াও রয়েছে সুখী জীবনের রহস্য ও প্রতিকূলতার মুখে করণীয় বিষয়ক কোর্স 'ডিজাইনিং ইয়োর লাইফ'।

কোয়ান্টাম মেথড ॥ জীবনকে সুন্দর করার বিজ্ঞান

২৭ বছর ৪৫৭টি ব্যাচ বদলে গেছে লাখো জীবন

বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাম্প্রতিক সময়ে ধ্যানচর্চা ও সুখী জীবনের সূত্র শেখাতে চালু করেছে নানারকম কোর্স। একাডেমিক কোর্সের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই নিয়মিত মেডিটেশন করার সুযোগ। এই চিত্রটিই স্পষ্ট করে দেয়–সুখের সন্ধান আজ বিশ্বজুড়ে।

প্রতিটি মানুষ চায় সুখী হতে, সফল হতে, শান্তিতে থাকতে। কিন্তু অধিকাংশই তা পায় না। কারণ সুখ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া এবং এর পুরোটাই নির্ভর করে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যিনি যত ইতিবাচক ও সঠিক জীবনদৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারবেন, তিনি তত সুখী। আর ইতিবাচক শক্তির উৎসই হলো মেডিটেশন।

চিকিৎসক ও মনোবিদরা বলছেন, শুধু পূর্ণবয়স্ক মানুষদের জন্যেই নয় বরং শিশুদের জন্যেও মেডিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শৈশবে গড়ে ওঠা আচরণ-অভ্যাসই নির্মাণ করে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব। যে শিশুরা মেডিটেশন চর্চার সুযোগ পায়, তারা হয়ে ওঠে প্রশান্ত, সমমর্মী এবং জীবনের যে-কোনো বাঁকবদলকে তারা গ্রহণ করতে পারে সহজভাবে, খুঁজে নেয় সমস্যার সমাধান। তাই সুন্দর জীবন গড়তে প্রত্যেকের জন্যেই প্রয়োজন মেডিটেশন।

২৭ বছর ধরে এ কথাগুলোই বলে আসছে কোয়ান্টাম। চার দিনের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা শিখে থাকেন মেডিটেশন ও সুখী হওয়ার সহজ সূত্রগুলো, যার ব্যাপ্তি শুধু জীবনের এক বা একাধিক ক্ষেত্র নয়; বরং এর লক্ষ্য ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ। তাইতো জীবনকে সুন্দর করার এ বিজ্ঞান জানতে ২৭ বছরে অংশ নিয়েছেন লাখো মানুষ এবং বদলে ফেলেছেন নিজেকে। পেয়েছেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। তাই সিদ্ধান্ত নিন আপনিও। এই একটি সিদ্ধান্ত বদলে দিতে পারে আপনার জীবন।

শারীরিক সুস্থতা
জানবেন দমচর্চা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যচর্চার প্রতিটি ধাপ

মানসিক প্রশান্তি
শিখবেন রাগ-ক্ষোভ-হিংসা-হতাশা থেকে মুক্তির উপায়

আর্থিক প্রাচুর্য
নিজের জীবন নিজে গড়ার প্রত্যয় সৃষ্টি হবে। পাবেন প্রাচুর্য অর্জনের সূত্র

সুখী পরিবার
শিখবেন সম্পর্কোন্নয়নের বাস্তব কিছু কৌশল। মমতায় গড়ে উঠবে সুখী পরিবার

আত্মিক পূর্ণতা
আত্মিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সংযুক্ত হতে পারবেন অন্তরতম 'আমি'র সাথে

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে এ কোর্সে এসেছি

অধ্যাপক ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহ্

গত দুবছর ধরে আমি ঠান্ডার সমস্যায় ভুগছি। শীতে, গ্রীষ্মে, এসি-তে, সাধারণ তাপমাত্রায় সবসময় ঠান্ডা লাগে। বিশেষজ্ঞ একজন চিকিৎসক বললেন, এটা মনোদৈহিক রোগ। তিনি আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পরামর্শ দিলেন।

কোর্সে এসে আমার ঠান্ডা লাগার প্রবণতা কমেছে। এ-ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে আমার ব্যাকপেইন ছিল। মেডিটেশন চর্চা করে সেই ব্যথাও এ চার দিনে আর অনুভব করি নি।

এ কোর্সে এসে আরো নানাভাবে আমি উপকৃত হয়েছি। পারিবারিক মেডিটেশনে বহু বছর পর আমার মা-বাবাকে অনুভব করেছি। মেডিটেশনের মধ্যেই আমি অশ্রুসিক্ত হয়েছি। আমার জন্যে এ এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

আমি মনে করি, সমাজব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাইলে মেডিটেশন চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

[প্রাক্তন উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৭ ব্যাচ]

অভিভাবকেরা এখানে এলে পরিবার ও দেশ উপকৃত হবে

ডা. নাজনীন আক্তার

রোগীদের আমি প্রয়োজনীয় ওষুধের পাশাপাশি সবসময়ই খাবার এবং নিয়মকানুনের একটি চার্ট করে দেয়ার চেষ্টা করি। আমি যেহেতু শিশুদের চিকিৎসা করি, আমার অভিজ্ঞতা হলো–বেশিরভাগ অভিভাবকই এ নিয়মকানুন মেনে চলেন না। শুধু প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কিনে নেন।

অথচ সুস্থ থাকার পূর্বশর্তই হচ্ছে সঠিক জীবনযাপন। এ কথাগুলো এ কোর্সে খুব সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। আমি মনে করি, সকল অভিভাবকদের এ কোর্সে অংশ নেয়া উচিত। তাহলে ব্যক্তি ও পরিবার যেমন উপকৃত হবে, সমাজও উপকৃত হবে।

এ-ছাড়াও মেডিটেশন করে আমার রাগটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। আগে অনেক সময় অকারণে রেগে যেতাম, যেটা এখন হচ্ছে না। এখানে এসে আমি জীবনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা পেলাম।

[শিশু নিউরোলজিস্ট ও সহকারী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ৪৫৪ ব্যাচ]

কোর্সটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত

অধ্যাপক ড. মো. খালেকুজ্জামান

আমার ছোট ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, তাকে সাথে নিয়ে আমি এ কোর্সে অংশ নিয়েছি। এই চার দিনেই আমি তার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করেছি। কোর্সের আলোচনা ও মেডিটেশনগুলো খুবই সময়োপযোগী। আমার স্কুলপড়ুয়া সন্তানটি যেমন উপকৃত হয়েছে, আমিও উপকৃত হয়েছি।

এ কোর্সে এসে আমার মনোবল অনেকটা বেড়েছে। গুরুজীর আলোচনাগুলো সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হওয়ায় আমার জন্যে এই কোর্সে অংশ নেয়াটা একটি আনন্দের অভিজ্ঞতা। এখন আমিও বিশ্বাস করি, মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে একজন মানুষ সুস্থ জীবন গড়তে পারে।

বর্তমান সময়ে ভার্চুয়াল ভাইরাস ও নানা কারণে মানুষের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের অর্থবিত্ত ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু শান্তিটা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, এ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সর্বোত্তম প্রতিষেধক কোয়ান্টাম মেথড।

[অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৫ ব্যাচ]

ডাক্তার ও রোগী উভয়ের জন্যে প্রয়োজন এ কোর্সটি

ডা. মো. আতিকুল হক

মেডিটেশনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের মাধ্যমে। তখন আমি এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী। সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে নিয়মমাফিক পড়াশোনা করা এবং দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আমি এই বইটি থেকেই পেয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাই। কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়া আর হয়ে ওঠে নি।

আমরা জানি, চিকিৎসকদের পেশা বরাবরই ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে প্রতিনিয়ত রোগীদের অসুস্থতার কথাই শুনতে হয়, ডাক্তারদের জন্যে যা প্রায়ই স্ট্রেসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্ট্রেস থেকে রেহাই পেতে মেডিটেশন আমাকে সাহায্য করেছে।

এ কোর্সে এসে দমচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম। কারণ শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতিই আসলে মানুষকে দুর্বল ও অসুস্থ করে তোলে। অথচ দমচর্চার মাধ্যমে একজন মানুষ খুব সহজেই তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেতে পারে। কোর্সের আলোচনা ও মেডিটেশন শিখে মনে হচ্ছে, জীবনে সফল হওয়ার জন্যে পরিপূর্ণ একটি প্যাকেজ পেলাম। আমি মনে করি, ডাক্তার এবং রোগী দুজনেরই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসা উচিত।

[মেডিকেল অফিসার, সার্জারি বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ৪৫৫ ব্যাচ]

সুখী পরিবার গড়তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এ কোর্সটি করা উচিত

কমর সুলতানা

আমার স্বামী একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কিন্তু তার এই মেডিটেশন বা কোয়ান্টামের সাথে সম্পৃক্ততা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না, যদিও আমার দাম্পত্যজীবন বেশ সুখের। আমি ভাবতাম কোয়ান্টাম বোধ হয় মেডিটেশনের মাধ্যমে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। তার আগ্রহেই একপর্যায়ে আমাকে কোর্সে আসতে হয়েছে। প্রথমে খানিকটা বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কোর্সে এসে আমি সত্যিটা বুঝতে পেরেছি–আমার স্বামী কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো অনুসরণ করেন বলেই আমাদের পারিবারিক জীবনটা এত সুখের।

আমি মনে করি–সুখী পরিবার গড়তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এই কোর্সটি করা উচিত। না হলে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থেকেই যাবে। আমি এখন বিশ্বাস করি, আমরা দুজনে মিলে সুন্দর ও ছন্দময় একটি জীবন গড়তে পারব।

[গৃহিণী। ৪৫৫ ব্যাচ]

জীবনটাকে নতুনভাবে দেখতে শিখলাম

গীতশ্রী চন্দ

আমি একজন কর্মজীবী মা। দুটি সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু আড়াই বছর আগে আমার জীবন অনেকটাই পাল্টে যায়। আমার বড় ছেলের বয়স তখন পাঁচ বছর। হঠাৎ তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। ডাক্তার বললেন, তাকে দিনে পাঁচ বেলা ইনসুলিন নিতে হবে। তাই সন্তান নিয়ে সারাদিন আমার নানান দুশ্চিন্তা ছিল।

পেশাগত জীবনে আমি বেশ সফলতার সাথেই এগোচ্ছি। কিন্তু সন্তান ও পরিবার নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কারণে সন্ধ্যায় যখন বাসায় ফিরি, একটুতেই রেগে যাই। জানি এটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। এ কারণে রাতেও ভালো ঘুম হতো না। ওষুধ খেতে হতো। আমি এ থেকে বের হওয়ার একটা পথ খুঁজছিলাম।

কোর্সে এসে আমি সেই পথটাই খুঁজে পেলাম। সন্তানকে নিয়ে এখন আর আমার দুশ্চিন্তা নেই; বরং সে সুস্থ হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। কোর্সে শেখানো প্রক্রিয়া অনুসারে তাকে নিরাময়ের চেষ্টা করছি। মেডিটেশন চর্চার ফলে ঘুমের ওষুধ ছাড়াই রাতে ভালো ঘুম হচ্ছে। কোর্সে এসে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে জীবনটাকে নতুনভাবে দেখতে পারছি।

[ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলার, স্ট্রমি ফাউন্ডেশন, মহাখালী, ঢাকা। ৪৫৭ ব্যাচ]

এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স

ড. মাহবুবুর রহমান

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভালো মানুষ গড়া। তবে এই শিক্ষাটা অবশ্যই হতে হয় জীবনভিত্তিক। বর্তমান সময়ে আমরা যত আত্ম উন্নয়নমূলক বই পড়ি–এগুলো কিছু তথ্য দেয় বটে, কিন্তু ঐ জানা পর্যন্তই, জানাকে তা মানায় রূপান্তর করতে পারে না।

ভালো কথা তো খুব সহজেই বলে ফেলা যায় কিন্তু সেই ভালো কথার চর্চা বা অনুশীলন যদি নিজের জীবনে না থাকে, তাহলে সেটা কখনো অন্যকে প্রভাবিত করে না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে যে কথাগুলো আমি শুনলাম এবং যে মেডিটেশনগুলো করলাম, তাতে আমি সত্যিই অভিভূত। কারণ আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি এখানে খুব সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

এ কোর্সে তরুণদের উপস্থিতি আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করেছে। আমার শিক্ষকতা জীবনের এ পর্যায়ে এসে আজ মনে হচ্ছে, এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স। বলতে দ্বিধা নেই, গুরুজী আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

[সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৭ ব্যাচ]

কোয়ান্টাম পরিবারের সাথেই আজীবন থাকতে চাই

জামিলা হাসান

গত দুবছর ধরে আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। আর্থ্রাইটিস, এজমা–একের পর এক অসুস্থতা আমাকে খুব দুর্বল করে দিয়েছিল। শারীরিকভাবেই শুধু নয়, মানসিকভাবেও আমি বেশ ভেঙে পড়েছিলাম। অথচ সারাজীবনই আমি একজন প্রাণচঞ্চল ও কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলাম। কিন্তু এই অসুস্থতার জন্যে দিন দিন নিজেকে নির্জীব লাশের মতো মনে হতো।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি বুঝতে পারলাম, এত দিনের অসুখগুলো ছিল আমার মনের নেতিচিন্তারই একটি কুফল, যা মেডিটেশনের মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব। মেডিটেশন করে ও কোর্সের আলোচনা শুনে আমার মনের জোর বেড়ে গেছে।

এখানে এসে দ্বিতীয় দিন থেকে পায়ে কোনো ব্যথা অনুভব করছি না। স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছি। আগের চেয়ে আমি এখন অনেক সুস্থবোধ করছি। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম পরিবার এখন আমার পরিবার। এর সাথেই আমি আজীবন থাকতে চাই।

[সমাজসেবী ও মহিলা পরিষদের সদস্য। ৪৫৫ ব্যাচ]

আমি সৌভাগ্যবান যে সপরিবারে এখানে এসেছি

মো. মাসুদ আলম

কোয়ান্টামের এই কোর্সে এসে আমার জীবনে একটা ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার। কিন্তু এই চারটি দিন আমি শিশুর কৌতূহল নিয়ে শেখার চেষ্টা করেছি। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, সপরিবারে এখানে এসেছি। এতে সুখী পরিবার গড়ার শিক্ষাগুলো অনুসরণ সহজ হবে।

কোর্সের আলোচনায় প্রতিটি কথাকে গুরুজী আমাদের জীবনের সাথে সমন্বয় করে দিয়েছেন। ফলে জানা সত্যগুলোই আবার নতুনভাবে অনুসরণের পথ খুঁজে পেয়েছি।

আধুনিক গ্যাজেট আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলো দুর্বল করে দিচ্ছে। এসব যারা উদ্ভাবন করেছেন, তারাও এখন অনুশোচনায় ভুগছেন।

আমি বিশ্বাস করি, কোর্সে শেখানো সূত্রগুলো অনুসরণ করলে ভার্চুয়াল আসক্তি এবং পাশ্চাত্য সমাজের অন্ধ অনুকরণ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব।

[ডিজিএম, আবুল খায়ের স্টিল লিমিটেড, চট্টগ্রাম। ৪৫৬ ব্যাচ]

ইন্টারনেট আসক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি

ফারিয়া স্মরণী

আমি যেহেতু কম্পিউটার প্রকৌশল নিয়ে পড়ছি, আমার ধারণা ছিল, ২৪ ঘণ্টাই আমাকে ইন্টারনেটে থাকতে হবে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, আমি যতক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহার করছি, তার মাত্র ২০ শতাংশ পড়াশোনা বা প্রয়োজনীয় কোনো কাজে। আর বাকি ৮০ ভাগ সময় নিয়ে নিচ্ছে ফেসবুক, ইউটিউব বা সিরিয়াল।

কোর্সে এসে উপলব্ধি করলাম, এতদিন আমি ইন্টারনেট আসক্তিতে আচ্ছন্ন ছিলাম। এখন আমি বুঝতে পেরেছি–ইন্টারনেটে কতটুকু সময় আমার দেয়া উচিত। এ-ছাড়া আগে আমি একটুতেই রেগে যেতাম। মেডিটেশন করে আমার রাগও এখন নিয়ন্ত্রণে।

[চতুর্থ বর্ষ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৪ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে আমার সাহস বেড়েছে

আল-আমিন হোসেন

তিন বছর আগে খেলতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের শক লাগে আমার দুই হাতে। প্রাণে বাঁচলেও আমি লিখতে বা ঠিকভাবে কোনো কাজ করতে পারতাম না। আমার সাইনাসের সমস্যাও রয়েছে। এজন্যে আমাকে উপুড় হয়ে ঘুমাতে হতো। প্রতিদিন প্রচুর ওষুধও খেতাম। সব মিলিয়ে নিজেকে নিয়ে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। সামনে আমার এইচএসসি পরীক্ষা। কিন্তু রেজাল্ট ভালো হবে কিনা–এসব নিয়ে ভয় পাচ্ছিলাম।

আমার একজন শিক্ষকের পরামর্শে এই কোর্সে আমি অংশ নিয়েছি। নিরাময় মেডিটেশন করে আমি অনেক সুস্থবোধ করছি। সাইনাসের সমস্যাও আর নেই। আমার সাহস বেড়েছে। ইনশাল্লাহ পরীক্ষার জন্যেও ভালো প্রস্তুতি নিতে পারব।

[এইচএসসি পরীক্ষার্থী (২০১৯), নর্থ ওয়েস্টার্ন কলেজ, মিরপুর। ৪৫৫ ব্যাচ]

স্মার্টফোন ছাড়াও আমি বাঁচতে পারব

ছুম্মান জাহান ছোঁয়া

আমাদের প্রজন্মের সমস্যা হচ্ছে কোনোকিছুতেই মন বসে না। সবকিছুতেই শুধু 'ভাল্লাগে না' বলতে থাকি। আমিও ছিলাম এমনই স্বভাবের। এ কারণে সারাক্ষণ ফোন নিয়ে পড়ে থাকতাম। ছয় বছর বয়স থেকেই আমার প্রিয় সঙ্গী স্মার্টফোন।

কোর্সে এসে আমি উপলব্ধি করলাম, স্মার্টফোন আসলে শয়তানের বাক্স। এটা ছাড়াও আমি বেঁচে থাকতে পারব। এর বাইরেও একটা জীবন আছে। সেটা আমাদের বাস্তব জীবন। গুরুজীকে ও কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ, এই কোর্সের মাধ্যমে আমি আমার বাস্তব জীবনকে ফিরে পেয়েছি।

[ঢাকা সেন্ট্রাল গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি (২০১৯) পরীক্ষা দিয়েছেন। ৪৫৭ ব্যাচ]

আমি এখন আগের চেয়ে আত্মবিশ্বাসী ও সামাজিক

জাকিয়া সুলতানা সারা

আমি জীবনে কী হতে চাই–কোনোভাবেই এই লক্ষ্যটি স্থির করতে পারছিলাম না। আম্মু ডাক্তার হতে বললে তা-ই হতে মন চাইত। আব্বু ইঞ্জিনিয়ার হতে বললে মনে হতো এটাই হবো। কিন্তু মনছবির মেডিটেশন করে আমি আমার লক্ষ্য স্থির করেছি।

এখন আমি বিশ্বাস করি, মেডিটেশন করে আমি যখন পড়তে বসব, ক্লাসের পড়া দ্রুত সম্পন্ন করতে পারব এবং যা পড়ব সবই আমার মনে থাকবে।

এ কোর্সটি সম্পন্ন করে মনে হচ্ছে, আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং সামাজিক হয়ে উঠছি।

[দশম শ্রেণি, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। ৪৫৫ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি অঙ্ক বুঝি এবং অনুশীলন করি, কিন্তু আমার সময় বেশি লাগে। অল্প সময়ে তাড়াহুড়ো করে লেখা সম্পন্ন করতে গেলে নার্ভাস হয়ে যাই এবং গণ্ডগোল বাঁধিয়ে ফেলি। এখন আমি বিজ্ঞান না মানবিক শাখায় পড়ব?*

উত্তর : কোন শাখায় পড়বেন এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেখানে পড়বেন সেখানে প্রথম হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে সাফল্যের জন্যে বিশেষ কোনো সাবজেক্ট হলে ভালো, না হলেও ভালো। এমন কোনো সাবজেক্ট নেই যা নিয়ে পড়াশোনা করে জীবনে প্রথম হওয়া যায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা যা পড়ি, আমাদের কর্মজীবনে তার কোনো প্রভাব থাকে না। পড়ি একটা, করি আরেকটা। অতএব পছন্দের সাবজেক্ট হলে ভালো, না হলেও ভালো।

প্রথমত, সবসময় ফ্লেক্সিবল থাকবেন। বিজ্ঞান পড়ে জীবনে প্রথম হওয়া সম্ভব, মানবিক শাখায় পড়েও সম্ভব। আসল বিষয়টা হচ্ছে, আপনি কতটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন এবং কতটা আয়ত্ত করছেন। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও রেজাল্টের গুরুত্ব আছে। অতএব যা পড়ছেন তা আয়ত্ত করতে হবে।

এখন থেকে ২০ বছর আগের একটি ঘটনা। রাজশাহীতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স হচ্ছে। এক মেয়ে এলো, তার মন খুব খারাপ। তখন সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ভর্তি হয়েছে এবং খুব ডিপ্রেশনে ভুগছে। কারণ হিসেবে বলল–সে 'মরা' সাবজেক্ট পেয়েছে আর তা হলো নৃ-বিজ্ঞান বা এনথ্রোপলজি। সবাই বলছে, এটা পড়ে কী হবে? আমি বললাম, এই মরাটাকে জীবন্ত করাই তো কোয়ান্টামের কাজ। ক্লাসে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করো।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী ছিল। সে মন দিয়ে পড়ালেখা করল এবং ক্লাসে প্রথম হলো। সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুযোগ পেল আমেরিকাতে একমাস বেড়িয়ে আসার। সেই মেয়ে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অতএব সাবজেক্ট মরা না জীবন্ত, তা নির্ভর করে আপনার ওপর। আপনি এটাকে মারতেও পারেন আবার জীবন্তও করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। তাহলেই আপনার মধ্যে টেনশন সৃষ্টি হবে এবং আপনি নার্ভাস হয়ে পড়বেন। তাড়াহুড়ো শব্দটাই ক্ষতিকর শব্দ, নেতিবাচক শব্দ। বরং যা করণীয়, তা ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। অটোসাজেশন দেবেন–আমি এই সময়ের মধ্যে অঙ্ক সম্পন্ন করব এবং ঠান্ডা মাথায় করব। আপনি আগেই মনে করছেন, আমার সময় বেশি লাগে। এই ভুল প্রোগ্রামিং থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এজন্যে প্রতিদিন মেডিটেশন করবেন এবং আত্মজাগরণ অডিও-র অটোসাজেশন ট্র্যাক টু নিয়মিত শুনবেন। রাতে এই ট্র্যাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বেন। নিয়মিত যখন মেডিটেশন ও অটোসাজেশন চর্চা করবেন, তখন আপনার নার্ভাসনেস দূর হবে এবং আপনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

আত্মবিশ্বাস হচ্ছে জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বিশ্বাস তখনই আসবে যখন প্রস্তুতিটা ভালো থাকবে। এজন্যে রুটিন করে পড়াশোনা করবেন এবং সময় নির্ধারণ করে অঙ্ক অনুশীলন করবেন।

প্রশ্ন : *কোয়ান্টামে কি গ্রহদশা হিলিং করা যায়? দয়া করে পরামর্শ দিবেন।*

উত্তর : গ্রহদশার প্রতিষেধকই হচ্ছে মেডিটেশন। আপনি যদি মেডিটেশন করেন, কোনো গ্রহ আপনাকে দশাগ্রস্ত করতে পারবে না। কারণ আপনার ভেতরের শক্তি বেড়ে যাবে। গ্রহদশা, অমুক দশা, তমুক দশা–এ থেকে মুক্ত হতে হলে পাথর ব্যবহার করতে হবে, এত দাম পড়বে, আপনার ভাগ্য ফিরে যাবে–এসব কথায় কখনো বিশ্বাস করবেন না।

অনেক বছর আগে আমি যখন এস্ট্রলজার ছিলাম, একজন আমার কাছে এসে বলল, এমন একটা পাথর দিন যেন আমি ছয় মাসে কোটিপতি হয়ে যেতে পারি। তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি কী দোষ করেছি? এরকম পাথর থাকলে তো আমি আগে পরতাম। আপনি পরামর্শ চাইতে এসে পাঁচশ টাকা দেবেন, এজন্যে বসে থাকতাম না।' অতএব এসব বিভ্রান্তির মধ্যে যাবেন না।

নিঃসন্দেহে এস্ট্রলজি বিজ্ঞান কিন্তু এই দশা-মশা বলে পাথর গছিয়ে দেয়াটা বিজ্ঞান নয়। আপনি নিয়মিত দুই বেলা মেডিটেশন করুন। এতে আপনার অন্তর্গত শক্তি, বিশ্বাসের শক্তি জাগ্রত হবে। নেতিবাচক যে-কোনো প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : *তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করার ফলে বর্তমানে স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন কারণে বনিবনা হচ্ছে না। নিজের ভুলের কারণে আমার পছন্দের মেয়েকে হারিয়েছি। সেই অনুশোচনায় দুই বছর পরও স্বাভাবিক হতে পারছি না। কী করব?*

উত্তর : আপনি ৩৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। অর্থাৎ আপনি পাঁচ বছর আগে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। এই পাঁচ বছর ধরে যদি আপনি মেডিটেশন করতেন এবং প্রজ্ঞা জালালি-তে নিয়মিত অংশ নিতেন, তাহলে আজকের এই অনুশোচনা করতে হতো না।

মনে রাখবেন, যা হারিয়ে গেছে, সেটা আপনার ছিল না। আপনি পছন্দ করতে পারেন কিন্তু আপনার হলে তো সে আপনারই থাকত। অতএব যা চলে গেছে, সে অন্যের। আপনি যাকে পেয়েছেন, তার সাথে বনিবনা করার চেষ্টা করুন।

আসলে বনিবনা হয় না আপনার নেতিবাচকতার কারণে। আপনি পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে বসে আছেন–আহারে! সে থাকলে কত না ভালো হতো! এসব অলীক চিন্তায় বর্তমানকে নষ্ট করবেন না। যাকে হারিয়েছেন, তার সাথে তো আপনি সংসার করেন নি। সে যে আপনাকে ধরে পেটাত না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। অতএব ঐ চিন্তা হারাম মনে করবেন। কারণ আপনি বিবাহিত।

এখন যে আছে তাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তার গুণগুলোর সমাদর করবেন। সে যাতে দোষগুলো শুধরে নিতে পারে, সেজন্যে দোয়া করবেন। যা হারিয়ে গেছে সেই চিন্তায় যদি এখনো অস্থির থাকেন, তাহলে আপনার মতো আহাম্মক দ্বিতীয়টা নেই।

মনে রাখবেন, বনিবনা কখনো হয় না, বনিবনা করে নিতে হয়। এটা মায়ের হাতের মোয়া নয় যে, মা বানিয়ে দিলেন আর আপনি খেয়ে ফেললেন। বনিবনা বা এডজাস্টমেন্টের জন্যে আপনাকে মাথা খাটাতে হবে, বুদ্ধি খরচ করতে হবে।

এক ধরনের পুরুষ আছে, যারা কর্তৃত্বপরায়ণ। তারা মনে করে, স্ত্রী সব কথায় হ্যাঁ বলবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সব কথায় হ্যাঁ বললে তো আর স্ত্রী হয় না। সব কথা মেনে নিলে বুঝতে হবে–সে স্ত্রী না, সে দাসী। কিছু কথায় আপনি হ্যাঁ বলবেন, কিছু কথায় স্ত্রী হ্যাঁ বলবেন। এটাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এই সম্পর্কে সম্মান থাকতে হবে, দায়িত্ববোধ থাকতে হবে, বিশ্বাস থাকতে হবে। এটাই এডজাস্টমেন্ট বা বনিবনা।

আর আপনার জন্যে বনিবনা করাটা অন্যদের চেয়ে সহজ। কারণ আপনি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং লামা কোয়ান্টায়নে অংশ নিন। মাথাটাকে ঠান্ডা করুন। ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেন।

প্রশ্ন : *আমি নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করি। আমার কর্মব্যস্ততা এতটাই বেড়েছে যে, সাদাকায়ন আলোকায়ন মিস হয়। লামায় অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট রিজুভিনেশনেও যেতে পারি নি। সামনে কি আবার এরকম প্রোগ্রাম লামায় হবে?*

উত্তর : হবে। কিন্তু দেখা যাবে ব্যস্ততার অজুহাতে আপনি যেতে পারছেন না। অথচ নিউইয়র্ক থেকে এক ভদ্রমহিলা দেশে এসেছিলেন শুধু এই প্রোগ্রামের জন্যে, তা-ও এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখেন পাসপোর্ট সাথে নেন নি। বাসায় ফিরে গেলেন, ফ্লাইট মিস। পরের দিন আবার টিকেট করে বাংলাদেশে এসেছেন। বিদেশে কিন্তু মহিলা-পুরুষ সবাইকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয় জীবনধারণের জন্যে। তারপরও তিনি কেন পেরেছেন? কারণ তার প্রায়োরিটি ঠিক করা ছিল।

অতএব অজুহাত দেখাবেন না। প্রত্যেকের জন্যে ২৪ ঘণ্টায় একদিন। এর বেশি নয়, কমও নয়। রাষ্ট্রপ্রধানের জন্যে যেমন, একজন সাধারণ শ্রমিকের জন্যেও তেমন। তাই আপনার জীবনে প্রায়োরিটি কী, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

যে কাজ বা বিষয়কে আপনি অগ্রাধিকার দেবেন, সেটার জন্যে আপনি সময় করতে পারবেন। ব্যস্ততা তো অবশ্যই থাকবে। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে কী করবেন এবং কেন করবেন। তাহলে আপনি নিজের ও অন্যের কল্যাণ করতে পারবেন।

হাজার কোটি টাকা উপার্জন করলেই কল্যাণ করা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থবিত্ত হারিয়ে যায় অপচয় ও ভোগবিলাসে। প্রকৃত কল্যাণের জন্যে অন্তরটা পরিশুদ্ধ হতে হবে। আর পরিশুদ্ধির জন্যেই প্রয়োজন মেডিটেশন ও সৎসঙ্গে একাত্ম থাকা। প্রতি সপ্তাহে সাদাকায়ন ও আলোকায়ন কার্যক্রম এই সুযোগটিই করে দেয়। তাই সাদাকায়ন, আলোকায়ন মিস করবেন না। জীবনের অগ্রাধিকার ঠিক করবেন এবং দৃঢ় হবেন। তাহলেই আপনি সময়টাকে কল্যাণের জন্যে কাজে লাগাতে পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আজ আমি এমন কিছু করব, যা আমাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ

টানা পাঁচ বছর ধরে প্রথম কোয়ান্টারা

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় কোয়ান্টারা

২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় টানা পঞ্চমবারের মতো প্রথম হলো কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত ৪৮টি স্কুল ও শিশু সংগঠন অংশ নেয় এ প্যারেড ও কুচকাওয়াজে। ২০১৫ সালে প্রথমবার ঢাকায় এসেই প্রথম হয়েছিল কোয়ান্টারা।

ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো এবছরও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৩৩ জন কোয়ান্টার সমন্বয়ে গঠিত চৌকস দলটির অসাধারণ প্যারেড-নৈপুণ্য বিস্ময়-অভিভূত করে মাঠে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সম্মানিত অতিথিবর্গ ও গ্যালারিতে উপবিষ্ট প্রায় দুসহস্রাধিক দর্শক ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের।

এবারের প্যারেড ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এবং সরকারি শিশু পরিবার, তেজগাঁও।

মার্চিং ব্যান্ড ॥ অনবদ্য পরিবেশনায় মুগ্ধ সবাই

এ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ মার্চিং ব্যান্ডদল। আকর্ষণীয় সাজপোশাকে সজ্জিত ১৬৮ জন কোয়ান্টাকে নিয়ে গঠিত এ ব্যান্ডদল পরিবেশন করে : *সূর্যোদয়ে তুমি/ সূর্যাস্তেও তুমি; পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে; মা গো ভাবনা কেন/ আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে; গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ; চল চল চল!/ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল; আমরা করব জয়; শোনো একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি/ আকাশে বাতাসে ওঠে রণি; জয় বাংলা বাংলার জয়* শীর্ষক দেশাত্মবোধক সংগীত।

উল্লেখ্য, আনসার ও ভিডিপি-র পেশাজীবী বাদক ও বিউগল দলের বাইরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের মার্চিং ব্যান্ডদলই ছিল একমাত্র দল যারা বেসরকারিভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঠিত ও পরিচালিত।

কোয়ান্টাদের এ সাফল্যের নেপথ্যে ছিল বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি ও কঠোর অনুশীলন। সেইসাথে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক দোয়া ও স্টেডিয়ামে তাদের সরব উপস্থিতি আরো ভালো করার অনুপ্রেরণা জোগায় কোয়ান্টাদের। আয়োজনের পুরোটা সময় কোয়ান্টাদের সক্রিয় সমর্থন দিয়ে গেছেন তারা।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে পরিচ্ছন্নতা করসেবা

অংশ নিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের ৮৭২ জন সদস্য

২৫ মার্চ ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা করসেবার আয়োজন করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এতে অংশ নেন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেল থেকে আগত ৮৭২ জন কোয়ান্টিয়ার।

ভোর ৬.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে পরিচ্ছন্নতা করসেবা। কোয়ান্টিয়াররা একেকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পরিষ্কার করেন স্টেডিয়ামের ১৭টি গ্যালারি (সাধারণ, ভিআইপি, আইসিসি এবং প্রেস গ্যালারি), অ্যাথলেটিক্স ট্রার্ফ এবং মাঠের পুরো অংশ। পরিষ্কার করা হয় ৩৪টি টয়লেট ও ১৭০টি প্রস্রাবখানা এবং তাতে ছিটিয়ে দেয়া হয় জীবাণুনাশক ওষুধ।

উল্লেখ্য, এবছর তৃতীয়বারের মতো কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এ পরিচ্ছন্নতা করসেবায়।

কোয়ান্টামমে নবনির্মিত জিমনেসিয়াম উদ্বোধনকালে মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

অলিম্পিকে সোনা জয়ের সামর্থ্য কোয়ান্টাদের আছে

নবনির্মিত জিমনেসিয়ামে কোয়ান্টাদের সাথে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

৩১ মার্চ ২০১৯ রবিবার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের নবনির্মিত আন্তর্জাতিক মানের জিমনেসিয়াম উদ্বোধন করেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি। তিনি বলেন, 'লেখাপড়া ও ক্রীড়া উভয় ক্ষেত্রেই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে। অলিম্পিকে সোনা জয়ের যে মনছবি তারা দেখছে, তা বাস্তবে রূপান্তরিত করার সামর্থ্য তাদের আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আহমেদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপিকা আমেনা বেগম।

২০১৩ সাল থেকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল জিমন্যাস্টিকস দল জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অর্জন করে আসছে। ২০১৮ থেকে তারা অংশ নিচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের কোনো জিমনেসিয়াম এতদিন কোয়ান্টামমে ছিল না। অনুশীলনের এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে ২০১৭ সালে শুরু হয় এই জিমনেসিয়াম নির্মাণের কাজ।

৪০ ফুট উঁচু ও ১২ হাজার ৮০০ বর্গফুটের এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে। অলিম্পিক গেমস-এর ছয়টি ইভেন্টে (ফ্লোর, পোমেল হর্স, রিংস, ভল্ট, প্যারালাল ও হরাইজন্টাল বার) প্রতিযোগিতা করার জন্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ নেয়ার অবকাঠামোগত ব্যবস্থা রয়েছে এই জিমনেসিয়ামে।

৪০ ফুট উঁচু ও ১২,৮০০ বর্গফুটের নবনির্মিত জিমনেসিয়াম

দেশকে ভালবাসুন, বৈশাখে ইলিশ বর্জন করুন

বারো মাসে তেরো পার্বনের এ বাংলায় সার্বজনীন এক উৎসব পহেলা বৈশাখ। নববর্ষের আয়োজনকে ঘিরে একসময় কিছু দুষ্কৃতকারী পান্তা-ইলিশের প্রচলন করে। ধীরে ধীরে ইলিশ হয়ে পড়ে দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য। সংস্কৃতির নামে এই অবিদ্যা সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করতে প্রথম পদক্ষেপ নেয় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা।

২০১৩ ॥ পান্তাপিয়ার প্রচলন

২০১৩ সালে কোয়ান্টাম বলতে শুরু করে–বৈশাখে আর ইলিশ নয়। এসময় মা ইলিশের ডিম ছাড়ার মৌসুম। তখন ইলিশ খাওয়ার পরিণাম হলো ভবিষ্যতের লাখ লাখ ইলিশ, বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ও পুষ্টি থেকে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করা। কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে, উৎসব হবে সার্বজনীন। কিন্তু বৈশাখে ইলিশ নিধনের ফলে দাম এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ইলিশের হালি হয়েছিল লাখ টাকা পর্যন্ত! যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। ইলিশ বাঁচাতে কোয়ান্টাম পরিবারের হাজারো সদস্য ২০১৩ থেকে পান্তাপিয়া (পান্তা ও তেলাপিয়া) সহযোগে বর্ষবরণ করছেন।

২০১৬ ॥ সচেতনতা সৃষ্টি হলো দেশব্যাপী

২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বৈশাখী মেন্যু থেকে ইলিশ বাদ দিলে সচেতন হয়ে ওঠে দেশের গণমাধ্যম। তাদের অনুসন্ধান ও প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে আসল সত্য। পহেলা বৈশাখের সাথে ইলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। ৮০'র দশকে একদল অসাধু ব্যবসায়ী বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ ইলিশ ধ্বংসের চক্রান্ত করে এবং নববর্ষে প্রচলন করে পান্তা-ইলিশের। অথচ হাজার বছর ধরে বাঙালি ঐতিহ্যগতভাবে বর্ষবরণ করে এসেছে পান্তাভাত, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, গুড় ও নানা ধরনের পিঠা দিয়ে।

এ ধারাবাহিকতায় বৈশাখে ইলিশ বর্জনে সচেতন হয়ে ওঠে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। ইলিশ বাদ পড়ে সরকারি মেন্যু থেকেও। সেইসাথে দেশের নৌবাহিনী ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মীও তাদের দায়িত্ব পালনে ছিলেন তৎপর। ইলিশ পাচার রোধে তারা নিয়েছেন বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইলিশ পেয়েছে নিরাপত্তা। ফলে ২০১৭ সাল থেকেই ইলিশ রপ্তানির পথ ধরে আসতে শুরু করে বৈদেশিক আয়। পাশাপাশি জাতীয় পুষ্টির চাহিদাও পূরণ হচ্ছে অনেকাংশে।

ইলিশের পুষ্টিগুণ ॥ উপকৃত হোক দেশবাসী

গবেষণা রিপোর্ট বলছে, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সারা পৃথিবীতে ইলিশ উৎপাদনকারী ১২টি দেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশ আকারে ও পরিমাণে বাড়ছে।

ওয়ার্ল্ড ফিশের ২০১৫ সালের একটি গবেষণা মতে, দক্ষিণ এশিয়ার ৩০টি জনপ্রিয় মাছের মধ্যে সবচেয়ে পুষ্টিকর মাছ ইলিশ। প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড থাকায় ইলিশ হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সাহায্য করে, রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে। থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। ইলিশের ভিটামিন 'এ' চোখের সুস্থতা রক্ষায় সাহায্য করে। রয়েছে ভিটামিন 'ডি' ও পর্যাপ্ত মিনারেল। শিশুস্বাস্থ্যের জন্যেও ইলিশ অনেক উপকারী। তাই দেশব্যাপী অব্যাহত রাখতে হবে বৈশাখে ইলিশ বর্জনের এই কল্যাণকর উদ্যোগ।

বেনিয়াদের ফাঁদ সম্পর্কে নিজে সচেতন হোন, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করুন

জীবনের প্রায় সকল অনুষঙ্গেই ব্যবসার রসদ খুঁজে নিচ্ছে বেনিয়াগোষ্ঠী। বাদ পড়ছে না সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলোও। এসব ফাঁদ সম্পর্কে সচেতন হোন। এবারের বর্ষবরণ হোক পান্তাপিয়া সহযোগে। বৈশাখে ইলিশ কেনা, পরিবেশন করা থেকে নিজে বিরত থাকুন, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করুন। ফাউন্ডেশন প্রকাশিত এনিমেশন *পান্তাপিয়া ২০১৯* ছড়িয়ে দিন পরিচিতদের মাঝে। দেশকে ভালবাসুন, পহেলা বৈশাখে ইলিশ বর্জন করুন।

'পান্তাপিয়া ২০১৯'

কোয়ান্টাম বুলেটিন : এপ্রিল ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

আসুন দাতা হই দিন শুরু হোক দানে

সঙ্ঘবদ্ধ দানে আলোকিত মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছে এ শিশুরা

ভালো কাজ, কল্যাণকর কাজ নিয়মিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, তাকেই নামাজী বলা হয়; যিনি মাঝেমধ্যে নামাজ পড়েন, তাকে নয়। তেমনিভাবে দাতা তিনিই, যিনি নিয়মিত দান করেন। মহান স্রষ্টার কাছে দাতা হিসেবে পরিচিত হতে চাইলে দান করাকে প্রাত্যহিক জীবনাচারে পরিণত করতে হবে।

আসলে ভালো কোনোকিছুকে জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে তুলতে পারলে তবেই তা থেকে পরিপূর্ণ বরকত আসে, সূচনা ঘটে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের।

তাই আমরা দিন শুরু করব মাটির ব্যাংকে দান করার মধ্য দিয়ে। দানকে করে নেব প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী। আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করব নিয়মিত দানে।

দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে ফাউন্ডেশন এ দানের অর্থ ব্যয় করে আসছে দুস্থ, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের বহুমুখী সেবায়।

বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিশুকানন, ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু হওয়া অনাথ ও এতিমদের নিয়ে নতুন শিশুকানন এবং অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের নিয়ে গঠিত শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে আলোকিত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠছে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী।

২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় ভর্তির সুযোগ পাওয়া কোয়ান্টাদের একাংশ

এর পাশাপাশি ২০১৫ সালে ঢাকার পরিচ্ছন্নতা-কর্মীদের (তেলেগু কানপুরী বংশোদ্ভূত) সন্তানদের স্কুল যাত্রাবাড়ীস্থ রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে ফাউন্ডেশন। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

শুধু তা-ই নয়, সম্মিলিত দানের অর্থে দেশের বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম। যার মধ্যে চিকিৎসাসেবা, মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র প্রসূতিকে চিকিৎসা পরামর্শ ও পুষ্টি সেবা, দাফন ও সৎকার, খতনা, ত্রাণ কার্যক্রম এবং গৃহনির্মাণ ও স্বনির্ভরায়ন অন্যতম।

আমরা বলতে পারি, স্রষ্টা যেহেতু সবচেয়ে বড় দাতা, তিনি আমাদের সবাইকে অফুরান রিজিক বা জীবনোপকরণ দিয়ে লালনপালন করছেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি একজন দাতাকেই পছন্দ করবেন। তাই স্রষ্টার পছন্দনীয় সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্যে আমাদের দাতা হওয়ার বিকল্প নেই।

আসুন দাতা হই। দিন শুরু হোক দানে। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমাদের সবার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক নিয়মিত দানের বরকত ও অফুরান কল্যাণে।

ভর্তি পরীক্ষা ২০১৮

বুয়েট, মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ২৭ জন কোয়ান্টা

☐ বুয়েটে প্রথমবারের মতো ভর্তি হয়েছে একজন কোয়ান্টা। চুয়েটে ভর্তি হয়েছে একজন।

☐ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাস্থান লাভ করেছে ১০ জন কোয়ান্টা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ১০ জন।

☐ সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে তিন জন কোয়ান্টা।

☐ রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে একজন।

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক

নিয়মিত দানের বরকত ও অফুরান কল্যাণে বাড়ছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দানের পরিমাণ ও দাতার সংখ্যা। ২০১৮ সালে সংগ্রহ হয়েছে ৩০ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার ৫৩ টাকা। এ দানের অর্থ ব্যয় করা হয় বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের সেবায়।

মেয়েশিশুদের লালনপালনে সঙ্ঘবদ্ধ দান

হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক

আল্লাহর সন্তুষ্টি আর সৃষ্টির কল্যাণকে সামনে রেখেই দুস্থ অবহেলিত সাতটি শিশুকে নিয়ে শুরু হয়েছিল কোয়ান্টাম শিশুকানন। এই শিশুদের সুষ্ঠু লালনপালনের জন্যে ছোট ছোট মাটির ব্যাংকে দান সংগ্রহ করতে শুরু করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। পরবর্তীতে সঙ্ঘবদ্ধ এ দানে শুরু হয় নানামুখী সেবামূলক কার্যক্রম।

প্রথমে আমরা বান্দরবানের লামায় ছেলেশিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করি। ২০০৪ সাল থেকে অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের জন্যে শিশুসদনের কার্যক্রম শুরু হয় রাজশাহীতে। তবে মেয়েশিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুসদন স্থানান্তর করা হয় কোয়ান্টামমে। সাধারণভাবে একটি বালক বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ের যে পার্থক্য, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষাপটে বালক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় সে রকম না। মানবিক দিক থেকে তার চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বের দাবিদার।

কন্যাশিশুদের প্রসঙ্গে সূরা তাকভির-এর ৭, ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছে–'যখন দেহে আবার আত্মা সংযুক্ত হবে, যখন জীবন্ত কবর দেয়া শিশুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?' এই আয়াতগুলোকে কেন্দ্র করে জাহেলিয়াতের যুগে নারী এবং কন্যাশিশুদের অবস্থা নিয়ে একদিন সাহাবীদের সাথে আলোচনা করছিলেন নবীজী (স)। তখন একজন সাহাবী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। নবীজী (স)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন–'জাহেলিয়াতের সময় আমার স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা, পারিবারিকভাবে আমাকে ডেকে সবাই সিদ্ধান্ত দিল, যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে কেউ জানার আগেই তাকে হত্যা করতে হবে। আমার স্ত্রী কিছুতেই রাজি হয় নি। পরে আমি ধাত্রী-মাতাকে ঘুষ দিয়েছি, কন্যাসন্তান হলে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু শিশুটি এত সুন্দর হয়েছিল যে, ধাত্রী তাকে আমার হাতে তুলে দিতে পারে নি। মায়ের কাছে সন্তানকে রেখে সে পালিয়ে যায়।

এরপর বহুবার উদ্যোগ নিয়েছি, মা তাকে আগলে রেখেছে। আমিও মায়ার বাঁধনে আটকে গেছি। একপর্যায়ে ভুলেই গিয়েছি, তাকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু একদিন বাজারে বন্ধুরা-সমবয়সীরা আমাকে নিয়ে খুব উপহাস করল। আমাকে পুরুষত্বহীন বলল কারণ মেয়েটাকে হত্যা করতে পারি নি।

এরপর একদিন মেয়েকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে, সাজিয়ে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। তার মা-ও ততদিনে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আর বুঝি মেয়েকে মেরে ফেলা হবে না। মেয়েকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। উঁচু পাহাড়ের ওপরে উঠছি আর কত কথা যে সে বলছে! মায়ায় আমার চোখ বেয়ে পানি আসছিল। আবার যখন বন্ধুদের কথা মনে হয় তখন ইচ্ছে করে মেয়েকে ফেলে দেই।

আস্তে আস্তে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। চতুর্দিকে দেখলাম। একদিকে গাল ভরা কথা বলছে আমার সন্তান। আরেকদিকে আমার ভেতরে পাশবিকতা। আমি মেয়েকে কোলে তোলার ভান করে সেই উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিলাম। সে শুধু একবার ইয়া আবী (বাবা) বলে চিৎকার দিল। সেই চিৎকারের আওয়াজ এখনো পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি এখনো শুনতে পাই–বাবা বলে তার সেই চিৎকার।'

জাহেলিয়াতের যুগে এরকম শত শত ঘটনা ঘটেছে। অথচ এই পাশবিকতায় আচ্ছন্ন মানুষগুলোই পরবর্তীতে কোরআনের আলোয় আলোকিত হয়েছে, বদলে গেছে। ইসলাম যে কত বড় কল্যাণ করেছে নারী জাতির, তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

আরেকজন সাহাবী একদিন নবীজীকে (স) বললেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ! জাহেলিয়াতের যুগ বলে আমাদেরকে গালি দেয়া হয়। আসলেই আমরা জাহেল ছিলাম, পশু ছিলাম। কিন্তু ভালো কাজও কিছু করেছি। আমি ৩৬০টি কন্যাশিশুকে জীবন্ত দাফন করার হাত থেকে রক্ষা করেছি। প্রত্যেকটি শিশুর জন্যে আমার সম্পদ থেকে দুটি করে উট দান করতে হয়েছে। আমি কি এর বিনিময়ে কিছু পাব?' নবীজী (স) উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছেন।'

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনও স্রষ্টার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দায়িত্ব নিয়েছে অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের। এদের নিয়ে গড়ে উঠল কোয়ান্টাম শিশুসদন। নির্মম হলেও সত্য–পরিত্যক্ত অবস্থায় যত শিশু পাওয়া যায়, এর প্রায় সবই মেয়েশিশু। তাহলে সেই জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আমরা কি এক পা-ও সামনে এগোতে পেরেছি? সমাজের সবাই কি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আনন্দিত হতে পারি? মনটা ছোট হয়ে যায় কিনা অনেকের? কেন এরকম হয়?

সেখান থেকে গুরুজী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে লালনপালন করার উদ্যোগ নিলেন। জীবনের ঝুঁকি বলছি, কারণ এ ধরনের দায়িত্ব তো কেউ নেয় না। আল্লাহ শুধু এ শিশুদের বাবা-মা বা ওই জাহেল পশুদেরকেই জিজ্ঞাসা করবেন না। ভদ্রবেশী আমরা যারা সমাজে বেঁচে আছি, আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করবেন–'তোমরা কন্যাশিশুদের রক্ষা করার জন্যে কী করেছ?' অবহেলিত এই শিশুদের অন্ধকার-অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে বাঁচানোর একটা সুযোগ কোয়ান্টাম আমাদের দিয়েছে।

তাই জীবন রক্ষার এই মিছিলে সাধ্যমতো সবকিছু উজাড় করে দেয়া আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এজন্যেই সাধারণ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে কোয়ান্টাম শিশুসদনের তুলনা করলে চলবে না। এটি আলোকিত জীবন নির্মাণের একটি সংগ্রাম, একটি অভিযাত্রা।

অবহেলিত মেয়েশিশুদের আবাসন, লেখাপড়াসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে লামায় বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ফাউন্ডেশন। এতে আমরা সাধ্যমতো অংশ নিতে চাই। অভিভাবকহীন এই শিশুরাসহ ভবিষ্যতে দেশের গোটা নারী সমাজ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে চাই। এই অনন্ত কল্যাণে শরিক হতে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দানের অর্থ জমা করতে চাই নিয়মিত।

[হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক, খতিব ও ইসলামী চিন্তাবিদ]

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্যারেডে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার লাভ করে মেয়ে কোয়ান্টারা। বর্তমানে কোয়ান্টাম শিশুসদনে বেড়ে উঠছে ৩২৬ জন কন্যাশিশু।

দানের ধর্মীয় গুরুত্ব

আল কোরআন

আল্লাহ-সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ নিয়মিত দান করে)।

সূরা বাকারা : ৩

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না।... **সূরা আলে ইমরান : ৯২**

আমার বিশ্বাসী বান্দাদের বলো (নির্ধারিত দিন আসার আগেই) নামাজ কায়েম করতে এবং আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে আমার পথে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে। নির্ধারিত দিন এলে তখন কোনো লেনদেনও হবে না বা বন্ধুত্বও কোনো কাজে লাগবে না। **সূরা ইব্রাহিম : ৩১**

যারা আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, তারাই সফল বিনিয়োগকারী। কারণ তিনি তাদের পূর্ণ কর্মফল প্রদানের সাথে সাথে নিজের অনুগ্রহভাণ্ডার থেকেও বহুগুণ পুরস্কার দেবেন।...

সূরা ফাতির : ২৯-৩০

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কৃপণতা করছ। যারা (আল্লাহর পথে) কার্পণ্য করে, তারা তো আসলে নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে।

সূরা মুহাম্মদ : ৩৮

আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, সময় থাকতেই তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে একথা বলতে না হয়, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি দান করে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হই।' কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না।... **সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১**

তুমি কি জানো ধর্মের দুর্গ কী? ধর্মের দুর্গ (নেক আমল বা সৎকর্মের সুউচ্চ স্তর) হচ্ছে (এক) দাসমুক্তি (অর্থাৎ একজন মানুষকে মনোজাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা), (দুই) দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, (তিন) নিকটবর্তী এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিন-অসহায়কে লালন এবং (চার) বিশ্বাসীদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বিশ্বজনীন মমতা ও সবরে (অর্থাৎ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মসংযমে) উদ্বুদ্ধ করা। এরাই সফলকাম।

সূরা বালাদ : ১২-১৮

বেদ

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। **ঋগ্‌বেদ : ৬.৭৫.৯**

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব।

ঋগ্‌বেদ : ১.১২৫.৬

এসো প্রভুর সেবক হই! গরিব ও অভাবীদের দান করি। **ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮**

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

স্থান কাল বিবেচনা করে কোনো প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত দান সাত্ত্বিক বা উত্তম দান। প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রদত্ত দানকে রাজসিক দান বলা হয়। অযোগ্য পাত্রে অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তা হচ্ছে তামসিক।

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ : ২০-২২

বুদ্ধবাণী

ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা, অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা, কৃপণতাকে দান দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করো।

ধম্মপদ : কোধবগ্‌গো : ২২৩

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। স্বার্থপরতার কালিমা তাকে বশীভূত করতে পারত না। তার মনের গভীরে নীচতার কালিমা প্রবেশ করতে পারত না। **ইতিবুত্তক : ২৬**

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে। **ইতিবুত্তক : ২৬**

বাইবেল

যখন দান করো গোপনে করো। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

মথি ৬:৩-৪

অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। **রোমীয় ১২:৯-১৩**

সৎ কাজ সম্পর্কে জানার পরও তা করা থেকে বিরত থাকা পাপ। **যাকোব ৪:১৭**

বিকাশ করুন দানের অর্থ

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে আপনার দানের অর্থ দেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে বিকাশ করা যাবে সহজেই। ফাউন্ডেশনের বিকাশ নম্বরটি হলো ০১৮৪৮-৩৬৬৬০১।

এছাড়া সদকা হিলিং ও যাকাত ফান্ডেও বিকাশের মাধ্যমে অনুদান জমা দেয়া যাবে। অনুদান পাঠানোর জন্যে যে-কোনো বিকাশ একাউন্ট থেকে পেমেন্ট অপশন সিলেক্ট করে মার্চেন্ট নম্বরে ফাউন্ডেশনের বিকাশ নম্বরটি লিখুন। এরপর অ্যামাউন্ট অপশনে টাকার পরিমাণ লিখুন, রেফারেন্স অপশনে অবশ্যই ডোনারের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর লিখতে হবে, কাউন্টার অপশনে ১ লিখে টাকা পাঠিয়ে দিন।

প্রত্যেক ধর্মেই দান করতে বলা হয়েছে

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল মালিক

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে সৎকর্ম ও দান করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, বিত্তবান কিংবা বিত্তহীন সকলেই যাতে সামর্থ্য অনুসারে দান করে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষকে এ কাজে সুন্দরভাবে উদ্বুদ্ধ করছে।

আমি বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি বঞ্চিত পরিবারের শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশের মধ্য দিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, তারা শুধু এদেশ নয় বরং সারা বিশ্বের মানুষকেই একদিন আলোকিত করবে।

কোয়ান্টাম সারাদেশে যে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাতে বহু লোকের কল্যাণ হবে। যা করা হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যে নয়, পুরোপুরিই এর সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের শ্রম, পরামর্শ ও দানের ভিত্তিতে।

[জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব) ডা. আব্দুল মালিক। বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা]

নিয়মিত দান আপনাকে স্রষ্টার করুণাধন্য করবে

আল্লামা এম শমশের আলী

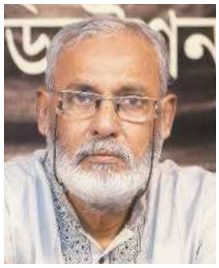

দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ। সব ধর্মেই দানের কথা বলা হয়েছে। স্রষ্টা দাতাকে পছন্দ করেন। তাই যুগে যুগে মহামানবরা নিজে দান করেছেন, অন্যকে উৎসাহিত করেছেন।

তবে কোথায় দান করছেন তা ভাবতে হবে আপনাকেই। কারণ দান করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে ভালো কাজ করলে দাতার জন্যে তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয় আর গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে মন্দ কাজ করলে পাপের ভাগীদার হওয়া থেকেও দাতা রক্ষা পায় না।

এদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান দান সংগ্রহ করে ভালো কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের অন্যতম। এখানে যদি নিয়মিতভাবে দান করেন, তা স্রষ্টার কাছে অনেক অর্থবহ হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই সামর্থ্যমতো নিয়মিত দান করুন। শেষ বিচারের দিনে করুণাময়ের করুণায় আপনি ধন্য হবেন।

[আল্লামা ড. এম শমশের আলী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পরমাণু বিজ্ঞানী, লেখক, টিভি ব্যক্তিত্ব ও ধর্মতাত্ত্বিক]

দান সম্পর্কে ?

প্রশ্ন : দান করলে দাতার কী উপকার হবে?

উত্তর : আমাদের একটা বক্তব্য হচ্ছে, নিজের কল্যাণে ও অন্যের কল্যাণে দান করুন। প্রথমেই নিজের কল্যাণে দান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন, '...(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭২)।

অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বলছেন যে, দান করলে প্রথম কল্যাণ হয় দাতার।

আল্লাহ সূরা বাকারা-র ২৬১ নম্বর আয়াতে উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'যারা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের এই সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিষ আর প্রতিটি শিষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।...' অর্থাৎ আল্লাহ দাতাকে এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন।

কোরআনে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নিয়মিত দান করার মধ্য দিয়ে আমরা ধনী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। ভয় দুঃখকষ্ট ও টেনশন থেকে মুক্ত, বিপদমুক্ত, সমস্যামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত এবং সমস্ত অনিশ্চয়তামুক্ত সচ্ছল জীবন পাচ্ছি।

দানের নগদ বিনিময় হচ্ছে, টেনশন ও পেরেশানি দূর হয়ে যাবে যেটা এ যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। নবীজী (স) বলেছেন, দান ৭০টিরও বেশি বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। অর্থাৎ সমস্যামুক্ত সুস্থ সফল জীবন যাপনের জন্যে নিয়মিত দান অনেক বড় ভূমিকা পালন করে।

দানের বিনিময়ে দাতা যেহেতু পার্থিব জীবনেই এত কল্যাণ লাভ করছেন, তাহলে পরকালে কি দাতা কোনো পুরস্কার পাবেন না? দাতার জন্যে পরকালের কল্যাণ তো স্রষ্টা নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন।

প্রশ্ন : দান করবে ধনীরা। আমি তো এখনো দান করার মতো ধনী হই নি।

উত্তর : দান শুধু ধনীদের জন্যে নয়। বরং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ধনী-গরিব সবার জন্যেই। সূরা আলে ইমরান-এর ১৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন, 'নিশ্চয়ই যারা (এক) সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, (দুই) রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, (তিন) মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।' অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থায় যেমন দান করতে হবে, তেমনি অসচ্ছল অবস্থাতেও দান করতে হবে। এটাই শাশ্বত ধর্মের শিক্ষা।

প্রশ্ন : আমার টাকা যদি আমি দান না করি তাহলে সমস্যা কী?

উত্তর : আমরা মনে করি, আমার সম্পদের মালিক আমি। দান না করলে কার কী? এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদিদের ১০ নম্বর আয়াতে বলেন, 'মহাবিশ্বের সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তা জানার পরও (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে ব্যয় করো না কেন?' এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আমার সম্পদের মালিক আমি নই বরং সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তাই দানের ব্যাপারে গড়িমসি করা ঠিক নয়।

অনেকে গরিব হয়ে যাওয়ার ভয়ে দান করতে চায় না। কেউ কেউ আবার দানের ব্যাপারে অন্যদের নিরুৎসাহিত করে। তাদের সম্পর্কে সূরা নিসা-র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যারা নিজেরা কৃপণ এবং অন্যকে কৃপণতা করতে উৎসাহিত করে (বা দানে নিরুৎসাহিত করে) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ গোপন করে, আল্লাহ তাদেরও অপছন্দ করেন। এ ধরনের অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমি অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

প্রশ্ন : ভিক্ষুককে দান করলে তা কেন আল্লাহর কাছে দান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না?

উত্তর : আমরা যাদের ভিক্ষুক মনে করি তারা আসলে পেশাদার ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি এখন একটা ব্যবসা। এমন কোনো নজির দেখাতে পারবেন না যে, কোনো ভিক্ষুক ধনী হওয়ার পর ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ভিক্ষুককে দান করলে তাতে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক কিছু করা হলো না।

অথচ আমরা দানের টাকায় প্রথম যে কয়টি শিশুর লালনপালন শুরু করেছিলাম, তাদেরই একজন এখন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার। বুয়েট, মেডিকেল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে আরো ৫৯ জন শিক্ষার্থী। এরকম হাজারো শিশু আপনাদের মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থে বেড়ে উঠছে স্বাবলম্বী ও আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে। ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সৎদানের এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

প্রশ্ন : আমরা দান কোথায় করব? সঙ্ঘবদ্ধভাবেই কেন দান করতে হবে? আমি তো যে-কোনো জায়গায় দান করতে পারি যদি আমার নিয়ত ঠিক থাকে, তাই নয় কি?

উত্তর : সূরা বাকারা-র ২১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'হে নবী, তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, আমরা অন্যের জন্যে কী প্রক্রিয়ায় ব্যয় করব? তুমি বলো, তোমাদের অর্থসম্পত্তি প্রথমত মা-বাবা, তারপর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করবে'।... দান এবং যাকাত উভয়ের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। নবীজী (স)-এর নির্দেশ হলো, কাউকে ভিক্ষা দিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রহীতা বানাবে না।

আর একই লক্ষ্যে কাজ করছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম। এই দান অসহায় জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্যে। অতএব সঙ্ঘবদ্ধভাবে দান করে আমরা এতিম ও মিসকিনের হক আদায় করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, দানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা দরিদ্রের হাতে পৌঁছাচ্ছে কিনা। বর্তমানে মাজারে কিংবা ভিক্ষুককে দান করলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। এখন এটা একটা পেশা। তাই নিশ্চিত হয়ে দান করার খাত হিসেবে বলা যায়, বাবা-মা, গরিব আত্মীয়স্বজন এবং তারপর এতিম-মিসকিনের জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থ অমুসলিমদের জন্যেও ব্যয় করা হয়। সুতরাং, একজন মুসলিম কি এখানে দান করতে পারে?

উত্তর : মুসলমান-অমুসলমান তো পরের কথা, খলিফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, 'ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বিড়ালও না খেয়ে মারা যায়, আমি ওমরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।' তখন খেলাফতের অধীনে অনেক অমুসলিম বাস করত। রাষ্ট্র তাদেরকে বঞ্চিত করে নি, তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাহলে আমরা কীভাবে তাদের বঞ্চিত করব?

তাছাড়া বিদেশি সাহায্য বা রিলিফ যখন আসে, আপনি কি ভেবে দেখেন, এই সাহায্যটা আমাকে মুসলমান দিয়েছে, নাকি হিন্দু বা খ্রিষ্টান দিয়েছে? গ্রহণ করার সময় জিজ্ঞেস করছেন না। তাহলে দান করার সময় কেন জিজ্ঞেস করবেন?

অসুস্থ হলে আপনি ভালো ও দক্ষ ডাক্তারের কাছে যান, নাকি ডাক্তার মুসলমান হিন্দু না খ্রিষ্টান– এটা বিচার করেন? মামলায় পড়লে আইনজীবীর ধর্ম বিচার করেন, নাকি তার যোগ্যতা বিচার করেন? একইভাবে দান পাওয়ার জন্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিতকেই দান করতে হবে। তার ধর্মাধর্ম বিচার করা অমানবিক।

ধরুন, সড়ক দুর্ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হলো। অমুসলমানদের রেখে শুধু মুসলমানদের আপনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? আপনার বিবেক কি তাতে সায় দেবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনি বিপন্ন মানুষের ধর্ম জিজ্ঞেস করবেন, নাকি তাকে উদ্ধার করবেন? উদ্ধার করাটাই তো মানবিকতা। এটাই আল্লাহর রসুলের নির্দেশ।

রসুলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা রাহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তথা সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ। তিনি সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি অভুক্ত প্রতিবেশীর কথা বলেছেন, অভুক্তের ধর্ম বিচার করতে বলেন নি। অতএব তাঁর অনুসারী হিসেবে আমাদেরও সকল দুর্গত মানুষের জন্যে কাজ করা উচিত। সেটাই হবে নবীজী (স)-এর প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ।

প্রশ্ন : দান কি আমার ইচ্ছেমতো করব? নাকি এ ব্যাপারে স্রষ্টার কোনো নীতিমালা আছে?

উত্তর : এ ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে (আয়াত নম্বর ৯২) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। '(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। অন্যের জন্যে তুমি যা-কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।'

অর্থাৎ ছেঁড়া পরিত্যক্ত পোশাক দান করলে কিংবা পকেটে এক হাজার টাকা রেখে পাঁচ টাকা দান করলে তা স্রষ্টার পছন্দনীয় হবে না। আর দান করতে হবে নিয়মিত। আমরা যারা ব্যবসায়ী/ চাকরিজীবী তারা উপার্জনের জন্যে প্রতিদিন পরিশ্রম করি। আল্লাহ প্রতিদিন আমাদের রিজিক দেন। তাহলে, দান কেন প্রতিদিন হবে না? তাই আপনার যা আছে তা থেকে নিয়মিত দান করুন। অস্থিরতা ও বালা-মুসিবত থাকবে না। আসবে সাফল্য প্রাচুর্য প্রশান্তি।

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারে একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও দুজন প্রো-মাস্টার। দুই বাচ্চা আছে। সবার আলাদা মাটির ব্যাংক আছে। একজনের আয় থেকেই ব্যয় করা হয়। তাহলে কি প্রত্যেকের আলাদা মাটির ব্যাংক প্রয়োজন আছে?

উত্তর : এটি অত্যন্ত ভালো একটা অভ্যাস। নিয়মিত দান করাটা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে সবাইকে সহযোগিতা করা উচিত। আমরা যদি পরিবারের সবাইকে আনন্দের সাথে মাটির ব্যাংক দেই, এতে একটা সৎ অভ্যাস গড়ে উঠবে। অতএব পরিবারে যত সদস্য আছে, সবাইকে আপনি আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংক দিতে পারেন।

আপনার যত প্রশ্ন

প্রশ্ন : *মাটির ব্যাংকে দান শিরক কিংবা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী কিনা?*

উত্তর : আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে তা হয় শিরক। এটা যতটা না প্রায়োগিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক বা বিশ্বাসের। যেমন, বলা হয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কিন্তু মা-বাবার কাছে আমরা কি চাই না? বলি না যে, পাঁচটা টাকা দাও; বাবা, অমুক জিনিসটা এনে দাও। বলি। কারণ এটাই দৈনন্দিন কথোপকথন। কাজেই সবকিছুতে শিরক খোঁজার মানসিক জটিলতায় যারা আক্রান্ত তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এরা নিজেরা সৎকর্ম করছে না, করতে সাহায্য করছে না এবং আরেকজন করুন এটাও চাচ্ছে না।

আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করছি। দানের টাকা মাটির ব্যাংকে জমিয়ে একত্রে কিছুদিন পর ফাউন্ডেশনে জমা দিচ্ছি। ফাউন্ডেশন প্রতিটি জমার বিপরীতে মানি রিসিট দিয়ে টাকা রাখছে এবং তা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করছে। এর মধ্যে আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরিক করার কোনো সুযোগ নেই।

তাই মাটির ব্যাংকে দান শিরক তো নয়-ই, বরং উত্তম ইবাদত। সূরা বাকারা-র ২৭৪ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।'

আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব– দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় আপনার দান জমা করার জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের চেয়ে ভালো মাধ্যম আর নেই। কারণ মাটির ব্যাংক দিনে-রাতে সবসময় আপনার হাতের কাছেই থাকছে। আর সৎ নিয়তে সঞ্চবদ্ধ দানের বরকত ও প্রতিদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন : *দান নিঃশর্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ পাওয়ার আশায় নয়। অথচ আমরা প্রতিনিয়তই বালা-মুসিবত দূরের জন্যে বা এটা-ওটা পাওয়ার নিয়তে মাটির ব্যাংকে দান জমা করি। সেটা কি নিঃশর্ত?*

উত্তর : দান অবশ্যই নিঃশর্ত হওয়া উচিত এবং দান করে প্রতিদানের আশা করা উচিত নয়। কিন্তু কার কাছে প্রতিদানের আশা করা যাবে না সেটা জানা জরুরি। এই প্রতিদানের আশা করা যাবে না তার কাছ থেকে যাকে দান বা সাহায্য করা হয়েছে। এমনকি দান করে বা সাহায্য করে যদি খোঁটা দেয়া হয় বা কথা শোনানো হয়, তাহলেও তা সমস্ত সৎকর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

মাটির ব্যাংকের ক্ষেত্রেও আমরা যাকে সাহায্য করি তার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করি না। এমনকি যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংকের দানসমূহ সঞ্চবদ্ধ হচ্ছে, সে ফাউন্ডেশনের কাছেও কোনোকিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা হলে সে দান নিঃশর্ত হবে না।

দান করে আমরা আসলে যার কাছে প্রতিদান প্রার্থনা করি তিনি মহান স্রষ্টা। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো। আমি কবুল করব।' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাওয়ায় কোনো বাধা নেই বরং এটাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে তিনিই হলেন দেয়ার মালিক। কারণ তাঁর সব আছে। কাজেই অভাবের কথা, নিরাময়ের কথা, সমস্যামুক্তির কথা তো তাঁকেই বলতে হবে। অতএব মাটির ব্যাংকে দান জমা করে আমরা প্রার্থনা করছি স্রষ্টার কাছে। এখানে নিঃশর্ত দানের কোনো শর্ত লঙ্ঘন হচ্ছে না। আর দানের প্রতিদান একমাত্র স্রষ্টাই দেবেন।

প্রশ্ন : *যারা ছাত্র, যাদের আয়ের কোনো উৎস নেই, তারা কীভাবে দান করবে?*

উত্তর : যদি আর্থিক দান হয় তাহলে হাতখরচের টাকা থেকে দান করতে হবে। সে যদি দান করে তাহলে এটা তার জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর হবে। কারণ, নবীজী (স) বলেছেন, 'একটা খেজুর যদি থাকে তাহলে খেজুরের একটা অংশ হলেও দান করো।' এমন কোনো ছাত্র নেই যার হাতখরচ নেই, যে খরচ করে না। প্রত্যেকে খরচ করছে, নিজের আয় না থাকলেও খরচ করছে। অতএব, সেখান থেকে দান করতে হবে।

দুই নম্বর হচ্ছে, দান বলতে শুধু অর্থ দান বোঝায় না। একটু শুভ কামনা, একটু সুন্দর ব্যবহার, একটা সুপরামর্শ, পথিককে আন্তরিক সাহায্য কিংবা পথ থেকে কলার খোসা সরিয়ে ফেলা–এ সবই হতে পারে দান।

প্রশ্ন : *কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের টাকা অন্য কোথাও দান করা যাবে কিনা।*

উত্তর : মাটির ব্যাংকটা তো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এবং আপনি এখানে দেয়ার নিয়তেই টাকা রাখছেন। তাহলে অন্য কোথাও এটা কীভাবে দেয়া যাবে? অন্য কোথাও দেয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে–কিন্তু মাটির ব্যাংকে রাখার পর এ টাকার হকদার ফাউন্ডেশন। সবসময় মনে রাখবেন, স্ত্রীর জন্যে যে টাকা রাখবেন, সেটা স্ত্রীর জন্যেই। এটাতে অন্য কাউকে ভাগ দেবেন না। সেটা যত ভালোর জন্যেই হোক না কেন। ফাউন্ডেশনের জন্যে দানও তেমনি।

আর মাটির ব্যাংকের টাকা ফাউন্ডেশনে দেয়ার চেয়ে ভালো জায়গা আপনি কোথাও পাবেন না। এ টাকা মানুষকে আলোকিত করার জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে পরিকল্পিত ও সঞ্চবদ্ধভাবে ব্যয় করা হয়। যেহেতু এটি যৌথ কাজ, যত টাকা জড়ো হচ্ছে সমস্ত টাকার সওয়াব আমরা সবাই পাচ্ছি। বছরে যদি পাঁচ কোটি বা ১০ কোটি টাকা আসে, সেই ৫/১০ কোটি টাকা দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করছি, তা সদকায়ে জারিয়া। যার ফলে এই দানের পূর্ণ সওয়াব মৃত্যুর পরও আপনি পেতে থাকবেন। তাই মাটির ব্যাংকে নিজে দান জমা করবেন এবং বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়মিত দান করতে উৎসাহিত করবেন।

প্রশ্ন : *যখন কোনোকিছুর মানত করে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন যদি মনে মনে বলি, এই মাটির ব্যাংকের কারণে আমার মানত পূরণ হবে। তাহলে কি গুনাহ হবে না? কারণ মানত পূরণের শক্তি কেবল আল্লাহর হাতে।*

উত্তর : প্রার্থনাটা খুব সহজ। হে আল্লাহ! তোমার অবহেলিত বঞ্চিত বান্দাদের কল্যাণে এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্যে দান করছি, তুমি আমার মঙ্গল করো, আমার উপকার করো। কারণ তুমি সমস্ত দানের প্রতিদান দেবে–এই ওয়াদা তুমি করেছ।

আর এত কিছু বলারও দরকার নেই। আল্লাহ সব দেখছেন এবং সব শুনছেন। আল্লাহ! তুমি আমার সব সমস্যা দূর করে দাও–এটা সংক্ষেপে ভাবলেই চলবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যা চিন্তা করছেন এটা আপনার প্রভুও একইভাবে বুঝতে পারছেন। তাকে অত ভেঙে বলার কোনো দরকার নেই।

প্রশ্ন : *আমি নিজে মাটির ব্যাংকে দান করি। কিন্তু এর কথা অন্যদের কাছে বলার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা-সংকোচ রয়েছে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?*

উত্তর : মাটির ব্যাংকে দানের টাকা রাখার ব্যাপারে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে দ্বিধা-সংকোচ থাকার কোনো যুক্তি নেই। কারণ এর মাধ্যমে আপনি একদিকে ধর্মের নির্দেশ পালন করছেন, অন্যদিকে তার উপকার করছেন। সূরা ফজরের ১৬-২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–'প্রতিপালক যখন পরীক্ষা করার জন্যে কারো রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসম্মান করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, না, একথা সত্য নয়। আসলে (এটা তোমাদের কর্মফল) তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না, অভাবী অসহায়কে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না... ধনসম্পত্তির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।'

অর্থাৎ শুধু নিজে দান করা নয়, এই দানে অন্যদেরকেও উৎসাহিত না করলে আপনার রিজিক সংকুচিত হবে, আপনি অভাবগ্রস্ত হবেন। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।' অর্থাৎ গরিব ও অভাবীকে দান করা ঈশ্বরের সেবা করা।

আপনি আপনার কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্যে মাটির ব্যাংকের কথা অন্যকে বলছেন না; বরং এর মাধ্যমে আপনি তারই উপকার করতে চান। সেটা কীভাবে–প্রথমত, আপনি তাকে সঠিকভাবে দান করার সুযোগ করে দিচ্ছেন ও তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনয়নে সাহায্য করছেন। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে আপনি তার কাছে জীবনযাপনের বিজ্ঞানের বাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

আর এভাবে তার দৈহিক মানসিক পারিবারিক ও আত্মিক সমৃদ্ধিতেও আপনি ভূমিকা রাখছেন। যেমন, আপনি প্রথম কাউকে একটি মাটির ব্যাংক দিলেন এবং তাকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। পরের বার তার সঙ্গে দেখা হলে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিন, তার সমস্যার কথা শুনুন এবং জীবনযাপনের বিজ্ঞানের আলোকে তাকে পরামর্শ দিন এবং তা অবশ্যই আন্তরিকতা, মমতা ও সহানুভূতির সাথে। মূলত মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি তাকে সৎকাজে সম্পৃক্ত করছেন, আলোকিত করছেন।

কাজেই মাটির ব্যাংকের ব্যাপারে সমস্ত লজ্জা, সংকোচ ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারণ মানুষকে বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত ও আলোকিত করার মতো পুণ্যময় কাজটিই আপনি করছেন।

অটোসাজেশন

আমি জানি, দাতার কখনো
অভাব হয় না। দাতার
জীবনেই আসে স্থায়ী সুখ।
আমি দাতা হবো।

সৃষ্টির সেবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান জমা করুন মাটির ব্যাংকে

আপনার কল্যাণ হোক ॥ কল্যাণ করুন মানুষের

মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় হাইওয়ের মাঝখানে আমার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায়। তিন বার ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যায়। সাধারণত এমন দুর্ঘটনায় পেছনের গাড়ি এসে চাপা দেয়। অথচ, আমি সম্পূর্ণ অক্ষত এবং গাড়িরও তেমন কিছু হয় নি। আমার বিশ্বাস, মাটির ব্যাংকে দানের ফলেই স্রষ্টা অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

মো. ইয়াছিন আহমদ চৌধুরী • *ব্যবসায়ী। ১০৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

কোর্স করার পরে মনছবি করলাম ৩.৫ সিজিপিএ অর্জন করব। প্রতিটি পরীক্ষার আগে মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে পরীক্ষার হলে যেতাম। এছাড়াও সেমিস্টার ফাইনালের জন্যে আলাদা করে দান করতাম। প্রত্যাশার চেয়েও আমার রেজাল্ট ভালো হলো। ৩.৫৫ সিজিপিএ নিয়ে বিবিএ পাশ করলাম।

মো. সাঈদুজ্জামান • *শিক্ষার্থী। ৩২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার মেয়ে হঠাৎ অ্যাপেনডিসাইটিসের তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হলো তার এসএসসি পরীক্ষার আগে। ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন। মাটির ব্যাংকে মানত করলাম। হিলিংয়ে নাম দেয়া হলো। হাসপাতালে ভর্তি করানোর চার দিন পর অপারেশন ছাড়াই সে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরল এবং সবগুলো পরীক্ষাই দিল। স্রষ্টার অসীম কৃপায় এসএসসি-তে সে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে।

অপর্ণা রায় • *গৃহিণী। ২৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের অনেকেই বিভিন্ন শারীরিক মানসিক জটিলতায় ভুগছেন। চিকিৎসার পেছনে খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কোর্স করার পর থেকে আমি প্রতিদিন দান করি। এর বদৌলতে স্রষ্টা আমার পরিবারের সবাইকে সুস্থ রেখেছেন। এমনকি ৭৩ বছর বয়সেও আমার বাবা টেনশনমুক্ত, রোগমুক্ত। পারিবারিক প্রশান্তিও আগের চেয়ে বেড়েছে।

এন্থনী চয়ন অধিকারী • *এক্সিকিউটিভ, স্কয়ার ইনফরমেটিক্স লি.। ৩২৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

অনার্সের সার্টিফিকেটে নামের বানান ভুল এলো। রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানাল এফিডেভিট করতে হবে। নিয়ত করলাম এফিডেভিট প্রয়োজন না হলে সেই টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কাজটি খুব সহজে হয়ে গেল।

জোহরা আক্তার সেবি • *শিক্ষার্থী। ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

এক ভদ্রমহিলার ছেলে ১০-১২ দিন ধরে নিখোঁজ শুনে তাকে নিয়ত করে দানের পরামর্শ দিলাম। মাটির ব্যাংক নেয়ার ৫-৭ মিনিট পর তিনি হাসিমুখে জানালেন, তার ছেলে এইমাত্র ফোন করে জানিয়েছে, সে ভালো আছে। সৎদানের এত দ্রুত কার্যকারিতা দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম।

নাজমুন নাহার • *গৃহিণী। ৩৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

চার তলা বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে পাইলিংয়ের সকল প্রস্তুতি শেষ করলাম। কিন্তু টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। সাথে সাথে মাটির ব্যাংকে দান করলাম। একটু পরে ফোরম্যান জানাল, একটি বড় গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। তা দিয়ে কাজ শুরু হলো। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি খরচ হতো, রাতে বৃষ্টিতে তা পূর্ণ হয়ে যেত। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ দিন আগেই কাজ সম্পন্ন হলো।

মো. আইয়ুব আলী • *ঠিকাদার। ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

গত বছর দুই সন্তানের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। ছেলেটা ভাইভা-তে কোনো কথাই বলল না। মেয়েকে নিয়েও দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তার ওপর লটারি সিস্টেম। দুই সন্তানের সাফল্যের নিয়তে ১০ হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে দান করলাম। লটারিতে সবার আগে আমার ছেলের নাম উঠল। মেয়েও মনোনীত হলো। খবর শুনে আমার ভাগ্নি আমার দুই সন্তানকে ১০ হাজার টাকা উপহার দিল। অর্থাৎ যে টাকা দান করেছিলাম তার পুরোটাই আল্লাহ ফেরত দিলেন।

দেলোয়ার মো. নুরুল করিম • *ব্যবসায়ী। ২৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

দেশের যে-কোনো প্রান্তে কোনো অসহায় অনাথ এতিম শিশুর সন্ধান পেলে এবং শিশুটির অভিভাবকত্ব কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :

০১৮৪৮-৩১৮৫০৫-৬, ০১৮৪৮-৩১৮৬১৩

সংযোগায়ন সেল, কোয়ান্টাম শিশুকানন, কোয়ান্টামম, লামা, বান্দরবান

আমার মা দুবছর ধরে রক্তস্বল্পতায় ভুগছিলেন। অনেক পরীক্ষা করেও রক্তস্বল্পতার কারণ ধরা পড়ল না। কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হিলিংয়ে নাম দিলাম ও মাটির ব্যাংকে দান করলাম। স্রষ্টার রহমতে এবার কারণ জানা গেল– পাকস্থলীতে ছোট ছিদ্র ও ডায়াবেটিস। চিকিৎসার পর এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে। তাকে আর রক্ত নিতে হয় না।

মো. রাজু আহমদ • *খণ্ডকালীন প্রভাষক, খুলনা পাবলিক কলেজ। ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার ছেলে স্কুলে যেতে ভয় পেত। তার মনোযোগ বৃদ্ধি ও স্কুলভীতি দূর হওয়ার নিয়তে মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতাম। ক্লাস ফাইভে নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে সে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিল। ধীরে ধীরে দানের পরিমাণও বাড়িয়ে দিলাম। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার আগে আমার এক মাসের পুরো বেতন মাটির ব্যাংকে দান করলাম। জিপিএ ফাইভ পেয়ে সে উত্তীর্ণ হলো।

আয়শা জুবায়রা আফরোজ • *সিনিয়র ম্যানেজার, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি.। ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

দুজন ছিনতাইকারী একদিন আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ব্যাগে আইপ্যাড ছিল। প্রাণে তো বেঁচে গেছি! এই শুকরিয়া আদায় করে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। ছয় মাস পরে ছিনতাইকারী নিজে ফোন করে বলল, আইপ্যাডটি ফেরত দিতে চায়। তার সহকারী মারা যাওয়ার পর সে ভুল বুঝতে পেরেছে! তাই সে এখন জিনিস ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ডা. সাহিয়া শারমীন • *১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া ১০টি চেক হারিয়ে ফেললাম। অনেক খুঁজেও পেলাম না। ফটোকপিও ছিল না। খোঁজ নিয়ে জানলাম টাকা পাব। তবে বছর দুয়েক লাগবে। তখন মানত করলাম, চেকগুলো ফেরত পেলে বড় অঙ্কের টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। কাগজপত্র জমা দিলাম। এর কিছুদিন পর চেক থেকে যা পেতাম তার চেয়েও বেশি অর্থ একটি কেস থেকে পেয়ে গেলাম। যা আমার ওকালতি জীবনের সর্বোচ্চ উপার্জন। সেখান থেকেই মানতের টাকা দান করলাম। আল্লাহর রহমতে সেদিনই চেকগুলো ফেরত পাওয়ার সংবাদ পেলাম।

মো. গোলাম রব্বানী • *এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট। ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার ভাশুরের মেয়ে জন্মের ছয় ঘণ্টার মাথায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলো। লাইফ সাপোর্টে ছিল তিন দিন। বাচ্চাটির সুস্থতার নিয়তে প্রতিদিন দান চালিয়ে গেলাম। ২২ দিন হাসপাতালে থাকার পরে স্রষ্টার রহমতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। আমার বিশ্বাস দানের ফলেই এই বিপদ কেটে গেল।

রুকসানা করিম মুক্তি • *নাট্যকর্মী, ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর পড়াশোনা করছে। সে ফোন করে জানাল পরীক্ষা ও কোচিংয়ের ফি মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার লাগবে। এত টাকা কোথায় পাব! ওকে ধৈর্য ধরতে বললাম। আর মাটির ব্যাংকে সাধ্যমতো দান করলাম। দুদিন পর ছেলে ফোন করে বলল কোচিং থেকে তাকে বৃত্তি দিয়েছে। কোনো টাকা লাগবে না।

জামিলা আক্তার লিলি • *গৃহিণী। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইএলটি কোর্সে ভর্তি হতে পারছিলাম না। নিয়মিত দান করতে লাগলাম। স্রষ্টার রহমতে শেষ মুহূর্তে মনোনীত হলাম। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্টাডি লিভের অনুমতি আটকে গেল। কোর্স চলাকালে যে বেতন পাব, তা থেকে মাটির ব্যাংকে অগ্রিম দান করলাম। কিছুদিন পরই বেতনসহ স্টাডি লিভের অনুমতি পেয়ে গেলাম।

দিলারা আক্তার • *সহকারী শিক্ষক, বিপিন রায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

আমার মেয়ে তিন বছর ধরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই কর্তৃপক্ষ তাকে ক্লাস দেয়া বন্ধ করে দেয়। এই সমস্যার যেন সমাধান হয় এই নিয়তে দান অব্যাহত রাখলাম। কিছুদিন পর সে আবার নিয়মিত ক্লাস নিতে শুরু করেছে।

রাইসুল আম্বিয়া • *গৃহিণী। ৩৩৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট*

চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৯১ জন

বান্দরবান রাজবিলায় কোয়ান্টাম চক্ষু চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সেবা পেয়েছেন ১,৫৩৫ জন। চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে ২০৪ জনের। অন্যান্য চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু হয় ২০১০ সালে। সেবা পেয়েছেন ৩৮,৫৭৬ জন স্থানীয় অধিবাসী।

সাত বছরের আলতাজ খাতুন। এ শিশুটির পুরো পৃথিবীই ছিল অন্ধকার। সবাই জানত সে জন্মান্ধ। তার পরিবারও এতটাই দরিদ্র ছিল যে, কোনো চিকিৎসাই করানো সম্ভব হয় নি তাদের পক্ষে। আলতাজ আর কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখবে না, এটাই মেনে নিয়েছিল সে ও তার পরিবার।

২০১৭-এর শুরুতে বান্দরবানের রাজবিলায় কোয়ান্টামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি মেডিকেল ক্যাম্প। নিজের চিকিৎসার জন্যে ওখানে এসেছিলেন আলতাজের মা, সাথে এসেছিল আলতাজও। কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উৎসাহেই সেদিন ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিশুটির চোখ পরীক্ষা করেন। এই প্রথম মা জানতে পারলেন, আলতাজ জন্মেছিল আর দশটি শিশুর মতো স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নিয়েই। কিন্তু চোখে ছানি পড়ার কারণে এতদিন সে কিছুই দেখে নি।

চিকিৎসক অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। ফাউন্ডেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের একটি চক্ষু-হাসপাতালে তার অপারেশন হয়। সফল অপারেশনের পর এখন সে সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে দেখছে।

৫ জানুয়ারি ২০১৮ বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে অনুষ্ঠিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে কোয়ান্টাম পরিবারের ১১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন পাহাড়ি-বাঙালি তিন সহস্রাধিক রোগী। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী রোগীদেরকে বিনামূল্যে মোট এক লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৪৩ ইউনিট ওষুধ বিতরণ করা হয়।

আগে জানুন, আপনার দানের অর্থে কী হচ্ছে

আমাদের দেশে যাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়, এদের প্রায় সবাই পেশাদার ভিক্ষুক। তাদের সুনিপুণ অভিনয়ে প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাই সচেতন হতে হবে। কারণ আপনার দানের অর্থ কী কাজে লাগছে, সেই জবাবদিহিতাও আপনার ওপরই বর্তায়।

ধনাঢ্য ভিক্ষুক

নাম হাজী কামাল শেখ। হাতে ব্যান্ডেজ। রক্ত মাখানো। রাজধানীর রমনা পার্কের সামনে বসে ভিক্ষা করছিলেন। অনেকেই তাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তার হাতে আসলে কিছুই হয় নি। পেটের দায়ে হাতে ব্যান্ডেজ করে লাল আলতা রং মেখে ভিক্ষা করছেন।

আগে হাত পেতে ভিক্ষা করতেন। আয় ভালো হতো না। তখন তার দৈনিক আয় ছিল ২০০-৩০০ টাকা। ব্যান্ডেজ লাগানোর পরই ভাগ্য ফিরল। প্রতিদিন অনায়াসে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা আয় হয়। নতুন নতুন এলাকায় গেলে আয় বেড়ে যায়। এক এলাকায় এক মাসের বেশি থাকেন না।

তার বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে। বউ-ছেলেমেয়ে সব গ্রামেই থাকেন। তার চার স্ত্রী। গ্রামের এক বাড়িতেই থাকেন চার জন। ভিক্ষা করে প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা পাঠান। আর বাকি টাকা তিনি নিজের কাছেই রাখেন। চার ঘরে ১০ সন্তান। ছয় ছেলে, চার মেয়ে। এর মধ্যে চার ছেলে বিদেশে। দুই ছেলে গ্রামেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। চার মেয়েরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ভিক্ষা করায় এ পেশা ছাড়তে পারছেন না তিনি।

তার স্বপ্ন ভিক্ষা করেই ঢাকা শহরে বাড়ি করবেন। কারণ তাকে যিনি ভিক্ষা করে অধিক উপার্জনের পথ দেখিয়েছেন, তার এখন ঢাকা শহরে একাধিক বাড়ি। তাই হাজী কামাল শেখ চান ঢাকা শহরে তার প্রতিটি ছেলের নামে একটি করে ফ্ল্যাট থাকবে। কারণ সোনাইমুড়ীর এক ভিখারি ভিক্ষা করে ধনী হয়ে ইউপি মেম্বার পদে নির্বাচন করেছেন। তিনি দুবার হজ করেছেন। তাই নামের আগে হাজী। দুবারই ভিক্ষার টাকায়।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, বাংলাদেশে ভিক্ষুকের আয় নির্ভর করে তাদের শারীরিক আবেদন ও অভিনয়ের দক্ষতার ওপর। আপনি কোনো ভিক্ষুককে দেখবেন না রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডাল-ভাত খাচ্ছে। তারা মুরগি বা গরু ছাড়া ভাত খায় না। আর আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ টাকা বাঁচানোর জন্যে কখনো কখনো ভাত না খেয়ে রুটি-সবজি খাই। যারা রিকশা চালক বা দিনমজুর, তারা পাঁচ টাকার রুটি আর পাঁচ টাকার এক কাপ চা খেয়ে সারাদিন রিকশা চালান।

ভিক্ষাবৃত্তি হলো বিনা পুঁজিতে ব্যবসা, আর কেউ যদি হাজী কামালের মতো ব্যান্ডেজ আর লাল আলতায় পুঁজি বিনিয়োগ করেন, তাহলে তো কোনো কথাই নেই।

তথ্যমতে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ ভাগ ভিক্ষুক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করেন। সর্বনিম্ন দুই মাস থেকে দুই বছর পর নির্দিষ্ট এলাকা পরিবর্তন করেন।

তথ্যসূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ডিসেম্বর ২০১৮

সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম

২০১৯ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে নতুন ২০০ শিশু। প্রতিবছর সারা দেশ থেকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা ভর্তি হয় এ স্কুলে। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সম্মিলিত দানে ও সহযোগিতায় এ শিশুদের গড়ে তোলা হচ্ছে আলোকিত মানুষ হিসেবে।

২০০৫ সালে শুরু হওয়া মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সেবা নিয়েছেন ৮,০২৪ জন দুস্থ সন্তানসম্ভবা মা।

বিশুদ্ধ পানি পান করছেন লক্ষ মানুষ

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ২৮৮টি টিউবওয়েল ও দুইটি ইঁদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়।

খতনাসেবা ॥ ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩৮৬ জন

২০০৫ সালে শুরু হয় খতনাসেবা কার্যক্রম। দারিদ্র্যের কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্ক পুরুষরা এ সেবা পেয়ে থাকেন।

দাফন কার্যক্রম ॥ মমতাপূর্ণ শেষ বিদায়

পরিচয়হীন অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৪৮৯ জনকে।

রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ২০১৫ সাল থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়ালেখা করছে ২৪৫ জন শিক্ষার্থী।

২৪ মার্চ ২০১৮ ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে জাতীয় স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে কোয়ান্টামের সাত শতাধিক সদস্য অংশ নেন। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বছরজুড়ে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম।

আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে ৩৬ জন অসহায় প্রবীণকে এখানে সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন ২,৪৯৪টি পরিবারকে গৃহনির্মাণে সহায়তা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে রাঙামাটিতে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি পরিবারও এ সেবা পায়।

বিশেষ সংখ্যা কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

মাহে রমজান সংখ্যা

কোয়ান্টাম বুলেটিন

মে ২০১৯

মোবারক হোক এবারের রমজান

দীর্ঘ রোজায় পরিপূর্ণ হোক আপনার নিরাময়

নবীজীর (স) একটি হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, 'তোমরা রোজা রাখো যেন সুস্থ থাকতে পারো'। ১৪০০ বছর পর আজ এ কথার বহুমাত্রিক অর্থ আমরা খুঁজে পাই চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্য-গবেষক মহলের দীর্ঘ অনুসন্ধানে। গত এক শতাব্দী ধরে পৃথিবীজুড়ে হাজারো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, রোজা বা নির্দিষ্ট সময় মেনে উপবাস শরীরকে সুস্থ ও টক্সিনমুক্ত রাখে, মনকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সংহত ও বলিষ্ঠ করে। ফলে নিরাময় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং বার্ধক্যপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

বছরের এই সময়ে রোজার সময়কাল হতে যাচ্ছে সাড়ে ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টাব্যাপী। নির্দিষ্ট সময় ধরে পানাহার, অপ্রয়োজনীয় কথা, পরচর্চা-গীবত, ঝগড়া-ফ্যাসাদ বর্জন এবং বেশি বেশি দোয়া-প্রার্থনা ও সৎকর্মে এবারের রমজান হয়ে উঠুক আপনার জীবনে নিরাময় ও প্রশান্তির নতুন নিয়ামক। এবারের রমজানে এই দীর্ঘসময়ব্যাপী রোজা পালনের সুযোগ পাওয়ার জন্যে মহান আল্লাহর প্রতি শোকরগোজার হোন। দীর্ঘ রোজায় পরিপূর্ণ হোক আপনার নিরাময়।

রোজার প্রাথমিক প্রাপ্তি দৈহিক সুস্থতা। আর এ সুস্থতার প্রক্রিয়াটা মূলত ঘটে থাকে 'অটোফেজি'-র মধ্য দিয়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে সম্প্রতি বহুল আলোচিত এই অটোফেজি আদতে আমাদের দেহের একটি স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শরীর যখন ন্যূনতম ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টার উপবাসকাল পার করে তখনই সূচনা ঘটে এ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার।

সোজা কথায়, প্রাত্যহিক ভুল খাদ্যাভ্যাস ও অমিতাচারী জীবন যাপনের ফলে একটু একটু করে আমাদের শরীরে জমতে থাকে নানা রকমের টক্সিন বা বিষাণু–দীর্ঘমেয়াদে যা বার্ধক্যগতিকে ত্বরান্বিত করে এবং শরীরে সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ। এমনকি দেখা দিতে পারে ক্যান্সার ও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি। দীর্ঘ উপবাসকালে শরীর যখন দৈনন্দিন খাদ্য সরবরাহ থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে দেহকোষগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এই টক্সিন বা বিষাণুকেই। ফলে অটোফেজি-র মতো স্বয়ংচালিত দৈহিক প্রক্রিয়ায় এ টক্সিনগুলোর বিনাশ ঘটে।

এর মধ্য দিয়ে অটোফেজি দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করে তোলে। যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে দেহ হয়ে ওঠে সতেজ ও প্রাণবন্ত। কমে ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ার মতো পরজীবী দ্বারা রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে সার্বিকভাবে বাড়ে একজন মানুষের কর্মক্ষমতা।

অটোফেজি নিয়ে গবেষণা করে ২০১৬ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন জাপানের কোষ-জীবতত্ত্ববিদ ও টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র অধ্যাপক ড. ইউশিনোরি ওসুমি। সুদীর্ঘ গবেষণায় তিনি তুলে ধরেন অটোফেজি বা উপবাসের স্বাস্থ্য-হিতকর দিকগুলো। সেই থেকে এ বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে বিশ্বজুড়েই।

আসন্ন রমজান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বছরের দীর্ঘতম দিনগুলোর মধ্যে। এসময় সাড়ে ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টার রোজা শরীরে অটোফেজি প্রক্রিয়া সংঘটনের জন্যে আদর্শ সময়।

তাই আসুন, আমরা পরম করুণাময়ের প্রতি শোকরগোজার হই–পারলৌকিক মুক্তির পাশাপাশি দীর্ঘসময়ব্যাপী রোজা পালন হয়ে উঠুক আমাদের সবার জন্যে সুস্থতা, মনোদৈহিক নিরাময় ও প্রশান্তি অর্জনের কার্যকর পথ।

আগে সালাম দেয়ার চর্চায় সার্থক করে তুলি আসন্ন রমজান

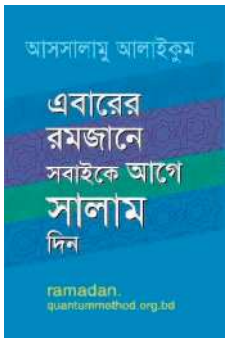

আসসালামু আলাইকুম। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ধর্ম, বয়স ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দিন। আর এ চর্চা বেগবান হোক এ রমজান থেকেই।

নবীজীর (স) শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগে সার্থক হয়ে উঠুক আমাদের এবারের রমজান। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে একটি বিশেষ কণিকা–এবারের রমজানে সবাইকে আগে সালাম দিন।

আমরা বিশ্বাস করি, সঙ্ঘবদ্ধ এ চর্চার অনুরণন ও সার্বজনীনতায় আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সূচিত হবে সর্বব্যাপী কল্যাণের এক নতুন তরঙ্গ। নিজে চর্চার পাশাপাশি চারপাশে আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের কাছে এটি পৌঁছে দিন।

আখেরি দোয়ায় অংশ নিন

পবিত্র রমজানে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে বরকতময় অনুষ্ঠান আখেরি দোয়া। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন ও আখেরি দোয়ায় অংশ নিন।

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন
১০-১৬ মে
স্থান : সেন্টার, শাখা, সেল

গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়া
২৪ মে, শুক্রবার

প্রো-মাস্টার আখেরি দোয়া
২৫ মে, শনিবার
স্থান : আইডিবি, কাকরাইল, ঢাকা
সময়: সকাল ৯টা – ইফতার পর্যন্ত

ড. এম শমশের আলী। শিক্ষাবিদ পরমাণুবিজ্ঞানী লেখক গবেষক ও ধর্মতাত্ত্বিক। ১ এপ্রিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় তিনি 'সুফিজম ও বিজ্ঞান' বিষয়ে আলোচনা করেন। নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

ভালবাসার চেয়ে ভালো ভাষা আর হয় না

আল্লামা ড. এম শমশের আলী

মওলানা রুমির একটি গল্প আছে। জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। দরজায় কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, কে? বন্ধু উত্তরে জানাল–'আমি'। দরজা খুলল না। এর কারণ বুঝতে না পেরে লোকটি চলে গেল।

এরপর তার পরিচয় হলো একজন সুফির সাথে। সাধনায় মগ্ন হলো সে। সাধনা বলতে আমরা সাধারণত মনে করি, ঘর-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া। বিষয়টা সবক্ষেত্রে তা নয়। নিজের অহম থেকে মুক্ত হওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টাই একটা বড় সাধনা। সাধনার একপর্যায়ে সে উপলব্ধি করল–'আমি' বলে কিছু নেই। মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই নগণ্য এই 'আমি'। আর এ উপলব্ধিই তাকে মুক্তি দিল এতদিনের সকল অহংকার থেকে।

দীর্ঘ সাধনার পর লোকটি আবার গেল সেই বাড়িতে। একইভাবে দরজায় কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে ঐ একই প্রশ্ন–কে ওখানে? এবার সে জবাব দিল–'তুমি'। দরজা খুলে গেল। 'আমি' বিলীন হয়ে গেল 'তুমি'তে।

এ গল্পের নির্যাসটুকু হচ্ছে 'আমিত্ব' থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। যিনি সত্যিকারের সুফি, তিনি এই 'আমিত্ব' থেকে মুক্ত হতে পারেন। এভাবেই একজন সুফির চৈতন্যোদয় ঘটে। অন্তহীন এই মহাবিশ্বে তিনি তখন নিজের ক্ষুদ্রতর অস্তিত্বটাকে খুঁজে পান। যেমনটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ/ তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,/ বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

রবীন্দ্রনাথের গানের এই পঙক্তিগুলোর মাঝে উঠে এসেছে সুফি সাধনার একটি চিরন্তন সত্য, যা কৃতজ্ঞচিত্ততারই বহিঃপ্রকাশ। যুগে যুগে সুফিরা তাদের কাজের মাধ্যমে এই স্রষ্টাবন্দনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গত কয়েক শতাব্দী ধরে এ অঞ্চলে যে সুফি সাধকরা এসেছেন, সত্যবাণী প্রচার করেছেন, তারা তো কেউ বাংলা ভাষা জানতেন না। তাহলে তারা মানুষের মনে জায়গা করে নিলেন কীভাবে?

তারা পথে চলতে চলতে কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখলে তখনই তার সেবা-শুশ্রূষা শুরু করে দিতেন। অসুস্থ মানুষটির কাছে শুশ্রূষাকারীকে অচেনা মনে হতো ঠিকই, কিন্তু তার মমতা ও ভালবাসা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হতো না। যার খাবার নেই, সুফিরা তার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করতেন। যার পরামর্শ প্রয়োজন, তাকে পরামর্শ দিতেন।

দুঃখক্লিষ্ট মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল সুফিদের প্রধান কাজ। এভাবেই সুফিরা হয়ে উঠতেন সাধারণ মানুষের ভরসাস্থল। তারা যথার্থই জানতেন, ভালবাসার চেয়ে ভালো ভাষা আর হয় না। মমতাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা।

শুধু মানুষের সেবা নয়, সুফিরা ভালবাসেন গোটা সৃষ্টিজগতকে। সুফি সাধক রাবিয়া বসরী ছিলেন ইরাকের বসরা নগরীর অধিবাসী। তিনি যখন স্রষ্টাভাবনায় মগ্ন হতেন, তখন বনের পশুপাখিরা তাকে ঘিরে থাকত। পশুপাখিরাও বুঝতে পারত–এই মানুষটি তাদের জন্যে নিরাপদ। তাই সুফিদের জীবনধারার মূল ভিত্তিটা হলো, এক স্রষ্টায় বিশ্বাস আর সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা।

> আমরা আসলে কীসের পেছনে ছুটছি! কতটুকু-বা আমার প্রয়োজন? তাই আমাদের জানতে হবে–কোথায় আমরা থামব। এটাই হচ্ছে সুফিদের শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষা। আমার খুব ভালো লাগে–কোয়ান্টামেও এই একই শিক্ষার অনুশীলন আমি দেখতে পাই।

এই ভালবাসা আর ন্যায়বিচার নবী-রসুল-খলিফাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে খুব সুন্দরভাবে। সবকিছুর ঊর্ধ্বে তারা অন্তরের শুদ্ধিকে নিশ্চিত করতে বলেছেন। বদরের যুদ্ধের পর নবীজীকে (স) জানানো হলো, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা জয়ী হয়েছি, এখন আমাদের বিজয়ের সময়। নবীজী (স) বললেন, না। আমাদের আরো বড় জিহাদ বাকি আছে। জিহাদ-ই আকবর। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। অর্থাৎ নিজেদের রাগ ক্ষোভ হিংসা বিদ্বেষের ওপর আমাদের জয়ী হতে হবে, সেইসাথে মুক্ত হতে হবে যাবতীয় প্রলোভন থেকে।

আলীর (রা) জীবন থেকে আমরা বহু শিক্ষণীয় ঘটনা পাই। তার সাথে প্রতিপক্ষ এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধার লড়াই হচ্ছে। একপর্যায়ে তিনি তাকে পরাস্ত করে প্রতিপক্ষের বুকের ওপরে বসে পড়লেন। প্রতিপক্ষ বুঝল, এবার আর নিস্তার নেই। সে থুথু ছিটিয়ে দিল আলীর (রা) মুখে।

সাধারণ কোনো যোদ্ধা হলে পরাজিত প্রতিপক্ষের এমন দুর্বিনীত আচরণে এক কোপেই তার গলা কেটে ফেলত। কিন্তু আলী (রা) তা করলেন না। তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, এখন আমি আর তোমাকে হত্যা করতে পারব না। যদি তোমাকে আমি হত্যা করি, সেটা হবে আমার ব্যক্তিগত ক্রোধ-ঘৃণাবশত। আমি কোনো ব্যক্তিগত যুদ্ধ করছি না। আমি যা করছি সেটা হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আলীর (রা) আরেকটি কথা আমি খুব অনুভব করি। তিনি বলেছেন, সাহসীরাই প্রকৃত ধৈর্যশীল। আসলে একজন মানুষ যখন অসহায়-দুর্বল, তখন তার ধৈর্য ধরা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু একজন সাহসী-সবল, সবাই যাকে মান্য করে চলে, নিজের মতের বিরুদ্ধে কিছু ঘটতে দেখলে ধৈর্যধারণ করা তার জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত সাহসী তারাই–যারা বিপদে যেমন ধৈর্য ধরতে পারে, সুসময়েও থাকতে পারে অসীম ধৈর্যশীল।

সুফিদের কথাগুলো তাই সর্বকালের, সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের। তাদের কাছে সবাই সমান, সে যে-ই হোক। এই উদার মানসিকতাই অন্যদের চেয়ে সুফিদের আলাদা করেছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষ শুধু ক্ষমতার দাপট, অর্থবিত্ত সঞ্চয় ও খরচ করতেই বেশি ব্যস্ত। কনজ্যুমারিজম বাড়ছে হু হু করে। কিন্তু আমাদের একটু স্থির হয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আমরা আসলে কীসের পেছনে ছুটছি! কতটুকু-বা আমার প্রয়োজন? তাই আমাদের জানতে হবে–কোথায় আমরা থামব। এটাই হচ্ছে সুফিদের শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষা। আমার খুব ভালো লাগে–কোয়ান্টামেও এই একই শিক্ষার অনুশীলন আমি দেখতে পাই।

সুফিদের দর্শন যদি কারো জীবনে প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে কোনো অশান্তি-অভাববোধ থাকতে পারে না। সুফিদের কথা হলো–তুমি যদি শোকরগোজার হও, তোমার জীবনটা সার্থক হবে, সবদিক থেকে সুন্দর হবে। তোমার অন্তরের চোখেই তখন ধরা পড়বে স্রষ্টার মহিমা আর সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য। প্রভুর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে তুমি লুটিয়ে পড়বে তাঁর সেজদায়।

সুবচন ও সুন্দর আচরণে গড়ে উঠুক

স্বাস্থ্যকর রমজান সংস্কৃতি

রমজানের এক ছুটির দিন। পরিকল্পনা ছিল দিনটা আপনি পরিবারের সাথে কাটাবেন। নিজের জন্যেও থাকবে কিছু নীরব সময়। কিন্তু সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে শত শত বিজ্ঞাপন আর মোবাইল ফোনে একের পর এক দারুণ অফার–জামা, জুতো, রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে ফার্নিচার ফ্ল্যাট পর্যন্ত মূল্যছাড়। আপনিও বেরিয়ে পড়লেন রমজানের 'কেনাকাটায়'। কিন্তু রমজানের প্রকৃত উদযাপন বা উদ্দেশ্য কি এটাই? এত এত পণ্যের মাঝেই কি মানুষের ভালো থাকা?

মুনাফালিপ্সু বেনিয়াগোষ্ঠী সবসময় এটাই বিশ্বাস করাতে চায় যে, সুখ লুকিয়ে আছে রংবেরঙের পণ্য এবং সুস্বাদু মুখরোচক খাবারের মধ্যে। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দেখে মানুষ এসব কথা বিশ্বাসও করে ফেলে অনায়াসে। আর সমাজ আমাদের ভেতরে যে ধারণা গেঁথে দেয়, তা হলো বৈষয়িক সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সকল সুখ। ফলে অধিকাংশ মানুষই সুখ খুঁজতে থাকে পণ্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে।

অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে–কোনো পণ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা বিশেষ কোনো অর্জন মানুষকে প্রকৃত অর্থে সুখী করে না। কোনোকিছু পেয়ে নয়, বরং মানুষ সুখী হয় দেয়ার মধ্য দিয়ে। অপরের জন্যে কিছু করার মধ্য দিয়ে।

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার গবেষক এলিজাবেথ ডান তার সহকর্মীদের নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এতে দেখা যায়, শুধু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরাই নয়, দুই বছর বয়সী শিশুরাও যখন কাউকে সহযোগিতা করে বা কিছু দেয়–তাদের মধ্যেও আনন্দের অনুভূতি বাড়ে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজে সেই মানুষগুলোই বিষণ্নতা ও হতাশার শিকার, যারা নিজেকে নিয়েই বেশি ভাবে। এই আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের চিন্তার জগতটাকে সংকীর্ণ করে দেয় এবং যে-কোনো প্রতিকূল সময়ে এরা ভেঙে পড়ে সহজেই। কারণ নিজের জীবন, নিজের সমস্যা, নিজের ব্যর্থতার মাঝেই সে ঘুরপাক খেতে থাকে প্রতিনিয়ত।

সমমর্মী মানুষেরাই সুস্থ

দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ হিসেবে যারা সমমর্মী ও দয়ালু তারা নিজেদের জীবন নিয়ে অধিকতর পরিতৃপ্ত। শারীরিক-মানসিকভাবেও তারা অন্যদের চেয়ে বেশি সুস্থ। সেইসাথে তাদের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনে সম্পর্কগুলোও হয় স্থিতিশীল ও মধুর।

সহযোগিতা বা সৌজন্য পেলে আনন্দিত হন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু বিষয়টি শুধু আনন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যিনি ভালো আচরণ করেন তিনি উপকৃতও হন নানাভাবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির সমমর্মিতা ও সুন্দর আচরণের ভূমিকা অনেক। এ গুণটি ব্যক্তিকে দুশ্চিন্তা, স্ট্রেস ও ডিপ্রেশন থেকে মুক্ত রাখার পাশাপাশি তার দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দেয় উল্লেখযোগ্য হারে। *(ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ, অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট)*

মেয়ো ক্লিনিকের রিপোর্টে উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য–অন্যদের সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসরণ হয়, যা ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি করে। ব্যক্তির আবেগ ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকে প্রভাবিত করে এই হরমোন। উল্লেখ্য, অক্সিটোসিন হরমোনটি কার্ডিও-প্রোটেকটিভ বা হৃৎবান্ধব হিসেবে পরিচিত। এ হরমোনের উপস্থিতিতে মানবদেহের রক্তনালীতে নাইট্রিক-অক্সাইড তৈরি হয়, যা রক্তনালীকে প্রসারিত করে এবং ব্লাড প্রেশার বা রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে।

পরিবর্তন আসে সমাজেও

শুধু ব্যক্তির জীবনেই নয়, সমমর্মিতা পরিবর্তন আনে সমাজ এবং জাতির জীবনেও। যখন কেউ সহানুভূতিশীল আচরণ করে, তা অন্যদের মাঝেও সংক্রমিত হয়। একজনের মমতাপূর্ণ কথা ও আচরণ উদ্বুদ্ধ করে পাশের মানুষটিকে। সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলছেন চেইন রি-একশন অব গুডনেস বা শুভবোধের চলমান প্রক্রিয়া।

কোয়ান্টাম প্রকাশিত তিন পর্বের সুবচন কণিকা, নয় পর্বের শিষ্টাচার কণিকা ও সর্বোত্তম আদর্শ কণিকা সংগ্রহে রাখুন, নিয়মিত পড়ুন ও আত্মীয়-পরিজনকে উপহার দিন। সুন্দর আচরণে শান্তিময় হোক চারপাশ।

এভাবেই ব্যক্তির শুভবোধ পরিবার ছাড়িয়ে বদলে দিতে পারে সমাজ এমনকি জাতিকেও। বিশেষত শিশুরা যখন এমন একটি পরিবেশে বেড়ে ওঠে, যেখানে মানুষে মানুষে রয়েছে সম্মানবোধ, সহনশীলতা ও দয়া-মায়া, এ বিষয়টি তাকে সদাচারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। মহামানবদের জীবন থেকে শিশুরা যখন মমতা, বিনয় ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত খুঁজে পায়, তাদের কোমল হৃদয়ে স্থান করে নেয় উচ্চতর জীবনের ধারণা।

রমজানে সমমর্মিতা

সুস্থ থাকার এবং ভালো থাকার সহজ সূত্রটি হলো সমমর্মিতা। আর একে কাজে লাগানোর আদর্শ সময় হতে পারে মাহে রমজান। কারণ বছর ঘুরে যখন এ সময়টা আসে, সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায় সংযম, শুদ্ধি আর ইতিবাচক সব পরিবর্তনের প্রয়াস।

ইসলামি চিন্তাবিদরা বলছেন, শুধু উপবাস ও নিয়ম মেনে ইফতার-সেহরি এবং প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকাই রোজা পালন নয়; বরং সার্বিকভাবে একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বসুরিদের ওপর। যাতে তোমরা আল্লাহ-সচেতন থাকতে পারো। *(সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)*

আল্লাহ-সচেতন মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমমর্মিতা ও সুন্দর আচরণ। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন জুড়েও রয়েছে দয়া ও সমমর্মিতার অগণিত উদাহরণ। নবীজীর (স) হাদীস হলো :

- মানুষকে দয়া করো, আল্লাহ তোমাকে দয়া করবেন।–*বোখারী*
- তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সদাচারীরা আর সবচেয়ে অপ্রিয় হচ্ছে বদমেজাজীরা।–*তিরমিজী*
- ইবাদত গালিগালাজ ও কটুভাষণের দোষ মোচন করতে পারে না।–*বায়হাকি*

যারা রমজানে সাধ্যমতো ইবাদত করতে চান, পুণ্য অর্জন করতে চান, তাদের জন্যেও সবচেয়ে সহজ পথ হতে পারে ঘরে-বাইরে সবার সাথে বিনয় ও ভালো আচরণ। কারণ রমজানে প্রতিটি ভালো কাজের সওয়াব ৭০ গুণ। হাসিমুখে কথা বলা, অন্যের জন্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া এবং সর্বত্র প্রশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার মতো ভালো কাজ আর কী হতে পারে!

সদাচরণ ও সমমর্মিতায় সার্থক রমজান

সংযমের মাস রমজান। অথচ এ সময়টাতেই চারপাশে অসংযমী আচরণের প্রকাশ দেখা যায় তুলনামূলক বেশি। ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রশান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানুষের রাগ-উত্তেজনা-অস্থিরতা।

সমাজের এই চিত্রটি বদলে দিতেই প্রয়োজন সবরকম নেতিবাচকতা পরিহার। আমাদের ছোট ছোট ভালো আচরণ-অভ্যাসই প্রতিদিনের জীবনকে করে তুলতে পারে আরো আনন্দময় :

- সবাইকে আগে সালাম দিন।
- সবসময় হাসিমুখে কথা বলুন।
- পারস্পরিক কথাবার্তা ও আদান-প্রদানে 'মেহেরবানি করে' ও 'ধন্যবাদ' বলুন।
- অপ্রয়োজনীয় কথা বিতর্ক ঝগড়া উত্তেজনা রাগ-ক্ষোভ ও দুর্ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরচর্চা ও গীবত নিজে করবেন না, অন্যরা করলে অংশ নেবেন না।
- প্রতিবেশী ও আত্মীয়-পরিজনদের খোঁজখবর নিন। প্রতিদিনের প্রার্থনা ও মেডিটেশনে তাদের জন্যে দোয়া করুন।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে মাহে রমজান হতে পারে নিজেকে বদলানোর এক অনন্য সুযোগ। আসুন, আন্তরিক প্রচেষ্টায় গতকালের 'আমি'-র চেয়ে আজকের 'আমি' হয়ে উঠি আরো সুস্থ, সমমর্মী ও মানবিক।

তথ্যসূত্র : হেলথ ডিরেক্ট.গভ.এইউ; হাফিংটন পোস্ট, ২ আগস্ট ২০১১; সাইকোলজি টুডে, ১৬ নভেম্বর ২০১৭

রমজানে কোয়ান্টাম পরিবার

সংযমের মাস রমজান। বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করে এ মাসে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা হয়ে ওঠেন আগের চেয়ে সুস্থ ও প্রাণবন্ত। সেইসাথে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন ও যাকাত কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে এসেছে আর্থিক সমৃদ্ধি, আত্মিক পরিতৃপ্তি। এমনই কিছু অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো।

স্রষ্টা আমার রিজিক বাড়িয়ে দিয়েছেন

ড. সাবরিনা আনাম

ছেলেবেলায় যখন মাত্র পড়তে শিখেছি, বড় মামার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলাম রোজাদারের করণীয় সম্পর্কে একটি সুন্দর বই। পবিত্র রমজানের প্রতি আমার ভালবাসা তখন থেকেই। কিন্তু শৈশবে পরিবারের বড়দের সাথে পাল্লা দিয়ে রোজা রাখতে খুব কষ্ট হতো।

আশ্চর্য হলো, এই ব্যাপারটি সহজ হয়ে গেল গুরুজীর নির্দেশনা অনুসরণ করার পর থেকে। সেহরি ও ইফতারে আমি কোয়ান্টাম খাবার তালিকা অনুসরণ করতে লাগলাম। এরপর দেখলাম, ভেলায় ভেসে যাওয়ার মতো আমার রোজার দিনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। শারীরিকভাবে সুস্থ ও প্রাণবন্ত বোধ করেছি সারা মাসজুড়ে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার আগে আমার যাকাত হিসাব করে দেয়া হতো না। যখন হিসাব করে যাকাতের অর্থ কোয়ান্টামে জমা দিতে শুরু করলাম, আল্লাহ আমার রিজিক বাড়িয়ে দিতে লাগলেন।

[শিক্ষা অফিসার, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী]

যাকাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে

মো. মাহমুদ হোসেন

আমি ২০১৭ সাল থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করছি। সেসময় থেকেই কাজে সাফল্য আসতে শুরু করল। পরের বছর আমার যাকাতের পরিমাণ প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পেল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই।

২০১৮ সালে আমি লামায় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়েছি এবং এর অনুভূতি অসাধারণ। আখেরি দোয়াতে গুরুজী একজন এতিমের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। কথাটি আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে এবং আমি একজন শিশুর দায়িত্ব নিই। আনন্দের বিষয় হলো, এবছর জানুয়ারি মাসে আমি আরেকজন এতিমের দায়িত্ব নিয়েছি। তাদের জন্যে দান করতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না; বরং যে-কোনো প্রয়োজনে স্রষ্টা কোনো না কোনো উপায়ে আমাকে সাহায্য করছেন। এ-ছাড়া দুবছর ধরে রমজানে কোরআনের ৪০টি কপি পরিচিতদের মাঝে বিতরণ করছি। আমি বিশ্বাস করি, এর ইতিবাচক প্রভাব আমার পরিবারেও পড়েছে। *[ব্যবসায়ী]*

পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন

মাহমুদা আক্তার

কোয়ান্টাম পরিবারে যুক্ত হয়ে আমার জীবনে প্রশান্তির পরিমাণ বেড়ে গেছে। আমার চারপাশে কোয়ান্টামের বাণী পৌঁছে দিতে কখনো কখনো প্রতিকূলতা এসেছে কিন্তু আমি হতাশ হই নি, সবসময় ভালো কাজ করতে চেয়েছি।

২০১৮ সালে পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের জটিলতা থেকে মুক্তির নিয়তে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিই। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমার পরিবারে এসেছে নানা ইতিবাচক পরিবর্তন। সেইসাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেমের স্টিকার বিতরণ করেছি। আমার বিশ্বাস, সবই রমজানের সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনার ফল।

[সহকারী শিক্ষক, নবারুণ স্কুল এন্ড কলেজ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা]

ভার্চুয়াল ভাইরাসমুক্ত রমজান পালনে সচেতন হয়েছি

ফাতেমা সাদেকা

প্রতি বছর আমি রমজানের শুরুতেই কোরআনের মর্মবাণী বিতরণ করি, যাতে আমার পরিবারের সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। গত বছর অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমার সন্তান নিজেই রমজানে ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে দূরে থাকছে এবং আগ্রহী হয়ে জামাতে নামাজ আদায় করছে।

কোয়ান্টাম প্রকাশিত রমজান কণিকা অনুসরণ করে ঘরে-বাইরে সব কাজে সারাদিন স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে পেরেছি। এ-ছাড়া আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নিয়তে আখেরি দোয়ায় অংশ নিই। স্রষ্টার করুণায় আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো এখন অনেক মমতাময়।

[চাকরিজীবী]

আমার ওষুধ-নির্ভরতা আর নেই

মো. ইকবাল কবির

রমজান মাসকে ঘিরে নানারকম অবিদ্যায় আচ্ছন্ন ছিলাম আমি। ফলে রোজা পালন করতে কষ্ট হতো। হজমের সমস্যার জন্যে আমাকে বিভিন্ন রকমের ওষুধ খেতে হতো।

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য হওয়ার পর মাহে রমজান পালনের সঠিক দিক-নির্দেশনাগুলো জানতে পারলাম। কয়েক বছর যাবত সেহরি ও ইফতার যথাযথভাবে পালনের ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে খুব হালকা বোধ করি। হজমের কোনো অসুবিধাও আর হয় না। এখন আমার ওষুধ-নির্ভরতা একবারেই নেই। স্রষ্টার করুণায় এখন আমি বেশ ভালো আছি।

[সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল]

পেয়েছি নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ

রওশন জাহান

রমজানে এসিডিটির কারণে আগে কখনো সবগুলো রোজা রাখতে পারতাম না। সারাদিন পিপাসা পেত। কিন্তু গত বছর কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করেছি। অস্বাস্থ্যকর খাবার খাই নি। সেহরি করেছি ভাত ও শাকসবজি দিয়ে। ফলে এসিডিটি থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছি। সুস্থ শরীরে রোজা করতে পেরেছি।

২০১৮ সালের রমজানে খাবারের খরচ কমে যাওয়ায় আমরা পরিবারের সবাই দানের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছি এবং সুন্দরভাবে যাকাত আদায় করতে পেরেছি।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে করা যে-কোনো কাজে আল্লাহর রহমত ও বরকত বেশি থাকে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করার সুযোগ পেলাম কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে। মা-বাবা ও দুই বোনকে নিয়ে গত বছর আমি এ প্রোগ্রামে অংশ নিই। প্রতিদিন বাসায় ফিরে মর্মবাণীর আয়াতগুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনা করতাম। ফলে কোরআন চর্চার আগ্রহ যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পরিবারে সবার মধ্যে পারস্পরিক মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ বেড়েছে।

খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে আমরা নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ পেয়েছি। আগে যখনই কোনো বিপদ-আপদ আসত, আমরা খুব হতাশ হয়ে পড়তাম। কিন্তু স্রষ্টার প্রতি আমাদের বিশ্বাস বেড়েছে এবং আমরা ইতিবাচক চিন্তা করতে পারছি। এখন আমরা যে-কোনো পরিস্থিতিতে আশাবাদী থাকি, শোকরগোজার থাকি।

[শিক্ষার্থী, ল'জুনিয়রশিপ]

মর্মবাণীর অডিও শুনে ইতিবাচক হয়েছে আমার সন্তান

আনজুমান আরা চৌধুরী

কোয়ান্টাম পরিবারে একাত্ম হওয়ার আগেও রমজানে রোজা রেখেছি, নামাজ আদায় করেছি, কোরআন পড়েছি। কিন্তু সবই করেছি না বুঝে। রমজানের গুরুত্ব এবং কোরআনের মর্মার্থ কখনো হৃদয়ে ধারণ করতে পারি নি। প্রথমবার কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে উপলব্ধি করলাম একেকটি আয়াতের মর্মার্থ।

এ-ছাড়াও প্রতি রমজানেই আমি ৪০টি আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী বিতরণ করি। আমার সহকর্মীরা খুব আগ্রহ নিয়ে কোরআনের মর্মবাণী পড়েন এবং চর্চা করেন।

রমজানে কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস ও রুটিন অনুসরণ করে আমার এনার্জি লেভেল বেড়েছে, এসিডিটির সমস্যা দূর হয়েছে। ইফতারের পরের কাজগুলো সুন্দরভাবে করতে পারছি। আরেকটি প্রাপ্তি হলো–আমার ছোট ছেলে এখন কোরআনের মর্মবাণীর অডিও ট্র্যাক শুনে ঘুমাতে পছন্দ করে। আগে সে রাতে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। কোয়ান্টামে আসার পর তার মধ্যে ইতিবাচক নানা পরিবর্তন দেখছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

[সহকারী শিক্ষক, গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, রাজশাহী]

চারপাশের মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছেন

সাবেরা শরিফ খুশবু

ছোটবেলা থেকে দেখেছি, আমার পরিবার-পরিজনের মাঝে এ ধারণাটাই প্রচলিত যে, রমজান মাস মানে খাবারের নানা আয়োজন আর ভুড়িভোজ। এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তাদের মাঝে অসুস্থতা ও অস্থিরতা দেখতে পেতাম বরাবরই।

গুরুজীর আলোচনায় রমজানের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে পেরে ২০১৩ সালে আমি উদ্যোগ নিই তার দিক-নির্দেশনাগুলো মেনে চলার। পরের বছর লক্ষ করলাম, পরিবারের সদস্যরাও ইফতারে ভাজাপোড়া বর্জন করে সুস্থ আছে।

পরবর্তীতে আমার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে পরিবর্তন দেখলাম। ইফতারকে তারা খাবারের উৎসব মনে করছেন না, বরং এটা যে রহমতের সময় তা উপলব্ধি করতে পারছেন। আমার পরিবার এখন দৈনন্দিন জীবনেও কোয়ান্টামের নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে সচেতন।

[মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]

রমজানে এখন ১০ লিটার তেলের খরচ বেঁচে যায়

লুৎফুর নাহার

আমি শিক্ষকতা করি। প্রতি বছর রমজানে স্কুল থেকে বাসায় ফিরেই শুরু হতো ইফতার বানানোর তোড়জোড়। ইফতারে তিন-চার পদের খাবার তৈরি করতাম এবং এতে সারা মাসে ১৫ লিটার তেলের প্রয়োজন হতো। আর সময়ও দিতে হতো বেশ। ইবাদত করার সময় পেতাম না। মনে করতাম এই খাবারগুলো না খেলে ইফতার হয় না।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর এই চিত্রটি পাল্টে গেল। গুরুজীর কথামতো খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করি এবং মাগরিবের নামাজের পরে রাতের খাবার খাই। সেহরিতে মাছ-মাংস এড়িয়ে চলি।

এই নিয়ম মেনে দেখলাম, রমজানে আমার পরিবারে রান্নার জন্যে তেল প্রয়োজন হয় পাঁচ লিটার। বাকি ১০ লিটার তেলের খরচ বেঁচে যায়, যা আমি অনায়াসে দান করতে পারি। আমার জীবনে এ পরিবর্তনের জন্যে আল্লাহর প্রতি এবং কোয়ান্টামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

[সহকারী শিক্ষক, গুল এ জার বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার আসক্তি দূর হয়েছে

মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী

কোয়ান্টামে আসার আগে আমি প্রতি বছর রমজানে নতুন ফার্নিচার কিনতাম। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে বলতেন, তুমি শুধু নিজের জন্যেই না, তোমার পরের প্রজন্মের জন্যেও ফার্নিচার কিনে ফেলেছ। শুধু তা-ই নয়, ব্র্যান্ডের দোকান দেখলেই আমার কিছু না কিছু কিনতে ইচ্ছা করত। কেনাকাটা করে প্রায়ই শূন্য পকেটে বাড়ি ফিরতাম।

রমজান মাসে অপচয় আরো বেশি হতো। আমি সবসময় বাজারের ব্যাগ ভরে খাবার কিনতাম। বেশিরভাগ সময় দেখা যেত, এত খাবার পরিবারের সদস্যদের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে না এবং পরে সেগুলো ফেলে দিতে হতো। বেশি কিনলে চারপাশের মানুষ সমীহ করবে, পরিবারের সবাই খুশি হবে–এই ধারণাটাই কাজ করত।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটার প্রতি আমার আসক্তি দূর হয়েছে। রমজানকে ঘিরে পণ্যের জৌলুস ও মূল্যহ্রাসে এখন আর প্রভাবিত হই না। পরিবারের সবাই আমার এ ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে আনন্দিত।

[সহকারী প্রোগ্রামার, যশোর শিক্ষা বোর্ড]

আগের চেয়ে শোকরগোজার হতে পেরেছি

মোস্তাকিম আহমেদ

গুরুজীর দিক-নির্দেশনাগুলো মেনে চলার ফলে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে রমজানের বরকতকে অনুভব করেছি। কথাবার্তা ও আচরণে আমি সংযত থেকেছি এবং গীবত বর্জন করেছি। এতে আমার ধৈর্য বেড়েছে। আমি আগের চেয়ে শোকরগোজার হতে পেরেছি। রমজান মাসজুড়ে এক ধরনের প্রশান্তি বিরাজ করে আমার মধ্যে। ব্যক্তিগত জীবনে জটিলতাগুলো কমে গেছে। ২০১৭ সাল থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ের ফলে আমার জীবনে প্রাচুর্য এসেছে।

[অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা]

শ্রমানন্দে কাজ করতে পারছি

জাফরুন নাহার শেলী

রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে আমি এখন সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে পারছি। বিশেষ করে কোরআনের মর্মবাণী পাঠ, রাগ-ক্ষোভ বর্জন, গীবত থেকে সচেতনভাবে নিজেকে দূরে রাখা–এ বিষয়গুলো আমাকে খুব সাহায্য করেছে। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে সবরকমের স্ট্রেস থেকে মুক্ত থাকতে পারছি। রোজা পালনের পরও শ্রমানন্দে কাজ করতে পারি, কোনো ক্লান্তি অনুভব করি না।

[প্রভাষক, শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, পাবনা]

রমজানে নিয়মিত দান করে বালা-মুসিবত দূর হয়েছে

সাখাওয়াত হোসেন শুভ

কোর্স করার পর ২০১৪ সাল থেকে আমি রমজানে গুরুজীর কথা ও নির্দেশনাগুলো পালন করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক বছর রমজানে সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণের ফলে আমি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ ও কর্মোদ্যমী। রুটিন করে কাজ করাটা আমার জন্যে সহজ হয়েছে। দৈনন্দিন দানের পাশাপাশি রমজানে বিশেষ নিয়তে দানের ফলে নানারকম বালা-মুসিবত থেকেও মুক্ত থাকতে পেরেছি।

[ব্যবসায়ী]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি জ্ঞানী হতে চাই। কীভাবে হতে পারি? জানাবেন দয়া করে।*

উত্তর : জ্ঞান অর্জন করতে হলে আগে অন্তরটাকে মুক্ত করতে হবে, খালি করতে হবে। কারণ পানিতে পরিপূর্ণ একটা পাত্রে যদি আরো পানি দেয়া হয়, সেটা উপচে পড়বে। তেমনি জ্ঞানটাকে গ্রহণ করতে প্রয়োজন মুক্তমন। অর্থাৎ পূর্বতন ধ্যানধারণা দিয়ে বিচার করা যাবে না। মুক্তমন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই আপনি জ্ঞানী হবেন।

মানুষ মূর্খ থাকে কেন? কারণ শৈশব থেকে যখন সে বেড়ে ওঠে, চারপাশের যত মূর্খতা যত সংস্কার-কুসংস্কার সব এসে ভেতরটাকে ভরে ফেলে। যার ফলে জ্ঞান আর গ্রহণ করতে পারে না। কারণ জায়গা নেই তো! এজন্যে মনটাকে ফাঁকা করতে হবে।

প্রচলিত ভুল ধারণা হলো–না জানলে গুনাহ নেই, কিন্তু জানার পর সে অনুসারে কাজ না করলে গুনাহ। অতএব কেউ জানতে চায় না। অথচ না জানলে গুনাহ হবে দ্বিগুণ। প্রথমত, না জানার কারণে। দ্বিতীয়ত, না মানার কারণে। অনুসরণ করা তো পরের বিষয়, আগে জানতে হবে। তারপর আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মেনে চলবেন কিনা। কিন্তু 'জানি না' এটা আল্লাহকে বলতে পারবেন না। জীবনে এত কিছু করার সময় হয়েছে, আর জানার জন্যে সময় হয় নি?

মনে রাখবেন, জ্ঞানের শুরু বা জ্ঞানের একক হচ্ছে জীবনদৃষ্টি। আর মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর ও সঠিক জীবনদৃষ্টি দিয়েছে ধর্ম। পৃথিবীতে যত ধর্মীয় পুরুষ এসেছেন, তাদের মধ্যে সর্বশেষ রসুল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স)। জীবনদৃষ্টি-সংক্রান্ত যত জ্ঞান রয়েছে, তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তাঁর মধ্য দিয়ে। তাঁকে স্রষ্টা যে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই জ্ঞানের সংকলনই হচ্ছে আল কোরআন।

কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ধর্মের জ্ঞান অর্জন করা একজন মানুষের জন্যে ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। তাই নিয়মিত কোরআনের মর্মবাণী পড়বেন। গিলাফে মুড়িয়ে ঘরের সবচেয়ে উঁচু স্থানে রেখে দেবেন না। পরিচিত যাদের কাছে নেই, তাদের কাছে মর্মবাণী পৌঁছে দেবেন।

এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে যে-কেউ কোরআন পড়ার ও শোনার সুযোগ করতে পারেন খুব সহজেই। কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি ডাউনলোড করে নিন মর্মবাণীর অ্যাপ। এতে আরবি ও বাংলাতে পড়তে পারবেন, অডিও শুনতে পারবেন। পড়লে যা উপকার, শুনলেও তা-ই।

সূরা সা'দ-এর ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন– 'হে নবী! আমি তোমার ওপরে এই কল্যাণময় কিতাব নাজিল করেছি যাতে মানুষ এই কোরআনের বাণী নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়। (সেইসাথে সহজাত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে) এর শিক্ষা অনুসরণ করে।'

সূরা মুহাম্মদ-এর ২৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– 'এরপরও কি ওরা কোরআন নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তা অন্তরে ধারণ করবে না? নাকি মনের দরজা বন্ধই করে রাখবে?' কত দরদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এ কথাগুলো বলেছেন! কোরআনে এমন প্রচুর আয়াত রয়েছে।

তবে কোরআনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করার জন্যে প্রয়োজন পরিপূর্ণ মনোযোগ। অর্থাৎ চারপাশের কোনো আওয়াজ বা কিছুই যেন আপনাকে বিরক্ত না করে। এ উদ্দেশ্যে রমজান মাসে কোয়ান্টামের বিশেষ প্রোগ্রাম থাকে–কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। ছয় দিনে ধ্যানের স্তরে এটি সম্পন্ন হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বান্দরবান লামাতেও খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লামায় যারা যাবেন, তারা পাহাড়ি নির্জনতায় কোরআন অনুধাবন করার সুযোগ পাবেন। এ এক অসাধারণ অনুভূতি!

যারা এতে অংশ নিতে চান, আগে থেকেই প্রস্তুতি নেবেন যাতে কোনোকিছু বাধা সৃষ্টি না করে। কারণ জ্ঞান অর্জন হোক বা যে কাজই হোক, তা ভালোভাবে করার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন। কোরআন জানা যেহেতু ফরজ, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত–এই ফরজ পালন না করে আমরা কেউ যেন মারা না যাই। অনেক সময় মানুষ মনে করে, আচ্ছা আরেকটু বয়স হোক। কিন্তু আমরা কেউ জানি না, আদৌ আর বয়স হবে নাকি সময় শেষ?

আরেকটি বিষয় হলো–কোয়ান্টাম প্রকাশিত আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী উৎসর্গ করা হয়েছে 'মুক্তমনে সত্য জানতে আগ্রহী নতুন প্রজন্মকে'। তাই তরুণদের হাতে মর্মবাণী তুলে দেবেন, যাতে তারা সত্যকে জানতে পারে এবং সুন্দর জীবন গড়তে পারে। মর্মবাণীর শুরুতেই 'মুক্ত জীবনের পথে', 'কোরআন : সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতায় অনন্য' এবং 'কেন বিশ্বাস করব' নামে তিনটি অধ্যায় আছে, এগুলো পড়বেন। তারপর মূল কোরআনে যাবেন। কারণ আপনাকে জানতে হবে–কেন আপনি বিশ্বাস করবেন।

কোরআন অনুধাবনের এই পদক্ষেপ যত দ্রুত নেবেন, তত আপনি জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাবেন। কারণ জ্ঞানের একক কোরআন। এর সাথে আরো জ্ঞান যোগ হলে সেটা দশক শতক সহস্র হবে।

প্রশ্ন : *আমাদের নবী-রসুলরা কোনো বিপদে বা প্রয়োজনে যে দোয়াগুলো পড়তেন, আমরাও যদি একই প্রয়োজনে অনুরূপ দোয়া পড়ি, তাহলে কি তাদের মতো ফল পাব? দোয়া কবুল না হওয়ার কি কোনো কারণ থাকতে পারে? থাকলে সেটা কী?*

উত্তর : দোয়া কবুল না হওয়ার কোনো কারণ নেই, যদি আপনি সেভাবে দোয়া করতে পারেন। দোয়ার প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (স) যে কথা বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-ও একই কথা বলেছেন। আর তা হলো– 'প্রার্থনায় যা-কিছু তোমরা চাও, বিশ্বাস করবে তা পেয়েছ।' আমরা মনছবির বিষয়ে এ কথাটাই বলি– আপনি যা চান, কল্পনা করুন যে আপনি সেটা হয়ে গেছেন বা পেয়ে গেছেন।

কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো (দোয়া কবুল করব)'–*সূরা মুমিন : ৬০*। হাদীসে কুদসিতে রয়েছে–আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'বান্দা, তুমি কত চাইতে পারো? তোমরা প্রত্যেকটা মানুষ যদি চাইতে থাকো এবং তোমাদের চাওয়া অনুসারে যদি আমি দিতে থাকি, তারপরও তোমরা সবাই মিলে আমার ভাণ্ডার থেকে কতটুকু নিতে পারবে?' তিনি উদাহরণ দিয়েছেন যে, একটা সুঁইকে সমুদ্রের পানিতে ডোবালে যতটুকু পানি ঐ সুঁইয়ের গায়ের সাথে লেগে থাকে, তোমরা সকল মানুষ অতটুকুই নিতে পারবে।

আল্লাহর তো কোনোকিছুর অভাব নেই। ধরুন, আপনি মা-বাবার কাছে যখন চান, তাদের দেয়ার একটা সীমা আছে। প্রতিটি মানুষেরই সামর্থ্যের সীমা আছে। কিন্তু আল্লাহর কোনো সীমা নেই এবং এই চাওয়া বা দোয়াটাই হচ্ছে ইবাদতের নির্যাস। অতএব সবসময় চাইবেন, কারণ চাইলে আল্লাহ দেন।

তবে আপনার চাওয়াটা কী, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়শই মানুষ অকল্যাণকে কল্যাণ মনে করে চাইতে থাকে। অনেকে ধৈর্যধারণ করতে পারে না–সব এই মুহূর্তে চাই। আর দুই-তিনবার চাওয়ার পর মনে করে, আল্লাহ শুনল না। কোরআনে আছে–'(হায়!) মানুষ অনেক সময় যাতে তার অকল্যাণ হবে, এমন বিষয়ের জন্যে এত একাগ্রভাবে প্রার্থনা করে যেন সে কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করছে। আসলে মানুষ (সিদ্ধান্ত নিতে) অতিমাত্রায় তাড়াহুড়ো করে।'–*সূরা বনি ইসরাইল : ১১*

আসলে চাইতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মনে করছেন যে, এটা দেয়া প্রয়োজন। যত আন্তরিকতার সাথে চাইবেন এবং দোয়াতে একাকার হয়ে যাবেন, তত আপনার চাওয়াগুলো পাওয়ায় রূপান্তরিত হবে।

আর নবী-রসুলরা যে-সব দোয়া করেছেন তা মূলত আমাদেরকে শেখানোর জন্যে। কোন অবস্থায় আমরা কী প্রার্থনা করব, তা আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্যেই নানারকম পরিস্থিতির মধ্যে তাদের ফেলা হয়েছে। তবে দোয়া সবসময় অন্তর থেকে করবেন। যে ভাষা আপনি বোঝেন, সেই ভাষায় দোয়া করবেন। আরবিতে যদি দোয়া করেন, আপনাকে জানতে হবে–কী দোয়া পড়ছেন, কী শব্দ উচ্চারণ করছেন এবং শব্দগুলোর অর্থ কী। তাহলে আপনি দেখবেন, দোয়া কথা বলবে এবং প্রশান্তিতে আপনার হৃদয় ভরে যাবে।

প্রশ্ন : *আমি নিয়মিত ইয়োগা করি। রমজানে রোজা রেখেও কি ইয়োগা করা যাবে? কোনো আসন করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আছে কি?*

উত্তর : রমজানেও ইয়োগা চর্চা অব্যাহত রাখবেন। তবে সবসময় ব্যাকরণটাকে অনুসরণ করবেন। ইয়োগা খালি পেটে বা ভরপেটে না করাই ভালো। হালকা খাবার গ্রহণের পর ব্যায়াম করবেন।

রোজা রেখে দিনের বেলা ইয়োগা করার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি শারীরিক অসুবিধা না হয় তাহলে সেহরি খাওয়ার তিন/ চার ঘণ্টা পরেও ইয়োগা করা যেতে পারে।

শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে রমজানে সব আসন করা যেতে পারে। দিনের বেলা কয়েক দফা প্রাণায়াম করবেন। এতে শরীর পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাবে, আপনি সারাদিন প্রাণবন্ত থাকবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

চিন্তা বাস্তবতার জন্ম দেয়।
আমি সবসময় মহৎ চিন্তা করব।
আমার জীবন হবে মহান।

সাবধান! রমজানে মুনাফালিপ্সু বেনিয়াগোষ্ঠীর ফাঁদে পড়বেন না

গোটা দুনিয়াই এখন কমবেশি পুঁজিবাদের দখলে। ফলে সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে প্রায় সবকিছুরই। চিরায়ত ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোও আজ পড়েছে হুমকির মুখে। এখানেও কোনোভাবে ছাড় দিতে রাজি নয় মুনাফালিপ্সু বেনিয়াগোষ্ঠী। ধর্মীয় অনুষঙ্গগুলোতেও তারা ঠিকই খুঁজে নিয়েছে ব্যবসার রসদ। যে কারণে বিশ্বজুড়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি পবিত্র ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ মাস রমজানকে পর্যন্ত তারা বানিয়েছে তাদের আগ্রাসী বাণিজ্যের হাতিয়ার। আর আমরাও না বুঝে পা দিয়ে বসে আছি ওদের পাতা ফাঁদে।

পাশ্চাত্যে এ অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে আরো আগেই, দিনে দিনে তা আরো বাড়ছে। এর একখানা দশাসই নামও দিয়েছে তারা–রমজান অর্থনীতি।

রমজানে বিশেষ ছাড় ও ঈদ প্যাকেজ ॥ শুধু কেনো, কেনো আর কেনো

পৃথিবীজুড়ে ধর্মসচেতন মুসলিমরা রমজানে খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা ও দৈনন্দিন আচার-আচরণে সংযমী হওয়ার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ মুসলিমরাও এর ব্যতিক্রম নন। তবে তাদের সংযম প্রচেষ্টায় ভীষণ এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে যুক্তরাজ্যের সুপারমার্কেট ও ব্র্যান্ডশপগুলো। রমজান মাসে মুসলিমদের বেহিসেবী কেনাকাটা ও পণ্যাসক্তিতে প্রলুব্ধ করতে ওখানকার ব্যবসায়ীরা এঁটেছে নানা ফন্দি।

ফলে গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাজ্যে রমজান মাসে খাবার ও উপহার সামগ্রীর পেছনে ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমান সময়ে সে-দেশে রমজান অর্থনীতির আকার কমপক্ষে ২০ কোটি পাউন্ড (আমাদের মূল্যমানে প্রায় দুই হাজার তিনশ কোটি টাকা)।

ব্রিটিশ চেইন সুপারশপ *টেসকো, আজদা, স্যান্সবুরি'স* ও *মরিসন্স* হরেক রকম পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে। শুধু তা-ই নয়, তারা মুসলিমদের পছন্দের খাবারের ওপর দিচ্ছে বিশেষ ছাড়। যেমন, ২০১৮ সালে *মরিসন্স* শিশুদের আকৃষ্ট করতে দেদারসে বিক্রি করছে 'রামাদান কাউন্টডাউন ক্যালেন্ডার'।

পিছিয়ে নেই *বডি শপ* ও *গোডিভা* চকলেটসের মতো কসমেটিকস আর চকলেট বিক্রয়কারী ব্র্যান্ডগুলোও। মুসলিম ক্রেতাদের টানতে তারা ঘোষণা করেছে বিশেষ 'ঈদ উপহার প্যাকেজ'।

উদ্দেশ্য কেবলই মুনাফা

ব্রিটিশ সুপারচেইনগুলো মুসলিম ক্রেতাদের প্রতি হঠাৎ করে যে এত মনোযোগী হয়ে উঠেছে, তার পেছনে নেই কোনো উদার ধর্মীয় সহনশীলতার বালাই। বরং ব্যবসায়ীসুলভ লাভ-ক্ষতির হিসাব কষে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা চিহ্নিত করেছে, পণ্য বিক্রির জন্যে এখন সবচেয়ে লোভনীয় ও কাঙ্ক্ষিত বাজার হলো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো।

এ কারণেই ২০১৮ সালে জুন মাসে প্রথমবারের মতো ঈদ উৎসবের আয়োজন করেছে ইউরোপের বৃহত্তম শপিং সেন্টার *ওয়েস্টফিল্ড লন্ডন*। সেখানে ক্রেতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে ছিল ফ্যাশন শো থেকে শুরু করে ফুড স্টল, বিশেষ অফার ও প্রদর্শনী সবকিছুরই ব্যবস্থা। এ উৎসব আয়োজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তারা জানিয়ে দিয়েছে নিজেদের বিজ্ঞাপনেই। যেখানে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে সবচেয়ে মূল্যবান এবং এখনো পর্যন্ত অধরা সুযোগ হলো মুসলিম পাউন্ড'।

সংযমের মাসে অসংযত বিজ্ঞাপন

মানুষকে প্রলুব্ধ করার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে চোখ ধাঁধানো সব বিজ্ঞাপন। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফাস্টফুড বিপণি ম্যাকডোনাল্ডস রমজানে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশগুলোতে বিজ্ঞাপনের ভাষাও বদলে দেয়। গতবছর দুটো বার্গারের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়, McDonald's Iftar : Two Blessed! অর্থাৎ রমজানের নেয়ামতস্বরূপ এই দুটো বার্গার! অথচ স্বাস্থ্যবিদরা ফাস্টফুড ও কোল্ড ড্রিংকস থেকে দূরে থাকতে বলেন বরাবরই। তারপরও মানুষ পড়ে যায় বিজ্ঞাপনের মোহে।

রেস্টুরেন্টগুলো বলছে, Fast (In the day) and Feast (Through the night). অর্থাৎ দিনে উপবাস, রাতে খাদ্য উৎসব। মধ্যপ্রাচ্যের অনুকরণে আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে রাতভর সেহরি পার্টি। ধনাঢ্যদের জন্যে রমজান আরো জৌলুসময় করতে বিলাসবহুল হোটেলগুলোতে চলে বিশেষ ছাড়।

স্মার্টফোন ও গাড়ির ব্র্যান্ডগুলোতে দেয়া হয় বিশেষ মূল্যহ্রাস। মোবাইল অপারেটরগুলো শুরু করে নিত্যনতুন অফার–কখনো সারারাত ফ্রি ইন্টারনেট, কখনো কলরেট কম। এভাবেই পরিমিতির মাসে মানুষের অপরিমিত লোভকে ক্রমাগত উসকে দিচ্ছে বিজ্ঞাপনের জোয়ার।

বেনিয়াদের নতুন কারসাজি : হালাল ট্রেন্ড

স্টেট অব দ্য গ্লোবাল ইকোনমি রিপোর্ট অনুসারে, ২০২১ সাল নাগাদ বৈশ্বিক ইসলামিক অর্থনীতির পরিমাণ দাঁড়াবে তিন ট্রিলিয়ন ডলারে। এর নেপথ্যে আছে বেনিয়াগোষ্ঠীর নতুন চাল 'হালাল ট্রেন্ড'। আর এই হালাল সংস্কৃতির আওতায় রয়েছে খাবার, ভ্রমণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুধ, কসমেটিকস, ইসলামিক ফিন্যান্স; এমনকি হালাল মিডিয়া, বিনোদন ও ফ্যাশন!

হালাল পণ্যের এই রমরমা বাণিজ্যের তোড়ে একদিকে সাধারণ মানুষ কিনছেন, কিনছেন আর কিনছেন; অন্যদিকে ফুলেফেঁপে উঠছে গুটিকয় মুনাফালোভীর পকেট।

এসব বিবেচনায় সচেতন হওয়ার সময় এসেছে আমাদেরও। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই রমজানকে ঘিরে শুরু হয়েছে হরেক রকম প্রলোভন আর অপসংস্কৃতি। যা রমজানের মূল লক্ষ্য ও চেতনা থেকে আমাদের কেবল দূরে সরিয়েই দেয় না; বরং করে তোলে অপচয়কারী বা শয়তানের ভাই। অতএব সচেতন হোন। মহিমান্বিত রমজানে বেনিয়াগোষ্ঠীর ফাঁদ থেকে নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ২৯ এপ্রিল ২০১৮
[প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় কোয়ান্টাম বুলেটিন মে ২০১৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত ও পরিবর্ধিত]

ঈদ কেনাকাটায় আপনার করণীয়

- চেষ্টা করুন রমজানের আগেই কেনাকাটা সম্পন্ন করতে। কারণ একই মানের পণ্যসামগ্রী রমজানে কিনতে হয় কয়েকগুণ বেশি দামে।
- আবেগবশত বা চাকচিক্যে প্রভাবিত না হয়ে শুধু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই কেনাকাটা করুন।
- কম সময়ে কেনাকাটা করতে দ্রব্যসামগ্রীর লিস্ট ও সম্ভাব্য বাজেট নির্ধারণ করে নিন।
- ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকুন। ঋণ একটি ফাঁদ যা দুশ্চিন্তা, দুরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
- ফ্রি ও ডিসকাউন্টের ফাঁদে পা দেবেন না। পণ্যটি মানসম্পন্ন কিনা তা দেখে কিনুন।
- আপনাকে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় উদ্বুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম সুপারশপ। মানুষ যখন সুপারশপে থরে থরে সাজানো পণ্য দেখে, তখন সে প্রয়োজন ছাড়াই বেশি বেশি কেনে।
- দোকান/ মার্কেট বন্ধ হওয়ার সময়সীমা খেয়াল রাখুন। শেষ সময়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।
- অন্যের পছন্দ নিয়ে মন্তব্য করবেন না। নিজেও কেনার পর *দামে ঠকেছি, দেখতে ভালো হয় নি, মানাবে না*–এসব বলা থেকে বিরত থাকুন।
- কেনার মোহগ্রস্ততা ও প্রতারণা থেকে রেহাই পেতে দান করুন। সম্ভব হলে শিথিলায়ন মেডিটেশন করে শপিংয়ে বের হোন।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিন
বিনির্মাণ করুন দারিদ্র্যমুক্ত সচ্ছল দেশ

হিজরি দ্বিতীয় সন। মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করার জন্যে যাকাত ব্যবস্থা চালু করলেন। নিসাব পরিমাণ সম্পদের (নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা সমমানের নগদ অর্থ এক চান্দ্র বছর যার জমা আছে) মালিক মুসলমানরা তাদের সম্পদের আড়াই শতাংশ অর্থ যাকাত ফান্ডে দান করবে।

সংগৃহীত সঙ্ঘবদ্ধ এ দান ব্যয় হবে দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে, সুনির্ধারিত আটটি খাতে। এ ব্যবস্থা চালুর মাত্র দুই দশক পরে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের (রা) সময় আরবে যাকাত গ্রহণের মতো কাউকে পাওয়া যায় নি।

আমরা যাদের উন্নত দেশ হিসেবে বিবেচনা করি, ঋণের খপ্পরে পড়ে তাদের সবারই অবস্থা আজ নাজুক। ঋণের অর্থনীতির কল্যাণে (!) গণতন্ত্রের সূতিকাগারখ্যাত গ্রিসের সরকার দেউলিয়া হয়েছে ২০০৯ সালে। সেখানে মা-বাবারা ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে অপারগ হয়ে অনেকেই তাদের সন্তানদের তুলে দিয়েছেন দাতব্য সংস্থাগুলোর কাছে। ঋণের সওদা করতে গিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতিও হাঁটছে একই পথে।

এখন একবিংশ শতাব্দী। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ যাকাত আদায় ব্যবস্থা হতে পারে প্রজ্ঞাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। ঠিক সে-সময়ের মদীনার মতো। তাই বিচ্ছিন্নভাবে নয়, ইসলামী শরিয়ত অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায় করুন। বিনির্মাণ করুন দারিদ্র্যমুক্ত সচ্ছল দেশ।

Zakat Calculator
Android App

স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহের পর একবছর ধরে যদি আপনার কাছে ৪৫ হাজার টাকা (রুপার বর্তমান বাজার মূল্য হিসাবে) জমা থাকে, তাহলে আপনি একজন যাকাতদাতা। আপনার যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব করার জন্যে ফাউন্ডেশন প্রকাশিত যাকাত ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন।

আপনিও এগিয়ে আসুন

আপনার যাকাতযোগ্য সম্পদের একটি অংশ বা পুরোটা কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে দান করতে পারেন। সঙ্ঘবদ্ধ এ দানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে আপনি যেমন ধর্মীয় বিধান পালন করবেন, অপরদিকে সরাসরি অবদান রাখবেন দারিদ্র্য বিমোচনে। আপনার যাকাতের অর্থ দান করতে যোগাযোগ করুন–

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

রমজানে ল্যাবে এসে রক্ত দিন, বাঁচান চারটি প্রাণ

থ্যালাসেমিয়াসহ বিভিন্ন রক্তরোগে আক্রান্ত নিয়মিত রক্তগ্রহীতা এবং জরুরি চিকিৎসাসেবায় রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে কোয়ান্টাম ল্যাব বরাবরই সচেষ্ট। তাই রমজানে ল্যাবে এসে রক্ত দিন। আপনার উদ্যোগই পারে প্রতি বছরের মতো এবারও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। রোজা রেখেও আপনি রক্তদান করতে পারেন। আলেমরাও এ বিষয়ে একমত।

এ মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঁচান চারটি অমূল্য প্রাণ।

কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমের অর্থায়নে সেবামূলক কাজগুলোর একাংশ

যশোর আদর্শ বহুমুখী বিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছে সারাদেশে ৮৬০ জন শিক্ষার্থী। এ-ছাড়াও ঢাকায় রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠের ২৪৫ জন শিক্ষার্থীর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম।

যাকাতের অর্থে সেলাই, হস্তশিল্প ও নকশিকাঁথা তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৪৪৪ জন মহিলাকে। পাশাপাশি দুস্থ পরিবারগুলোকে স্বনির্ভর করে তুলতে সেলাই মেশিন কিনে দেয়া হয়েছে ৪২৯টি।

যাকাত কার্যক্রমের অর্থে ছাগল পালন করে জন্মান্ধ রনি ও রানা এখন স্বাবলম্বী। এভাবে পশুপালন ও মুরগির খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন আরো ৫৮৬ জন।

রাঙামাটিতে ভূমিধসে গৃহহীন মো. তাজুল ইসলামের পরিবারকে বাড়ি বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত গৃহনির্মাণ সেবা পেয়েছেন ২,৯৬০ জন।

রিকশা, সিএনজি, অটোবাইক ও ভ্যান কিনে দেয়া হয়েছে আবদুস সবুরের মতো ৪১ জনকে। এ-ছাড়াও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমে আরো ১৬২ জন হয়েছেন স্বাবলম্বী।

যশোরের আশিক মাহমুদ শাহীনের মতো স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়েছে ৮,১০৩ জনকে। ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা হয়েছে ৫,৯৭১ জনকে। বন্ধকী ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা হয়েছে ২,৫২৩ জনকে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মাহে রমজান সংখ্যা, মে ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

জুন ২০১৯

বরকতায়ন কার্যক্রম

মাটির ব্যাংক পৌঁছে দিন চারপাশের ৪০ ঘরে

নিয়মিত দান আনে কল্যাণ অফুরান। প্রত্যেক ধর্মেই মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে নিয়মিত দানে। আর প্রতিদিন সাধ্যমতো নীরব দানের সর্বোত্তম একটি সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

গত দুদশকেরও বেশি সময় ধরে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে জমাকৃত লক্ষ মানুষের ছোট-বড় দান বদলে দিয়েছে হাজারো দুস্থ-বঞ্চিতের জীবন। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অর্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন খাতে, যা জাতীয় উন্নয়নে সঞ্চার করেছে উল্লেখযোগ্য গতি। পাশাপাশি দাতারাও তাদের নিঃস্বার্থ দানের বরকতে লাভ করেছেন নিরাময় প্রশান্তি সাফল্য এবং কল্যাণ।

প্রিয় সুহৃদ, আপনার একটু সচেতন প্রচেষ্টা বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের বাৎসরিক সংগ্রহ। তাই বরকতায়ন কার্যক্রমে অংশ নিন। চারপাশের ৪০ ঘরে পৌঁছে দিন কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

সমাজের কল্যাণে আপনার এই সাধ্যমতো শ্রম একদিকে যেমন বদলে দেবে দুর্গত মানুষের জীবন, তেমনি মাটির ব্যাংকে দাতারাও সংযুক্ত হবেন একটি দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণের সাথে। আপনিও লাভ করবেন পরম স্রষ্টার আশীর্বাদধন্য সুস্থ সুখী পরিতৃপ্ত ও বরকতময় জীবন।

গুরুজী ও মা-জীর সাথে ঈদ মোলাকাত

ঈদের দিন, সকাল ১০টা–দুপুর ১টা আইডিইবি মিলনায়তন, কাকরাইল। আপনি সপরিবারে ও সবান্ধব আমন্ত্রিত

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

বিরক্তি ও নেতিবাচকতা বরকত নষ্ট করে

নবীজীর (স) একটি হাদীস আছে– 'কারো সম্পর্কে তোমার মনে কোনো বিদ্বেষ থাকবে না, কোনো অকল্যাণ চিন্তা থাকবে না। এটাই আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল। যে আমাকে ভালবাসল, জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।' আর অন্তরে বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা আছে কিনা তা বোঝার মানদণ্ড হলো বিরক্তি ও নেতিবাচকতা, যা কাজের বরকত নষ্ট করে দেয়। সাফল্য ও সুস্বাস্থ্যকে করে বাধাগ্রস্ত।

গত ৫ ও ৬ মে বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে একটি বিশেষ আলোচনায় একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, কাজই একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়। তাই কাজটাকে সবসময় সামনে রাখা উচিত, ব্যক্তি থাকবে নেপথ্যে। ব্যক্তি যদি কাজের সামনে চলে আসে তাহলে কাজ ব্যক্তিকে পেছনে ঠেলে দেবে। আর যদি কাজটাকে সামনে রেখে নিজে পেছনে থাকা যায়, তাহলে কাজই একসময় ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে আসে এবং সম্মানিত করে।

> প্রকৃতির আনুকূল্য সবসময় তিনিই পান–যিনি সব ধরনের বিরক্তি ও নেতিবাচকতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন।

কিছু মানুষ আছে যারা সারাদিন অনেক ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তাদের ব্যস্ততা ফলপ্রসূ হয় না। এর মূল কারণ তাদের ভেতরের বিরক্তি ও নেতিবাচকতা। এই বিরক্তি কখনো নিজের ওপর, কখনো সহকর্মী কিংবা পারিপার্শ্বিকতার ওপর, আবার কখনো-বা দেখা যায় অকারণেই। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির আনুকূল্য সবসময় তিনিই পান–যিনি সব ধরনের বিরক্তি ও নেতিবাচকতা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। তার ব্যস্ততাই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

ইতিহাস সাক্ষী, যে-কোনো প্রতিকূলতাকে যিনি যতটা সহজভাবে নিতে পারেন, বিরক্ত না হয়ে বরং সচেতনভাবে ইতিবাচক অনুরণন সৃষ্টি করতে পারেন, তার সমস্ত প্রতিকূলতা একসময় ঠিকই কেটে যায়। তিনি জয়ী হন। আর সত্য হলো, আমরা কেবল পরিশ্রমের মালিক, ফলাফলের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

কোয়ান্টাম পরিবারের সদ্যপ্রয়াত দুজন অগ্রগামী সদস্য মওলানা ছায়ীদুল হক এবং এ বি এম মাহবুবুল আলম। একজন ছিলেন ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র, অন্যজন ছিলেন প্রকৃতই একজন নেপথ্যকর্মী। এ প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে। তার কল্যাণচেতনায়। তার বিশ্বাসে, ত্যাগে ও মেহনতে। আর শুধু স্মৃতিচারণ করলেই কারো প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন হয় না। প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয় কেবল তখনই, যখন তার ভালো গুণগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকি।

দোষ-গুণ মিলেই মানুষ। ফুলে মধু যেমন আছে, তেমনি বিষও আছে। একই ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। আর মাকড়সা সংগ্রহ করে বিষ। এখানেই আসে সঠিক জীবনদৃষ্টির প্রশ্ন। জীবনদৃষ্টি যদি সঠিক হয়, তাহলে যে-কারো সৎ গুণ অনুসরণের মধ্য দিয়ে আমরাও আমাদের প্রয়াত দুই সহযোদ্ধার মতো সার্থক হয়ে উঠতে পারব। জীবন থেকে সকল বিরক্তি ও নেতিবাচকতা কাটিয়ে শুকরিয়া ও ইতিবাচকতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নিজের চিহ্ন রেখে যেতে পারব। হাজারো মানুষ আমাদের শেষ বিদায় জানাবে তাদের হৃদয়ের অশ্রুতে ও আন্তরিক ভালবাসায়।

মহাজাগতিক সফরে

এ বি এম মাহবুবুল আলম

৪ মে মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কোয়ান্টামম লামার প্রধান সমন্বয়ক এ বি এম মাহবুবুল আলম (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

৫ মে কোয়ান্টামমের মসজিদ চত্বরে নামাজে জানাজা শেষে আরোগ্যশালার কসমোড্রোমে তাকে দাফন করা হয়।

মরহুম এ বি এম মাহবুবুল আলম কোয়ান্টাম মেথডের প্রথম ব্যাচের গ্রাজুয়েট ও সপ্তম ব্যাচের প্রো-মাস্টার। ফাউন্ডেশনে তার সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল সাংগঠনিক কর্মকাঠামোতে সিস্টেম প্রণয়ন ও গতির সঞ্চার।

পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যাংকার। ব্যাংকিং দক্ষতার বাইরেও একাউন্টস, এইচআর, রিসোর্স কো-অর্ডিনেশনসহ নানা বিষয়ে তার ছিল সহজাত দক্ষতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।

২০১১ সালে ব্যাংকে ইস্তফা দিয়ে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে কোয়ান্টামে সম্পৃক্ত হন। ২০১১ থেকে ২০১৯, এই আট বছরেই কোয়ান্টামমে সম্পন্ন হয় এ যাবতকালের উল্লেখযোগ্য ও বৃহদাকার সব স্থাপনা। এ সবগুলো কাজেরই সমন্বয়ে নেতৃত্ব দেন তিনি।

স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা ছাড়াও ফাউন্ডেশন ও ফাউন্ডেশনের বাইরে তিনি রেখে গেছেন অসংখ্য গুণগ্রাহী।

আমরা এ বি এম মাহবুবুল আলমের সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

শিক্ষাবিদ ও 'আলোকিত মানুষ চাই' আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ৫ এপ্রিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনে অবস্থিত বাতিঘরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত লেখক-পাঠক আলাপনে একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

বাঁচার মতো বাঁচতে হবে

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে–'আমি সবসময় এত আশার কথা বলি, এই আশাবাদের উৎস কী?' আমি এখনো বেঁচে আছি, কাজ করতে পারছি–আমি বলব এটাই আমার আশাবাদের সবচেয়ে বড় উৎস। মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু যে কদিন আছি, বাঁচার মতো বাঁচতে হবে। মৃত্যুর আগে যেন বলতে পারি–আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করেছি। নিষ্ক্রিয় হয়ে থেমে যাই নি। ভীরুর মতো পেছন দিকে দৌড় দেই নি। আমি সামনে গেছি এবং এগিয়ে গেছি।

আমাদের শরীরের দিকে যদি তাকাই, কী দেখব? প্রতিটা অঙ্গ কোনদিকে যাওয়ার জন্যে তৈরি? সামনে না পেছনে? আমাদের হাত-পা সব সামনের দিকে। নাক সামনের দিকে। চোখ দেখে সামনে। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব সামনে যাওয়ার জন্যে তৈরি। আমরা জন্মেছি সামনে যাওয়ার জন্যে। জন্মেছি আশার জন্যে। জন্মেছি ইতিবাচকতা ও কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এবং তারপর একটা সম্মানজনক মৃত্যুর জন্যে।

আমাদের হাত-পা সব সামনের দিকে। নাক সামনের দিকে। চোখ দেখে সামনে। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব সামনে যাওয়ার জন্যে তৈরি। আমরা জন্মেছি সামনে যাওয়ার জন্যে। জন্মেছি আশার জন্যে।

গ্রিক দার্শনিক ডায়াজোনাস। সমসাময়িক তিন জন দার্শনিকের নাম উল্লেখ করে একজন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই দার্শনিকদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড়? ডায়াজোনাস উত্তর দিয়েছিলেন, আমাদের মৃত্যুই সেটা বলে দেবে। আমরা কে কীভাবে মৃত্যুকে উদযাপন করি, সেটা থেকেই বোঝা যাবে–আমাদের মধ্যে কে বড়।

যেমন, সক্রেটিস। তার মৃত্যু যদি এমন মহান না হতো তাহলে আমার ধারণা–সক্রেটিস অর্ধেক হয়ে যেতেন। অর্থাৎ যে গৌরব-গরিমায় আমরা তাকে স্মরণ করি এখনো, সেটা হতো না।

সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। তবে শর্ত দেয়া হলো যে, তুমি যদি জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দাও তাহলে আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। কিন্তু সক্রেটিস বললেন, আমি জ্ঞানচর্চা ছাড়তে পারব না।

কেন তিনি জ্ঞানচর্চা ছাড়তে পারলেন না?

সক্রেটিসের কথা হলো–একটা অথর্ব অশ্ব বা ঘোড়া, যে চলতে চায় না, এগোতে চায় না, তাকে জোরে ছুটিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা কী করি? তার গায়ে একটা ডাঁশ পোকা লাগিয়ে দেই। সেই ডাঁশ যখন কামড়াতে থাকে তখন সেই ঘোড়াটা অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে দাঁড়ায়। ক্রমাগত ছুটতে থাকে।

সক্রেটিস বলছেন, আমার চিন্তা আমার জ্ঞানচর্চা এথেন্সরূপ অথর্ব অশ্বের গায়ে সে-রকমই একটি ডাঁশ পোকা। আমি যদি এই জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত থাকি, তাহলে এথেন্স থেমে যাবে। মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই আমি আমার জ্ঞানচর্চা বন্ধ রাখতে পারব না। এর চেয়ে বরং মৃত্যুই ভালো।

মৃত্যুর মাত্র আধঘণ্টা বাকি। তখনো সক্রেটিস শিষ্যদের সাথে অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একসময় জল্লাদ এলো। হাতে হেমলক। সাধারণত যখন কোনো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে হেমলক তুলে দেয়া হতো, তারা সেটা নিতে চাইত না। আসন্ন যন্ত্রণাদগ্ধ মৃত্যুর কথা ভেবে ওটা ফেলে দিতে চাইত। চিৎকার করত। কিন্তু সক্রেটিস অত্যন্ত সহজভাবে সেটা নিলেন।

জল্লাদ তাকে শিখিয়ে দিল–এই হেমলক কীভাবে পান করতে হবে এবং বিষ শরীরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে কীভাবে আস্তে আস্তে তিনি হাঁটবেন, তারপর শুয়ে পড়বেন। একসময় একটা সাদা চাদরে মাথাসহ তার পুরো শরীর ঢেকে দেয়া হবে। অতঃপর সব শেষ!

সমবেত শিষ্যদের সামনে ঠিক ওভাবেই সবকিছু করে সক্রেটিস শুয়ে পড়লেন। সাদা চাদরে ঢেকে দেয়া হলো তাকে। হঠাৎ চাদরটা একটু সরিয়ে এক শিষ্যকে তিনি বললেন, অমুক আমার কাছে একটা মোরগের দাম পায়। একটু দিয়ে দিও।

সবাই তো আমরা মৃত্যুর কাছ থেকে পালাতে চাই। যে মানুষ ভাবে–এত পুণ্য করেছি স্বর্গলাভ নিশ্চিত, সে-ও তো মরতে চায় না। কিন্তু সেই মৃত্যুকেই কী সহজে, কী অসাধারণ ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সক্রেটিস গ্রহণ করলেন! এটা দেখে তার শিষ্য প্লেটোর তো প্রায় পাগল হওয়ার দশা। কী করে একটা মানুষ এমন ভ্রুক্ষেপহীনভাবে মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে!

উচ্চায়ত দর্শনচিন্তাসহ অনেক বড় কিছু সক্রেটিসের জীবনে ছিল। অনেক মহত্তর কথা ও কাজ আমরা তার জীবন থেকে পাই। কিন্তু আমি মনে করি, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তার মৃত্যু। এ থেকে আমার মনে হয় যে, মৃত্যুকে আমরা কতটা মহিমান্বিত করতে পারি, সেটাই আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন হওয়া উচিত। এবং এটা সম্ভব কেবল আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে। সক্রেটিস যে এটা পেরেছিলেন, তার কারণ, তিনি জানতেন যে, তার যা করার ছিল তা তিনি করেছেন। অর্থাৎ জীবনের সর্বোচ্চ ব্যবহার তিনি করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা তখন পাবনায় থাকি। এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ছিলেন ওখানে। ১৯৫২ সালে কোরিয়ায় পাট রপ্তানি করে তিনি হঠাৎ এক কোটি টাকা লাভ করে ফেললেন। আজকের হিসেবে ১৫০ কোটি তো হবেই কমপক্ষে। এটা শুনে পাড়ার লোকজন গিয়েছে তাকে অভিনন্দন জানাতে–কেয়া মুনাফা হো গ্যায়া, কিতনা খুশি কি বাত হ্যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক সব শুনছেন কিন্তু তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই। ক্রমাগত পান চিবোচ্ছেন আর বলছেন, হাঁ হইতেছে, মুনাফা হইতেছে কুছু কুছু ...।

পরের বছরই ঘটল উল্টো ব্যাপার। ব্যবসায় ৮০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে গেল তার। এবার সবাই গিয়ে বলছে, কিতনা লোকসান হো গ্যায়া, আফসোস কি বাত হ্যায় ...। কিন্তু দেখা গেল, তিনি ঠিক আগের মতোই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পান চিবোচ্ছেন আর বলছেন, হাঁ হইতেছে, লোকসান হইতেছে কুছু কুছু ...। মোদ্দা কথা, এসব কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না।

আমারও বক্তব্য হচ্ছে তা-ই। কোথায় উঠলাম আর কোথায় নামলাম–সেটা কোনো ঘটনা নয়। বরং আমি আমার কাজ নিয়ে সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি কিনা, সেটাই একমাত্র বিবেচ্য। উত্থান-পতন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল কথা হলো, আমার কাজটা আমি সর্বোচ্চ চেষ্টায় করছি কিনা। সেটা যদি করি তাহলে সক্রেটিসের মতো আমরাও পারব মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে, মৃত্যুকে সত্যিকার অর্থে মহিমান্বিত করে তুলতে।

দুধ-চায়ের আসক্তি কাটিয়ে উঠছে বাংলাদেশ

২০১৩ থেকে ২০১৮। পাঁচ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে গ্রিন টি-র ব্যবহার বেড়েছে চার গুণেরও বেশি। সাধারণ মানুষ এখন আগের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যসচেতন। তাই তাদের খাদ্যাভ্যাসে এসেছে ইতিবাচক এ পরিবর্তন। রাজধানী ঢাকার অফিস-আদালত থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের টং দোকান, সর্বত্র ছিল দুধ-চায়ের জয়জয়কার। নব্বই দশকের গোড়ায় কোয়ান্টাম দুধ-চা পানের স্বাস্থ্যগত অপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে শুরু করে। তখন বহু ঘোরাঘুরির পর কোনো চায়ের দোকানে রং-চায়ের সন্ধান পাওয়া ছিল বিরল ঘটনা।

কারণ চা বলতেই বাঙালি বুঝত ঘন দুধ, চা-পাতা আর পর্যাপ্ত চিনির মিশেলে তৈরি সুস্বাদু এক পানীয়। মজার বিষয় হলো, ৭০-৮০ বছর আগে চায়ের ব্যাপারে বাঙালির বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। দুধ-চা এদেশে কীভাবে সর্বজনীন পানীয়ে পরিণত হলো সেই ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

বাঙালির হেঁশেলে চায়ের অনুপ্রবেশ

ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন শুরু হয় ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারা যখন দেখল ইউরোপের চাহিদা মেটানোর পরও বিপুল পরিমাণ চা রয়ে যাচ্ছে, তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয়, এ অঞ্চলের মানুষকে চায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। ১৯৪০-এর দশকে ঢাকাবাসীকে চা পানে অভ্যস্ত (নাকি আসক্ত?) করার জন্যে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা অভিনব উপায় বের করে।

পুরনো ঢাকায় তারা কয়েকজন চা-ওয়ালা নিয়োগ করে। এরা প্রতিদিন রাস্তার পাশে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চা তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত থাকত। সবাইকে বিনামূল্যে চা পরিবেশন করা হতো। নতুন এসব গ্রাহকের কাছে চা-কে সুস্বাদু পানীয় হিসেবে জনপ্রিয় করার জন্যে চা-ওয়ালারা বেশি করে দুধ ও চিনি মেশাত। যেসব ক্রেতা চায়ের প্রতি অধিক আগ্রহ দেখাত, কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী চা-ওয়ালারা তাদের কিছু শুকনো চায়ের পাতাও দিত।

সেইসাথে চা উৎপাদনকারী ব্রিটিশ কোম্পানি ঢাকার কয়েকটি স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে শিক্ষার্থীদের বিনা পয়সায় চা দেয়া শুরু করল। এই কার্যক্রম চলল টানা একবছর। তারপর বিনামূল্যে চা বিতরণ বন্ধ হলো। কিন্তু ইতোমধ্যেই ঢাকাবাসী চায়ে আসক্ত হয়ে গেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠেছে চায়ের আজীবন ভোক্তা! কোম্পানি তখন পাড়ার মুদি দোকানে চা-পাতা সরবরাহ শুরু করল। কিনে খাও।

একপর্যায়ে অনেক মানুষ যখন চা পানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল তখন মহল্লার দোকান থেকে নামী রেস্টুরেন্ট–সর্বত্র চা পরিবেশন চালু হয়ে গেল। অচিরেই ব্যাঙের ছাতার মতো ছোট ছোট চায়ের দোকানে ছেয়ে গেল ঢাকা শহর। দুর্বার গতিতে চলল চায়ের জয়যাত্রা। কিন্তু চায়ের সাথে দুধের মিশেল মোটেও স্বাভাবিক নয়। বরং আপনার পাকস্থলী বেচারার জন্যে অতি অস্বাভাবিক।

চা : একটি স্বাস্থ্যকর পানীয়

চায়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর এন্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও অন্যান্য যৌগ, যা ক্যান্সার হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে; স্থূলতা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে এবং মস্তিষ্ককে সতেজ চনমনে করে।

২০০৭ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ১৬ জন নারীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তাদেরকে রং-চা, দুধ-চা ও গরম পানি পান করতে দেন গবেষকরা। এরপর রক্তনালীর ওপর পানীয়গুলোর প্রভাব মাপা হলো। দেখা গেল, গরম পানির তুলনায় রং-চা রক্তনালীর প্রসারণ ঘটাতে অধিক কার্যকরী। কারণ চা-তে থাকে ক্যাটেচিন নামক এন্টি-অক্সিডেন্ট। হৃৎসুরক্ষায় যা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবে যদি চায়ের সাথে দুধ মেশানো হয়, দুধের মধ্যে থাকা কেজিন নামক প্রোটিন নষ্ট করে দেয় ক্যাটেচিনের উপকারী প্রভাব।

ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে গবেষকরা জানান, ব্রিটিশরা পৃথিবীর শীর্ষ চা পানকারী জাতিগুলোর একটি। তবু তাদের হৃদরোগ প্রতিরোধে চা কোনো অবদান রাখছে না। কারণ প্রায় ৯৮ শতাংশ ব্রিটিশ দুধ-চা পানে অভ্যস্ত। গবেষক দলের প্রধান ও কার্ডিওলজির অধ্যাপক ভেরেনা স্ট্যাঙ্গল বলেন, দুধ মেশালে চায়ের টিউমার-প্রতিরোধী উপাদানের কার্যকারিতাও ব্যাহত হয়।

২০১২ সালে আরেক দল গবেষক চায়ের সাথে ডেইরি দুধের পরিবর্তে সয়াদুধ মিশিয়ে পরীক্ষাটি চালান। দেখা যায়, ফলাফলে কোনো হেরফের নেই। চায়ের সাথে যে-ধরনের দুধই মেশানো হোক না কেন, চায়ের গুণাগুণ বিনষ্ট হবেই।

চায়ে দুধ না হয় না মেশালেন। একটু চিনি মেশালে কি ক্ষতি হবে? হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর অধ্যাপক কী সান বলেন, গ্রিন টি পানের উপকারিতা পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেয় চিনি।

এসব গবেষণালব্ধ তথ্য দৈনিক সংবাদপত্র, অনলাইন হেলথ ব্লগ, স্বাস্থ্যবিষয়ক টিভি প্রোগ্রামে আজকাল হরদম প্রচার করা হচ্ছে। আর কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা দুধ-চা পানের অপকারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সেই ১৯৯৫ সাল থেকে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে সঠিক খাদ্যাভ্যাস-বিষয়ক আলোচনায় গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বলেন, দুধ ও চা–দুটিই উপকারী পানীয়। কিন্তু এ দুটোকে একসাথে মেশালে এমন একটি যৌগ উৎপন্ন হয় যা পাকস্থলী হজম করতে পারে না। ফলে কেউ পর পর ৮-১০ কাপ দুধ-চা খেলে তিনি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হবেন। আর রং-চা পান করলে এনার্জি লেভেল বেড়ে যাবে। রং-চায়ের চেয়েও উপকারী হলো গ্রিন টি।

কোয়ান্টাম সদস্যরা তাই নিজেরা যেমন দুধ-চা পরিহার করেছেন, পরিচিতদেরও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলেছেন। ২৫ বছরের এই নীরব প্রচেষ্টার প্রতিফলন এখন জনজীবনে দৃশ্যমান।

অন্যদিকে ডায়াবেটিস প্রতিরোধে চা কোনো ভূমিকা রাখে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার। তারা দেখেন, চায়ের প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে তুলনামূলক ১৫ গুণ বেশি ইনসুলিন নিঃসৃত হয়। কিন্তু চায়ে দুধ মেশালে ঘটে উল্টোটা, ইনসুলিন নিঃসরণের হার কমতে থাকে। চায়ে যদি ৫০ গ্রাম দুধ মেশানো হয়, তাহলে ইনসুলিনের নিঃসরণ শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতাও মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তাই নিয়মিত দুধ-চা পান করার অভ্যাস ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার মোক্ষম উপায়!

সাম্প্রতিককালে একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, গ্রিন টি শরীরের মেটাবলিজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। নেদারল্যান্ডের ম্যাসট্রিক্ট ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের গবেষক রিক হার্সেল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালিয়ে জানিয়েছেন, চায়ের কাপে যখন দুধ ঢালা হয়, মেটাবলিজম প্রক্রিয়ার ওপর গ্রিন টির ইতিবাচক প্রভাব উধাও হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ক্রমেই বড় হচ্ছে গ্রিন টির বাজার

স্বাস্থ্যসচেতন মানুষদের অনেকেই সকালটা শুরু করেন দুধ-চিনিহীন চা দিয়ে। যারা আরো সচেতন তারা বেছে নিচ্ছেন গ্রিন টি। চা পানের অভ্যাসে এই পরিবর্তন এসেছে কয়েক বছরের মধ্যে। সাধারণ চায়ের চাহিদা যেখানে বাড়ছে ৫ শতাংশ হারে, গ্রিন টির চাহিদা বাড়ছে ১৫ শতাংশ হারে। পাঁচ বছর আগেও বাংলাদেশে গ্রিন টি উৎপাদন করত মাত্র দুটি কোম্পানি। চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, এখন ছয়টি কোম্পানি সবুজ চা বাজারজাত করছে।

বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩,১৭০ কেজি গ্রিন টি আমদানি করা হয়েছিল। গত অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ২৩,৫১০ কেজি! এ দেশের মানুষ দুধ-চায়ের বিষাক্ত প্রভাব অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পারবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং, সেপ্টেম্বর ২০১৪
দ্য গার্ডিয়ান, ৯ জানুয়ারি ২০০৭
নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১২
দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ এপ্রিল ২০১৯
বণিক বার্তা, ১৫ মে ২০১৪

নিয়মিত দান আনে কল্যাণ অফুরান

...(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না। (আল কোরআন, ২:২৭২)

দানের পুরস্কার বা প্রতিদান দাতাকে অবশ্যই দেয়া হবে–এটা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার অঙ্গীকার। আর কেবল পরলোকে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও একজন দাতা নানাভাবে অনুভব করেন দানের বহুমুখী বরকত ও কল্যাণ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে নিয়মিত দান করেন যারা, তাদেরই কয়েকজনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো—

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়েছে

ডা. মো. হুমায়ুন কবির

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মাটির ব্যাংকে দান প্রসঙ্গে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি উদ্বুদ্ধ হই। দান করার সময় আমি আল্লাহর কাছে প্রবৃদ্ধি চাইতাম যেন আরো দান করতে পারি। সত্যিই আমি প্রতিনিয়ত দানের পরিমাণ বাড়াতে পেরেছি। এ-ছাড়া সৎসঙ্গে থাকার ফলে আমার পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মানসিক অস্থিরতা থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।

সন্তানের সার্বিক কল্যাণের নিয়তে আমার সহধর্মিণী একটি আত্মিক শিশুর আংশিক দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের সন্তান এখন আগের চেয়ে অনেক প্রশান্ত ও মনোযোগী। আমাদের পরিবারে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ বেড়েছে। *[মেডিকেল অফিসার, এস কিউ সেলসিয়াস লি., গাজীপুর]*

নিয়মিত দান আমার জীবন বদলে দিয়েছে

মো. ওয়াহিদুজ্জামান

২০১৩ সালে এক বন্ধু আমাকে কোয়ান্টামের একটি মাটির ব্যাংক দেয়। নিয়মিত দানের ফলে আমার জীবনে বেশ পরিবর্তন এসেছে। আমি ঋণ জর্জরিত ছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে ঋণের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

কোর্স করার পর ঋণমুক্তির নিয়তে আমি নিয়মিত দান করতে শুরু করলাম। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমি ঋণের সব টাকা শোধ করে দিলাম। দান করে দিন শুরু করা এখন আমার পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ। এর ফলে আমার পরিবারে আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছে। আমি মনে করি, যেদিন থেকে দান শুরু করেছি আমার জীবন বদলের সূচনা সেদিন থেকেই। *[প্রভাষক, বর্ণমালা আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

সপরিবারে ট্যুরিস্ট ভিসা পেয়েছি

মনি সাহা

আমার এক বোন আমেরিকায় থাকে। অনেকদিন ধরেই আমরা আমেরিকায় বেড়াতে যেতে চাচ্ছিলাম। পরিচিত সবাই বলত, আমেরিকার ভিসা পাওয়াটা বেশ কঠিন।

এবছর আমরা পুরো পরিবার ট্যুরিস্ট ভিসার জন্যে আবেদন করি। ইন্টারভিউয়ের দিন ভিসা কর্মকর্তারা আমাদের তেমন কোনো প্রশ্নই করেন নি এবং সেদিনই আমাদের চার জনের ভিসা হয়ে যায়।

সবসময় আমি ঘর থেকে বের হওয়ার আগে মাটির ব্যাংকে দান করি। আমার বিশ্বাস, এত সহজে আমাদের ভিসা হয়ে যাওয়াটা এই দানেরই সুফল। বিপদ-আপদে আমি মাটির ব্যাংকে দানের উপকার পেয়েছি বহুবার। *[গৃহিণী]*

হারিয়ে যাওয়া কাগজপত্র ফেরত পেলাম

আশরাফুন নাহার

গত বছর ঢাকায় বেড়াতে এসে আমার ব্যাগ চুরি হয়। ব্যাগে আমার জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অফিসের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ ছিল। এরপর আমি মাটির ব্যাংকে সাধ্যমতো দান করি যেন হারিয়ে যাওয়া কাগজগুলো আমি ফিরে পাই।

সেদিন রাতেই এক ব্যক্তি আমাকে ফোন করে জানান যে, তিনি একটি ব্যাগ পেয়েছেন যাতে আমার আইডি কার্ড ও ফোন নম্বর খুঁজে পেয়েছেন। পরের দিন তিনি বাসায় এসে ব্যাগটি ফেরত দিয়ে যান। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম এবং আরেকবার আমি উপলব্ধি করলাম দানের গুরুত্ব।

[চাইল্ড ডেভেলপমেন্টাল থেরাপিস্ট, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল]

তিনটি আত্মিক শিশুর দায়িত্ব নিয়েছি

মেজর (অব.) এ কে এম আসাদুল হক

২০১৫ সাল থেকে আমি এতিমান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুদের শিক্ষা ও ক্রীড়ায় দেশসেরা সাফল্যের কথা যতবারই শুনি, আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

২০১৮ সালে গুরুজী একটি প্রোগ্রামে বললেন, দানের চেয়ে দায়িত্ব অনেক বড়। সেদিন সিদ্ধান্ত নিই– আমি একটি শিশুর পুরো দায়িত্ব নেব। কিছু দ্বিধা থাকলেও আমি সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। পরদিনই জানতে পারলাম, আমার বেতন ১০% বেড়ে গেছে! সাথে সাথে স্রষ্টার নিকট শুকরিয়া আদায় করলাম। মাস শেষে হিসাব করে দেখলাম, তিনটি শিশুর দায়িত্ব আমি নিতে পারছি।

একপর্যায়ে আমার অফিসে কিছু জটিলতা শুরু হলো। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু স্রষ্টার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি আরো ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পেলাম। এখন আমি বেতনও পাচ্ছি দ্বিগুণ। দান আমার জীবনের সাথে সম্পূর্ণ জড়িয়ে গেছে।

[হেড অব ম্যানড সিকিউরিটি সার্ভিসেস, গার্দা শিল্ড, ঢাকা]

বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত থাকছি দানের বরকতে

নুরজাহান বেগম

২০১৭ সালের ঘটনা। অফিস শেষে বাড়ি ফেরার সময় হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। আমার সঙ্গে সেদিন ছাতা ছিল না বলে অফিসের নিচেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। অফিস বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় নির্মাণ কাজ চলছিল। বৃষ্টির জন্যে কোনো রিকশা পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো, একটু সামনে এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালে রিকশা পাব। কয়েক পা এগিয়ে আমি রাস্তার ধারে দাঁড়ালাম।

তখনই আমার অফিস বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে বেশ কয়েকটি ইট নিচে পড়ল, ঠিক যে জায়গায় আমি একটু আগে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। আল্লাহ তায়ালার অশেষ করুণা, এভাবেই তিনি বালা-মুসিবত ও দুর্ঘটনা থেকে আমাকে ও আমার পরিবারকে রক্ষা করে চলেছেন।

দীর্ঘদিন ধরে আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। সৃষ্টির সেবায় মাটির ব্যাংক বিতরণ করতে আমার ভালো লাগে। হাতে টাকা এলেই তার একটি অংশ আমি দানের জন্যে আলাদা করে রাখি। তারপর বাকি অংশ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করি। আমার জীবনে দানের উপকারিতা ও সাফল্য অনেক।

[চাকরিজীবী]

এতিমের দায়িত্ব নিয়ে আমার প্রশান্তি বেড়েছে

ইসরাত জাহান কাকলী

২০১৮ সালে আমার বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ল। একথা শুনে পরিবারের সদস্যরা বিচলিত হয়ে পড়ল।

বাবার চিকিৎসা শুরু হলো। উন্নত চিকিৎসার জন্যে আমি তাকে নিয়ে বিদেশে যেতে চাইলাম। আমার মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। একসময় ভাবলাম, আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। তাহলে আমার টেনশন হচ্ছে কেন?

এরপর একদিন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শাহবাগ কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারলাম–কয়েকজন মিলে একটি অসহায় শিশুর দায়িত্ব নেয়া যাবে। আমারও ইচ্ছা ছিল, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একটি শিশুর দায়িত্ব নেব। কিন্তু প্রতি মাসে আট হাজার টাকা দেয়াটা আমার জন্যে কঠিন ছিল। কিন্তু এবার আংশিকভাবে দায়িত্ব নিতে পারলাম।

এদিকে বাবাকে বিদেশে নেয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ কিছু টেস্ট করাতে হলো। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি–যেদিন আমি একজন এতিমের দায়িত্ব নিলাম, সেদিনই শুনলাম, বাবার ক্যান্সার হয় নি। অর্থাৎ পূর্বের রিপোর্টগুলো ভুল ছিল। গভীর শুকরিয়ায় মন ভরে গেল। এতিমের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে আমার প্রশান্তি আরো বেড়ে গেছে।

[সহকারী অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

দান ও মেডিটেশন চর্চা আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে

ডা. জিনাত হাবিবা

আমি আগে প্রায়ই সর্দি-কাশিতে ভুগতাম। মাসে ১০-১৫ দিনই আমার এই সমস্যা থাকত। ২০১২ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমি নিয়মিত মেডিটেশন ও দান করতে উদ্বুদ্ধ হই। এরপর ধীরে ধীরে আমার এ সমস্যাটা দূর হয়ে যায়।

সুস্থতার পাশাপাশি দানের কল্যাণে আমি পেয়েছি মানসিক প্রশান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। তাই কোনো কাজ যতই কঠিন হোক, আমার কাছে সেটা খুব সহজ হয়ে যায়। যেমন, ডাক্তারদের জন্যে এফসিপিএস একটি কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু আমি ভাইভাসহ এ পরীক্ষার সবগুলো পর্বে প্রশান্তচিত্তে অংশ নিয়েছি এবং পাশ করেছি। কোনো পরীক্ষাভীতি আমার মধ্যে কাজ করে নি। নিয়মিত দান ও মেডিটেশন চর্চা বাড়িয়ে দিয়েছে আমার আত্মবিশ্বাস।

[স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা]

প্রতিটি ধর্মেই দানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

খগেন্দ্র নাথ সরকার

স্পন্ডিলাইটিসের সমস্যার কারণে আমার বাম হাত প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। একগ্লাস পানিও তুলতে পারতাম না। নিজেকে সবসময় একজন রোগী মনে হতো। ২০১২ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই এবং মেডিটেশন ও দানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করি। তখন থেকেই আমার জীবনে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মেডিটেশনের পাশাপাশি সুস্থতার নিয়তে মাটির ব্যাংকে আমি দান করতে শুরু করি। প্রভুর কৃপায় কিছুদিনের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলাম। তখন থেকেই আমি মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করছি।

২০১৮ সালে আমি একজন এতিমের আংশিক দায়িত্ব নিয়েছি। তারপর থেকে আমার উপার্জনও বেড়ে গেছে। আসলে দান করলে যে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়, তার সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তাই প্রতি মাসেই আমি এতিমান কার্যক্রমে অল্প হলেও দান বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

আর প্রতিটি ধর্মেই খুব স্পষ্টভাবে দানের কথা বলা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার আত্মিক উন্নয়ন ও মানসিক প্রশান্তির উৎস সৎদান।

[ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

কল্যাণকর চাওয়া পূরণের সহায়ক শক্তি হলো দান

ফারজানা আহমেদ

২০১৭ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর থেকেই নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করি। পারিবারিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যা ছিল আমার। যার জন্যে আমার মধ্যে হতাশা কাজ করত। প্রতিদিন সকালে নাশতা করার আগে পারিবারিক প্রশান্তির জন্যে মাটির ব্যাংকে দান করতে থাকি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ধীরে ধীরে আমার পরিবারে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। আমরা সবাই এখন অনেক ভালো আছি।

যশোরে আমার একটি বড় ফ্ল্যাট বুকিং দেয়া ছিল। কিন্তু কোম্পানি এর পরিবর্তে ১১৩২ বর্গফুটের ছোট একটি ফ্ল্যাট দেয়। এটা নিয়ে আমার বেশ মন খারাপ হয়। এবছর সেই বিল্ডিংয়ের ডিজাইন নিয়ে তদন্ত হয়। কোম্পানিকে পুরো বিল্ডিংয়ের ডিজাইন পরিবর্তন করতে হয়। ফলে একটি ইউনিটের কয়েকটি ফ্ল্যাটের আয়তন বাড়াতে হয়। সেই ইউনিটের আওতায় আমার ফ্ল্যাটটিও আছে। আমার বিশ্বাস, সকল কল্যাণকর ইচ্ছা পূরণে দানই সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

[গৃহিণী]

নিয়মিত দানের ফলে টেনশন দূর হয়েছে

মো. আলামিন

আমি একটি বহুজাতিক কোম্পানির বিক্রয় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছি। কোনো কাজ করতে গেলে আগে টেনশনে থাকতাম–এই বুঝি কোনো ভুল হয়ে গেল! আমি এই টেনশন অফিস থেকে বাসায় বয়ে নিয়ে যেতাম। বাসায় গিয়েও টেনশন হতো, কোনো কাজ ভুল করলাম না তো!

২০১৬ সালে যখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম তখন মাথা ঠান্ডা রাখতে শিখলাম। আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। এরপর নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দানের মাধ্যমে দূর হতে থাকল কাজের টেনশন। এখন কাজে ভুলের পরিমাণ কমে গেছে এবং কাজ করতে গিয়ে কোনো টেনশন হয় না। সারাদিন হাসিখুশি থাকতে পারি। নিয়মিত দানের ফলে লাভ করেছি সুস্থতা। আমার সহকর্মীরা যেখানে অসুস্থ হয়ে প্রায়ই ছুটি নিচ্ছে, আমি সেখানে অসুস্থতার জন্যে আজ পর্যন্ত কোনো ছুটি নিই নি।

মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করে বড় যে উপকার পেয়েছি তা হলো, বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি। আমি জানি, দান অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। যখন মাটির ব্যাংকে দান করি তখন এই অনুভূতি নিয়ে দান করি যে, আমার সকল বালা-মুসিবত দূর হচ্ছে।

[সিনিয়র ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ, মেটলাইফ, যশোর]

দান এবং দায়িত্বের বরকত এসেছে পরিবারে

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

২০১৩ সালে একটি আলোচনায় শুনেছিলাম–একজন শিশুর দায়িত্ব নেয়ার কথা। আমার মেয়ের ভালো পড়াশোনার নিয়তে আমি আংশিকভাবে একটি শিশুর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সময়মতো প্রতিটি পড়া শেষ করতে তার কষ্ট হতো। এ নিয়ে সে স্ট্রেসে ভুগত। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার মেয়ে এখন বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

পরবর্তী বছরগুলোতে এ দানের পরিমাণ বাড়ানোর পথ আল্লাহ আমার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ২০১৮ সালে আমি এককভাবে লামার একটি শিশুর দায়িত্ব নিতে পেরেছি।

২০১৬ সালে মাটির ব্যাংক করসেবা চলছিল। আমি চাকরির নিয়তে সেই করসেবায় অংশ নিই। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ভালো একটি চাকরি পাই। দানের বরকত আমার পরিবারে সবসময় বিরাজমান।

[প্রোগ্রাম অফিসার, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, কান্ট্রি অফিস ফর বাংলাদেশ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমরা যারা ধ্যানের পরিবেশে মাঝে মাঝে কয়েকদিন থাকতে চাই, তাদের জন্যে একটা কোয়ান্টাম হোম করা যায় না? ঢাকা শহরে এরকম ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।*

উত্তর : মাঝে মাঝে কয়েকদিন ধ্যানের পরিবেশে থাকতে চাই–এই চিন্তাটাই হচ্ছে একটা অন্তঃসারশূন্য চিন্তা অর্থাৎ যে চিন্তার মধ্যে বাস্তবতার চিহ্ন নেই। আপনি যদি কোয়ান্টামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে ধারণ করতে পারেন, যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে আপনি ধ্যানের পরিবেশে থাকতে পারবেন। জনারণ্যেও আপনি একা থাকতে পারবেন, কোনোকিছু আপনাকে স্পর্শ করবে না।

আপনি ভাবছেন, নিরিবিলি পরিমণ্ডলে থাকলে আপনি সুখী হবেন। কিন্তু সুখ তো অন্তরের ব্যাপার। যে-কোনো পরিবেশেই আপনি প্রশান্তিতে থাকতে পারেন, ধ্যানের স্তরে থাকতে পারেন। এর জন্যে দরকার আপনার ইচ্ছা ও মানসিক সুস্থিরতা।

বহু বছর আগে আমি একজন লেখককে দেখেছি–তিনি লিখছেন, এক সন্তান তার ঘাড়ের ওপরে চড়ে বসে আছে এবং চুল ধরে টানছে। আরেকজন তার পাশে দৌড়াদৌড়ি করছে। কিন্তু তিনি লিখে চলেছেন। কেন পেরেছেন? কারণ তিনি লেখার মধ্যেই এত মগ্ন ও ধ্যানস্থ যে, কে ঘাড়ের ওপর বসে থাকল, কে চুল ধরে টানল, এসব কিছুই তাকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু আমরা সেই স্তরে থাকতে পারি না। একটু এদিক থেকে সেদিক হলেই আমরা প্রভাবিত হয়ে যাই, বিরক্ত হয়ে পড়ি। বিরক্তি আসাটা স্বাভাবিক কিন্তু সেটা জয় করতে পারাই হচ্ছে ধ্যান। আর সেই স্তরে যাওয়ার জন্যে ক্রমাগত অনুশীলন প্রয়োজন।

আসলে ভেতর থেকে প্রশান্ত হতে না পারলে বাইরের কোনো পরিবেশ আপনাকে প্রশান্ত রাখতে পারবে না। সুন্দর পরিবেশে যাবেন, যতক্ষণ সেখানে থাকবেন ক্ষণিকের জন্যে আপনি প্রশান্তি পেলেন, কিন্তু যেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, আবার দেখা যাবে অশান্ত হয়ে উঠবেন।

কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে আমাদের হাজারো সদস্য সমবেত হন। অডিটোরিয়ামের বাইরে কখনো কখনো অনেক ধরনের শব্দ আর হৈ-হল্লা শোনা যায়। আমরা তো সেই কোলাহলের মধ্যেই মেডিটেশন করি। আমরা যখন ধ্যানের স্তরে চলে যাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব আমাদের স্পর্শ করে না। অতএব আপনাকে সবসময় জানতে হবে, কীভাবে চারপাশের সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও আপনি আপনার প্রশান্তি অটুট রাখতে পারেন।

একটা কথা আছে, কাক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে কিন্তু ওটা যেন মাথায় বাসা না বাঁধে। ঠিক তেমনি জীবনে দুশ্চিন্তা আসবে, দুর্ভাবনা আসবে, বিরক্তি আসবে কিন্তু সেটা যেন আপনার প্রশান্তি নষ্টের কারণ না হয়।

রাগ আসবে, ঈর্ষা আসবে, কখনো আরেকজনকে দেখলে মনে হতে পারে–আমারও যদি এরকম হতো! যেমন : কারো সুন্দর চুল দেখে একটু ঈর্ষা আসতেই পারে কিন্তু সেই ঈর্ষাটা যেন মনে বাসা না বাঁধে। যখনই মনে হলো যে, তার চুলটা খুব সুন্দর, সাথে সাথে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন যে, আল্লাহ তুমি তাকে সুন্দর চুল দিয়েছ, এই চুলটা যেন এমনই সুন্দর থাকে। অর্থাৎ ঈর্ষা আসার সাথে সাথে যখন আপনি দোয়া করলেন তখন আপনার পাপটা পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। দৃষ্টিভঙ্গিটা হতে হবে এরকম। সবসময় অন্যের ভালো দেখে আনন্দিত হবেন। তাহলে আপনার জীবনেও বরকত আসবে।

জীবনে ভালো থাকার এসব সূত্র যদি একবার বুঝতে পারেন, কোনো দুশ্চিন্তাই আপনার প্রশান্তি নষ্টের কারণ হবে না। এটা তখনই সম্ভব, যখন আপনি অন্তরে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন। বাইরের নেতিবাচকতা তখন আপনাকে প্রভাবিত করবে না।

প্রশ্ন : *আমি চিত্রকলায় আগ্রহী। আমি কি চিত্রশিল্পী এম এফ হুসেন স্যারকে আমার জীবনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? দয়া করে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন।*

উত্তর : এম এফ হুসেনের (মকবুল ফিদা হুসেন) চিত্রকলায় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন সিনেমার হোর্ডিং অর্থাৎ সিনেমা হলের বাইরে যে বিশাল বিশাল পোস্টার, সেই হোর্ডিং পেইন্টারের সহযোগী হিসেবে। ওস্তাদকে রং এগিয়ে দিতেন, এই ছিল তার কাজ। তুলি ধরার অনুমতি পেতেই লেগে যায় তিন-চার বছর। সেখান থেকে একজন মানুষ এত বড় শিল্পী হয়েছেন। অর্থাৎ তার কাজটাকে কত ভালবেসেছেন তিনি!

সাধারণভাবে আমরা যখন কাউকে মডেল করতে চাই তখন তার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ আর বাহ্যিক অবয়বটাকেই মডেল বানিয়ে ফেলি। আসলে মডেল কিন্তু ব্যক্তির চেহারা বা পোশাক নয়। যেমন, সাধারণ মানুষ সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের মতো সাজে। চুল কাটে, গোঁফ রাখে। কিন্তু মডেল মানে কি তা-ই?

মডেল হলো একজন মানুষের কাজ, তার আদর্শ। যা তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যে, আজ আপনি তাকে জীবনের মডেল করতে চাইছেন।

যেমন, পাবলো পিকাসো। তিনি একবার এক ফার্নিচারের দোকানে গেলেন। একটা কাগজে তার কাঙ্ক্ষিত ফার্নিচারের ডিজাইন এঁকে দিয়ে দোকানিকে বললেন, এটা তৈরি করে দিতে হবে। কত দাম পড়বে? দোকানের মালিক পিকাসোকে চিনত। পিকাসোর খ্যাতি সম্পর্কে জানত। সে বলল, স্যার, আপনি যে কাগজে ডিজাইনটা এঁকে দিয়েছেন, এখানে একটা সই করে দিন শুধু। দাম লাগবে না। ফার্নিচার আপনার বাসায় পৌঁছে যাবে। পিকাসো সই করে দিলেন। দোকানদার কাগজটা বাঁধাই করে দোকানের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখল।

অর্থাৎ পিকাসোর সিগনেচারটাই হচ্ছে ফার্নিচারের দাম। একটা সই করলেন, পুরো ফার্নিচার ফ্রি হয়ে গেল। এটা কখন হয়? যখন একজন মানুষ পিকাসো হতে পারে। পিকাসোর একটা কথা ছিল–'মুসলমানরা যে-রকম জুতা বাইরে রেখে মসজিদে ঢোকে, আমিও সে-রকম স্টুডিওতে ঢোকার সময় দেহটা বাইরে রেখে শুধু মনটা নিয়ে ঢুকি।' অর্থাৎ তখন তার দেহ বলে কিছু নেই, শুধুই ছবি আঁকার চিন্তা। এজন্যেই তিনি পিকাসো।

তাই যখন কাউকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করবেন–তার কর্ম, গুণ ও আদর্শটাকে গ্রহণ করবেন, তার পোশাক বা অবয়ব নয়। বেশিরভাগ মানুষই অনুসরণ না করে অনুকরণ করতে চায়। কিন্তু অনুকরণ তো বাঁদরের বিশেষত্ব।

যারা খ্যাতিমান হয়েছেন তারা তাদের কর্ম ও গুণের কারণেই তা হয়েছেন। গুণই মানুষকে সম্মানিত করে। কিন্তু গুণের দিকে নয়, অনেক সময় আমাদের নজর চলে যায় তাদের অপকর্মের দিকে। কারণ তাতে হয়তো নিজের অপকর্মটাও নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকা কতগুলো প্রেম করল, কোথায় কী করল–মানুষ এসব খুঁজতে যায়। কিন্তু এটা বোঝে না–সে ১০টা প্রেম করলেও নায়ক-নায়িকা হতে পারবে না। তাই দেখতে হবে অভিনয়ের প্রতি তার মনোযোগ আর আত্মনিবেদন কতটুকু আছে।

অতএব যাকে আপনি জীবনের মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তার গুণগুলো আপনি দেখবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন এবং তা আত্মস্থ করবেন নিজের জীবনে। তার বাহ্যিক অবয়ব বা পোশাক-আশাক নয় এবং তার দোষটাও নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করলে আপনিও পারবেন আপনার মডেলের মতো সফল ও স্মরণীয় হতে।

প্রশ্ন : *আমার অনেক ছোট ছোট চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেন। কিন্তু বড় বড় প্রার্থনা তিনি কেন কবুল করেন না?*

উত্তর : বড় প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্যে তো বড় সময় দিতে হবে। যেমন, আমরা এখন একেকটা প্রোগ্রাম করি কয়েক হাজার মানুষ নিয়ে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে যখন শুরু করেছিলাম, আমাদের প্রথম ওয়ার্কশপের উপস্থিতি ছিল মাত্র ১১ জন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু হয়েছিল ছোট্ট একটা রুম থেকে। ল্যান্ডফোন ছিল মাত্র একটা। এখন ফাউন্ডেশনের যে কতগুলো টেলিফোন তা হিসাব করে বলতে হবে।

এই বিস্তৃতির জন্যে তো আমাদের সময় দিতে হয়েছে। বড় চাওয়ার জন্যে বড় অপেক্ষা আর বড় ধৈর্য লাগে। ধৈর্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বড় চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেন কিন্তু আপনাকে তো সেটা গ্রহণ করার মতো বড় হতে হবে। ১৯৯৩ সালে যদি এক হাজার মানুষ চলে আসত, সেটা সামাল দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন উপস্থিতি যত বেশিই হোক, সেটা ব্যবস্থাপনার শক্তি আমাদের সঙ্ঘ অর্জন করেছে। আমাদের যত সামর্থ্য আর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, সবই আল্লাহ ক্রমান্বয়ে দিয়েছেন।

অতএব প্রস্তুতিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন যোগ্য হবেন, আপনি অবশ্যই পাবেন এবং এর জন্যে আপনাকে ধৈর্যের সাথে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। আসলে আল্লাহ তায়ালা পরম দাতা। আমরা চাওয়ার মতো চাইলে অবশ্যই তিনি দেবেন। তবে পাওয়ার প্রস্তুতি অবশ্যই থাকতে হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

একা বড় কিছু করা যায় না। আমি সৎসঙ্ঘে একাত্ম হয়ে নিজের সাংগঠনিক শক্তিকে বিকশিত করব।

মুক্ত আলোচনায় চিকিৎসক-দম্পতি
ডা. আদিব হাসান ও ডা. নাফিসা আক্তার

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আশীর্বাদ

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. আদিব হাসান ও ডা. নাফিসা আক্তার। ৪ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৮৭ তম পর্বে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন এই চিকিৎসক-দম্পতি। তাদের সাথে আলাপচারিতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।

শুরুতে তিনি এই চিকিৎসক-দম্পতির কাছে জানতে চান, জীবন কেমন?

উত্তরে দুজনই বলেন, জীবন খুব সুন্দর। এটি সৃষ্টিকর্তার একটি উপহার। এর প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে আশীর্বাদ। তাই আমাদের চেষ্টা থাকা উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা এবং যা আছে তা নিয়ে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা। যা নেই তা নিয়ে যদি দুশ্চিন্তা করতে থাকি তাহলে আমরা হতাশায় নিমজ্জিত হবো। ইতিবাচক চিন্তাই জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারে।

'তোমরা বলছ, জীবন অনেক সুন্দর। কিন্তু জীবনে চলার পথে দুঃখ-দুর্দশা আর ভোগান্তিগুলোর প্রয়োজন কতটুকু?'

ডা. আদিব বলেন, জীবনে ভোগান্তির প্রয়োজন আছে তা আমি বলব না। তবে ভোগান্তি জীবনের অংশ। জীবন মানে সাজানো কোনো স্বপ্ন নয়, যেখানে সবকিছু নিজের মনমতো হবে। বরং জীবন একটি পরীক্ষা। আর পরীক্ষা সবসময় কঠিন হয়। জীবনের অংশ হিসেবে রোগ-শোক নানারকমের ঝামেলা ভোগান্তি থাকবে। এগুলো জয় করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। তা না হলে জীবনের একপর্যায়ে এসে থেমে যেতে হয়। তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না।

'এ কথাগুলো কি নিজের বিশ্বাস থেকে বলেছ নাকি বই-পত্রের কথা?' আদিবকে আবার প্রশ্ন করেন নিজামউদ্দিন আহমেদ।

কথাগুলো কিছুটা একাডেমিক মনে হতে পারে। তবে অন্তর থেকেই বলেছি– এভাবেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন ডা. আদিব। তিনি আরো বলেন, মানুষের জীবনে কখনো চরম কষ্টের সময় আসতে পারে। মনে হতে পারে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, আর উপায় নেই। গত আট বছরে আমার অসুস্থতার জন্যে অনেকবার মনে হয়েছে, পরের দিনটা আর দেখতে চাই না। জীবন তখনই থেমে গেলে যেন খুশি হই। কিন্তু পরক্ষণেই আমি জীবনের অর্থকে নতুন করে উপলব্ধি করেছি। আবার আত্মবিশ্বাস পেয়েছি–ভোগান্তিকে জয় করে আমাকে সামনে এগোতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে ডা. আদিব আক্রান্ত হন জটিল এক রোগে। পা দুটো হয়ে পড়ে চলৎশক্তিহীন। হুইল চেয়ার হলো তার নিত্যসঙ্গী। সেইসাথে অসহনীয় ব্যথা। বিভিন্ন ওষুধেও যখন কাজ হচ্ছিল না, ব্যথা নিয়ন্ত্রণের জন্যে চিকিৎসকরা তখন তার শরীরে ব্যথানাশক একটি পাম্প বসিয়ে দিলেন। জীবনের হঠাৎ এই ছন্দপতনে তিনি থেমে যান নি। চিকিৎসক স্ত্রী নাফিসা আক্তার ও পরিবারের উৎসাহে শুরু করেছেন নতুন করে পথচলা। সমস্ত সীমাবদ্ধতা জয় করে আদিব ও নাফিসা ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ থেকে এমআরসিপি সম্পন্ন করেছেন। এখন দুজনেই পুরোদস্তুর কাজ করছেন চিকিৎসক হিসেবে, মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক নিজামউদ্দিন এ পর্যায়ে ডা. নাফিসাকে বললেন, সব মানুষের জীবনে তো নাফিসা নেই। তুমি যেভাবে আদিবের সাথে আছ, এমন অনুকূল পরিবেশ তো সবাই পায় না। কিন্তু তোমার অবস্থা কী? তোমার কখনো থেমে যেতে ইচ্ছে করে নি? মনে হয় নি যে, যথেষ্ট হয়েছে, আর পারা যাচ্ছে না!

ডা. নাফিসা বলেন, আমি এটা মানছি, আদিবের মতো সবাই এমন অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ পায় না। কিন্তু নিজের তাগিদ না থাকলে অন্যের চেষ্টায় কেউ খুব বেশি দূর এগোতে পারে না। এখন হয়তো অনেকেই বলছেন, পরিবার সাথে ছিল তাই আদিব পেরেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি এমনটা না-ও হতো, আল্লাহর রহমতে সে যে-কোনো উপায়ে এগিয়ে যেত।

এভাবে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানটি। অধ্যাপক নিজামউদ্দিন প্রসঙ্গ পাল্টে ডা. আদিবের কাছে জানতে চাইলেন যে, রাষ্ট্র বা সমাজ রোগীদের ভোগান্তি কমাতে কী ভূমিকা রাখতে পারে?

আদিব জানালেন, আমার এ রোগের সূত্রপাত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে। কোনো এক রোগীর কাছ থেকেই আমি এ রোগে সংক্রমিত হয়েছি। তার মানে, চিকিৎসা পেশায় যারা জড়িত তাদের সবসময়ই ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত একজন রোগীর দায়িত্ব নেয়ার ধারণাটি আমাদের দেশে এখনো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি সচেতন হয় এবং এগিয়ে আসে তাহলে সমষ্টিগতভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। এজন্যে প্রয়োজন সবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

একই প্রসঙ্গে ডা. নাফিসা বলেন, সমাজে আমরা যারা সুস্থ আছি, তাদের সহযোগিতা ও সমানুভূতিশীল আচরণ অসুস্থদের জীবনকে আরো সহজ করতে পারে। যেমন, আমরা রাস্তা বানানোর সময় এমন ব্যবস্থা রাখতে পারি, যাতে হুইল চেয়ারেও একজন সহজে রাস্তা পার হতে পারেন। বাড়ি বানানোর সময় খেয়াল রাখতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তিও যেন নিজেই হুইল চেয়ারের সাহায্যে টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। রেস্টুরেন্টগুলোতে এমন ব্যবস্থা রাখতে পারি যেন হুইল চেয়ারের একজন স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারেন।

অধ্যাপক নিজামউদ্দিন চিকিৎসক-দম্পতির কাছে এবার জানতে চান, 'তোমরা তো অনেক ভোগান্তি সহ্য করেছ এবং এখনো করছ। কী মনে হয় তোমাদের– পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা বেশি নাকি ভালবাসা বেশি?'

'পৃথিবীতে অবশ্যই ভালবাসা বেশি। নিষ্ঠুরতা বেশি হলে আমাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেত।'–একই আশাবাদ ব্যক্ত করেন দুজন।

মুক্ত আলোচনার এ পর্বে আরো উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কেরালায় কমিউনিটি বেইজড প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তক ও ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়েটিভ মেডিসিনের প্রাক্তন পরিচালক ডা. সুরেশ কুমার। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, দুর্দশা বা ভোগান্তির সময় হয় একজন মানুষের ভেতরের সবচেয়ে খারাপ প্রবৃত্তিগুলোর প্রকাশ ঘটে, নয়তো সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ তার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। নিরাময়-অযোগ্য বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষকে প্রশমন সেবা দিতে গিয়ে প্রতিদিন আমি এই ঘটনাগুলোই দেখি। তাই আমি মনে করি, দুর্দশাকে জয় করাই হলো জাগতিক ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করা। আর এখানেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সবশেষে সঞ্চালক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ বলেন, মানুষের মন ও আত্মার শক্তিটা বিশাল। দুর্দশা বা ভোগান্তি এই শক্তিকে আরো বড় করে তুলতে পারে। আমরা এই মনের সঠিক চর্চা করলাম কিনা, অন্যকে ভালবাসলাম নাকি ঘৃণা করলাম, তার ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক ভালো থাকা। এটাই মানবিকতা।

আর এই মানবিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে ডা. নাফিসা এবং ডা. আদিব। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। এখানে সবার মুখোমুখি দাঁড়ানোর যে সাহস তারা দেখিয়েছে তা খুব কম মানুষই পারে। এটাই হলো হীনম্মন্যতাকে জয় করে সত্যের মুখোমুখি হওয়া। আর জীবনের এই গল্পগুলো আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণা দেয় এবং পুনরায় বিশ্বাস করায় যে, আমিও পারব। যেমনটা ওরা পেরেছে।

মহাজাগতিক সফরে

দেলোয়ার হোসেন

কোয়ান্টাম পরিবারের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন খুলনা শাখার সাবেক মোমেন্টিয়ার দেলোয়ার হোসেন মুকুল। ১ মে বুধবার ৬৩ বছর বয়সে তিনি মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

সপরিবারে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১০৯ তম ব্যাচে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ফাউন্ডেশনের সাথে তার সম্পৃক্ততা শুরু। কোর্স করার পর থেকেই দেলোয়ার হোসেন সঙ্ঘের কাজের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। ২০০০ সালে সহধর্মিণী রেজানুজ্জাহানের প্রেরণায় তার আবাসস্থল বাগমারায় খুলনা সেলের কার্যক্রম নতুন উদ্যমে শুরু হয়; যার পরিণত রূপ আজকের খুলনা শাখা।

তিনি কোয়ান্টাম চেতনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং সেই আলোকে তার জীবনকে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। কাজে কোনোরকম অবহেলা বা ক্লান্তির সাথে কোনোদিন আপস করতে দেখা যায় নি তাকে। ফাউন্ডেশনের কাজে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা ও সবাইকে নিয়ে কাজ করার অসাধারণ দক্ষতা ছিল তার। সঙ্ঘের যে-কোনো প্রয়োজনে সবসময় তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

ব্যক্তিজীবনে মিশুক ও পরিপাটি মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সবক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন। সংস্কৃতিমনা এ মানুষটি বেশ ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারতেন।

একজন দানশীল এবং পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। ঈদের আগেরদিন কোনো অসহায় মানুষ তার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে এবং তিনি পরনের জামা খুলে দিয়েছেন–এমন ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার।

তার জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৯ মার্চ। বাবা মরহুম আমজাদ হোসেন, মা নূরজাহান বেগম। ১০ ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র ও অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন তিনি।

কোয়ান্টামমের আরোগ্যশালার কসমোড্রোমে তাকে সমাহিত করা হয়। ফাউন্ডেশনে তার সামগ্রিক অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। পরম করুণাময় তার সকল সৎকর্ম কবুল করুন। তার মহাজাগতিক সফর প্রশান্তিময় হোক–স্রষ্টার কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ

টানা তৃতীয়বার ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা

৪৭ তম (২০১৮) গ্রীষ্মকালীন ও ৪৮ তম (২০১৯) শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে ক্রীড়ায় টানা তৃতীয়বারের মতো দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। ৫ মে ঢাকার কাকরাইলস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মাননা গ্রহণ করছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের দুজন মেয়ে কোয়ান্টা। শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী (সর্বডানে), সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন (সর্ববামে)

এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা) চেয়ারম্যান প্রফেসর মু. জিয়াউল হক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক।

সরকারি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা

কুমিল্লা বার্ড-এ ইয়োগা চর্চারত নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ

- ৩, ৪ মে বিয়াম ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ৭৩ তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩৮ জন নারী ও ৪৪ জন পুরুষসহ ৮২ জন নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ৪০ জন চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- ২০ ও ২৭ এপ্রিল আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চট্টগ্রামে অংশ নেন ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ১৪ জন নারী ও ৬৮ জন পুরুষ নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
- ২৬, ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লাতে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪৪ জন নারী ও ৬৬ জন পুরুষসহ মোট ১১০ জন নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
- ১২ ও ১৩ এপ্রিল বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে ৬৮ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২২ জন মহিলা এবং ৬৩ জন পুরুষসহ মোট ৮৫ জন নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা অংশ নেন।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুন ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

যোগ-মেডিটেশন হোক আমাদের শিক্ষার অঙ্গ

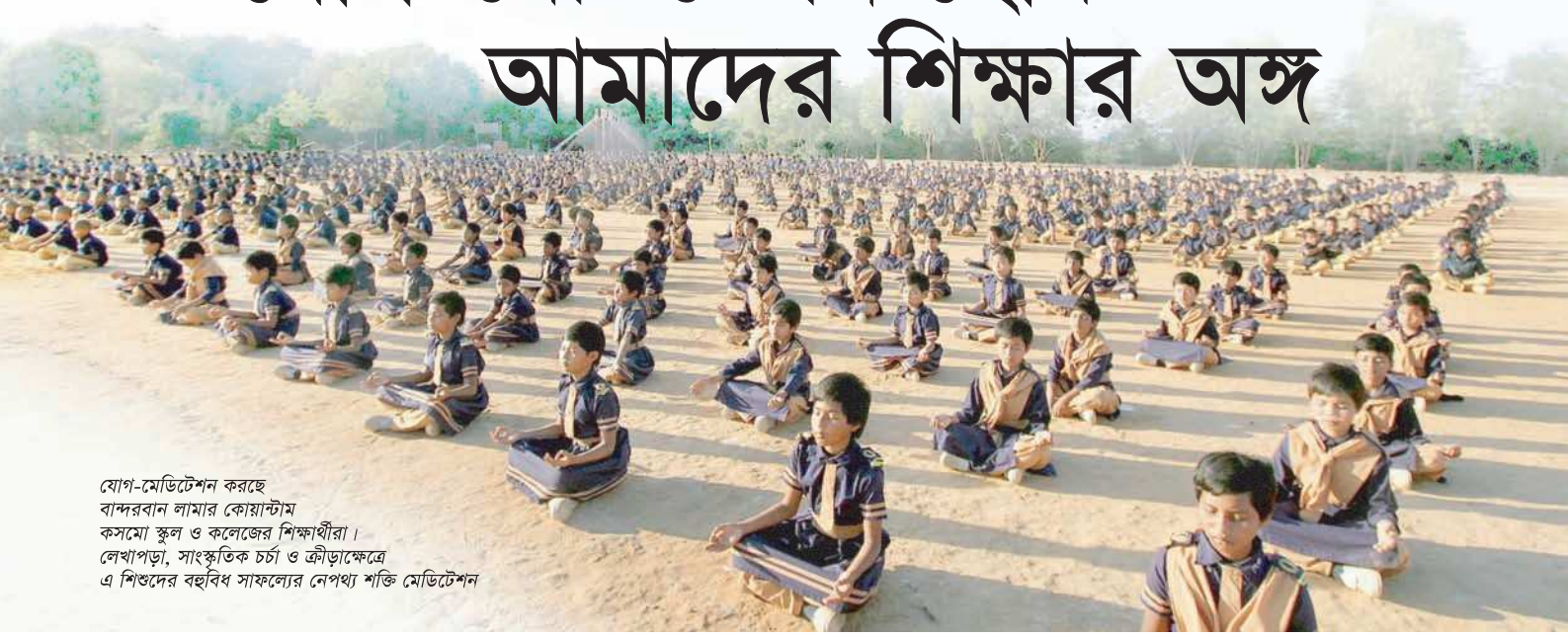

যোগ-মেডিটেশন করছে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা। লেখাপড়া, সাংস্কৃতিক চর্চা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে এ শিশুদের বহুবিধ সাফল্যের নেপথ্য শক্তি মেডিটেশন

নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্যের আগ্রাসন আর অমিতাচারী জীবনযাপনের ফলে সৃষ্ট স্ট্রেস আজ দিশেহারা করে তুলেছে শিশু-বৃদ্ধ-যুবকসহ প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষকেই। দৈনন্দিন হাজারো অস্থিরতা এবং টেনশনজনিত মনোদৈহিক রোগশোকে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত মানুষ তাই খুঁজে ফিরছে প্রশান্তির একটুখানি অবলম্বন। বিস্তর গবেষণা-পর্যবেক্ষণ শেষে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, নিয়মিত যোগ-মেডিটেশন চর্চা ও সুস্থ জীবন-অভ্যাসই পারে জীবনকে সবদিক থেকে সুস্থ, প্রশান্ত, কর্মোদ্যমী করে তুলতে। তাই স্বাস্থ্যবিদদের পরামর্শ–যোগ-মেডিটেশন হয়ে উঠুক আমাদের শিক্ষার অঙ্গ, দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ।

বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রযাত্রা ও বিকাশের ফলে মানুষের জীবনে বহুমুখী সুযোগ ও সম্ভাবনা বেড়েছে বটে, কিন্তু সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মনোদৈহিক স্বাস্থ্য। আক্রান্ত হয়েছে দুদণ্ডের শান্তি ও স্বস্তি। ফলে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে মেদস্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, হৃদরোগসহ বহুবিধ সাইকোসোমাটিক রোগব্যাধি।

আমেরিকার ফুড রিসার্চ এন্ড অ্যাকশন সেন্টারের মতে, শতকরা ৩৮ জন আমেরিকান মেদস্থূলতাজনিত রোগে আক্রান্ত, যা তাদের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি। ২০১৬ সালে আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন জানায়, আমেরিকায় প্রতি তিন জন শিশুর একজন অতিরিক্ত ওজনের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন–ধূমপান ও মাদকাসক্তি নয়, শিশু-কিশোরদের এক নম্বর সমস্যা এখন এটি।

বাংলাদেশেও প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুরা মেদস্থূলতায় ভুগছে। ২০১৩ সালে আইসিডিডিআর,বি-র রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা ১৮ জনই অতিরিক্ত ওজনে আক্রান্ত।

মেদস্থূলতার প্রতিকার হিসেবে আমেরিকার অনেক স্কুল শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করা এবং অ্যাথলেটিক্সের ওপর জোর দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, সব বাচ্চার জন্যে সারাদিন দাঁড়িয়ে ক্লাস করা ও অ্যাথলেটিক্সের চর্চা করা কঠিন। তাই স্কুলগুলো এখন শিশুদের জন্যে যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। ২০১৬-তে ইয়োগা জার্নাল প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, তিন কোটি ৭০ লাখ আমেরিকান যোগব্যায়াম চর্চা করছেন, যার ৩৭ শতাংশ শিশু।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, যোগ-মেডিটেশন চর্চার ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ তীক্ষ্ণ হয়। স্মৃতিশক্তি, সহনশীলতা ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়, রেজাল্ট ভালো হয় এবং শ্রেণিকক্ষে আচরণ মার্জিত হয়। প্রশমিত হয় তার যাবতীয় রাগ ক্ষোভ স্ট্রেস।

বর্তমান সময়ের অস্থির অশান্ত ত্রাহি-অবস্থা থেকে মানুষকে পরিত্রাণ দিতে পারছে না কোনো পণ্য কিংবা প্রযুক্তি, না কোনো ধন্বন্তরী ওষুধ কিংবা সার্জারি। উপায় খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা বাতলে দিচ্ছেন যোগ-মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার অনুসরণের পন্থা। হাজারো গবেষণার ভিত্তিতে মিলেছে এর বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিও।

২০১৪ সালে জাতিসংঘের ৬৯ তম অধিবেশনে ১৭৫টি সদস্য দেশের অনুমোদনে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রতিবছর ২১ জুনকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে পালনের। সেই থেকে পৃথিবীজুড়ে এটি পালিতও হচ্ছে সাড়ম্বরে। উদযাপনে অংশ নিয়েছেন খোদ জাতিসংঘের মহাসচিব এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা।

স্বাস্থ্যগবেষকরা বলছেন, যোগ-মেডিটেশন মানুষকে শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রাখে বলে চিকিৎসা-ব্যয় কমে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। রোগীমৃত্যুর হার কমাতে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসকদের মেডিটেশনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ যোগ-মেডিটেশনের ওপর থেকে সব ধরনের সার্ভিস ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রত্যাহার করে নিয়েছে, উপরন্তু এর প্রসারে দিয়েছে বিশেষ বরাদ্দ। বাংলাদেশেও উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার জাতীয় নীতিমালায় যোগ-মেডিটেশন ও শিথিলায়নকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে।

সুস্থ দেহ একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর সুরক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে যিনি যত সচেতন, তার সুস্থতা তত বাড়ে। অন্যদিকে যিনি যত উদাসীন ও খেয়ালি, দিন দিন বাড়ে তার অসুস্থতা।

তাই নিজের সুস্থতার দায়িত্ব নিতে হবে নিজেকেই। একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আপনিও নিয়মিত হয়ে উঠুন যোগ-মেডিটেশন চর্চায়। প্রশান্তি ও সুস্বাস্থ্যে ও সার্বিক কল্যাণে পরিপূর্ণ হোক আপনার জীবন।

> Overall relaxation interventions were associated with statistically significant reductions in systolic and diastolic blood pressure and clinicians should encourage stress relaxation by yoga, meditation, stretching and breathing exercise as appropriate.
> *(page 18)*

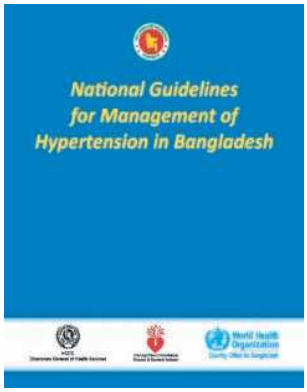

যোগ-মেডিটেশন দেশে দেশে

ভারতের ১ম-১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে যুক্ত হয়েছে ইয়োগা কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেশটির সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০১৪ সালে জাতিসংঘের ৬৯ তম সাধারণ অধিবেশনে ১৭৫টি দেশের সম্মতিক্রমে ২১ জুনকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছবিতে যোগব্যায়াম চর্চারত জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান কি মুন।

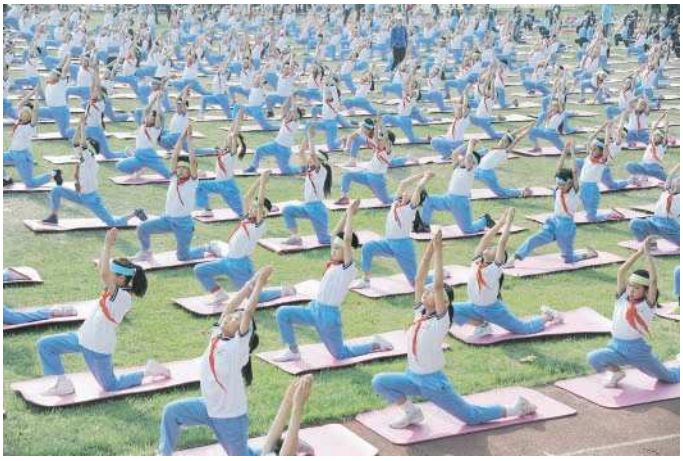

চীনে রয়েছে প্রায় ১১ হাজার ইয়োগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সেখানকার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ক্রমেই যোগচর্চার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ছে।

বিশ্ব যোগ দিবস উদযাপিত হয় ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামেও, ২১ জুন ২০১৭

যোগের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা উপলব্ধি করায় পাশ্চাত্যের মানুষ ঝুঁকছে যোগচর্চায়। ইংল্যান্ড, বেলারুশ, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া ইত্যাদি দেশগুলোয় বাড়ছে যোগব্যায়াম চর্চাকারী মানুষের সংখ্যা। ছবিটি কানাডার মন্ট্রিলে সমবেত ছয় সহস্রাধিক যোগ চর্চাকারীর। উত্তর আমেরিকায় রয়েছে ৭০ হাজারেরও বেশি রেজিস্টার্ড যোগ প্রশিক্ষক।

প্রতিটি পরিবারে ছড়িয়ে পড়ুক যোগ-মেডিটেশন চর্চা

নাহার আল বোখারী

মনোদৈহিক সুস্থতার লক্ষ্যে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্রাবিড় সাধকরা যোগচর্চার প্রচলন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে আজ আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে সত্যি, কিন্তু যোগের চেয়ে উন্নততর ও সৃজনশীল কোনো ব্যায়াম এখন পর্যন্ত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় নি। তাই বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ বর্তমানে যোগ-মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

দীর্ঘ তিন যুগের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, যোগ-মেডিটেশন দেহকে যেমন রাখে সুস্থ ও প্রাণবন্ত, তেমনি মনকে করে প্রশান্ত ও স্ট্রেসমুক্ত। বাড়ায় ধৈর্য ও সহনশীলতা। তাই আপনার পরিবারকে সুস্থতা ও প্রশান্তিতে আলোকিত করে তুলতে পারিবারিকভাবে যোগ-মেডিটেশন চর্চা করুন। যোগ-মেডিটেশন ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি পরিবারে।

[আশির দশকের সূচনালগ্নে বাংলাদেশে মহিলাদের যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব]

তিন যুগের গবেষণায় যোগব্যায়ামের আধুনিক বই

রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা

পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে যোগচর্চা একসময় সীমাবদ্ধ ছিল অল্প কিছু মানুষের মধ্যে। কিন্তু যোগের সার্বজনীন ও দীর্ঘস্থায়ী উপকারিতা বিবেচনায় একে আধুনিক মানুষের উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে যোগের সবচেয়ে সহজ, ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী সংস্করণ কোয়ান্টাম ব্যায়াম বা কোয়ান্টাম ইয়োগা উদ্ভাবন করেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

আর কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চাকারীরা যে বইটিকে অনুসরণ করেন, তা হলো *রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা*। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারীর দীর্ঘ ২৪ বছরের গবেষণার ফসল এ বইটি ২০০৪ সালে প্রথম পাঠকের হাতে আসে।

বইটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সহজবোধ্যতা ও প্রাঞ্জলতা। এক যুগের বেশি সময় ধরে *রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা* বইটি পড়ে উপকৃত হয়েছেন লাখো মানুষ। বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণার আলোকে উপস্থাপিত এ বইতে রয়েছে–

ব্যায়ামের নিয়মাবলি

আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের সচিত্র বিবরণ। রোগভেদে উপকারী আসন এবং ৩০ মিনিট ব্যায়ামের চার্ট।

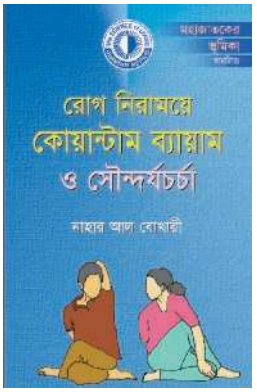

মানবদেহের বর্ণনা

দেহকাঠামো ও এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের বিবরণ। পুরুষ ও নারীদের জন্যে আলাদাভাবে দেহের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন-সারণী।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস

সুস্থতার জন্যে বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাসের নির্দেশনা এবং সময় ও মৌসুমভেদে সঠিক খাদ্যতালিকা।

সৌন্দর্যচর্চা ও যত্নায়ন

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের যত্নায়নের বর্ণনা, যা ছেলেমেয়ে সকলের জন্যেই প্রয়োজনীয়।

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে রয়েছে মেয়েদের জন্যে দৃষ্টিনন্দন সাজের পদ্ধতি; যা থেকে ঋতু, রং ও অনুষ্ঠানভেদে মেয়েরা রুচিশীল সাজের ধারণা পাবেন। সেইসাথে জানবেন ইতিবাচক ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব গড়তে প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার সম্পর্কে।

ফ্রি ডাউনলোড করুন : publication.qm.org.bd

যোগ-মেডিটেশন ॥ একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জীবনচর্চা

আশির দশকে স্থাপিত শান্তিনগরের যোগ-মেডিটেশন কেন্দ্রে ব্যায়াম করছেন (বাম থেকে) ড. কাজি মফিজুর রহমান, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা মরহুম আখতার হুসেন এবং (সর্ব ডানে) ডা. ফজলুর রহমান

দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যন্ত্রনির্ভর ভারী ব্যায়াম বা শরীরকে পেশীবহুল করে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়ার প্রত্যাশায় করা অন্যান্য ব্যায়ামের চেয়ে যোগচর্চা সুস্থতার জন্যে বেশি কার্যকর। ভারী ও পেশিবহুল শরীর তৈরি করতে গিয়ে ব্যক্তির আবেগের ভারসাম্যহীনতা, পেশির স্বতঃস্ফূর্ততা হ্রাস এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

আর যোগচর্চায় পেশি মজবুত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ততা বাড়ে। কোলেস্টেরলের পরিমাণ, ওজন ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে আসে। কারণ যোগচর্চা এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের পরিমাণ সুষম করে।

কেন সবারই যোগচর্চা করা প্রয়োজন? ১২ মে ২০১৫ *ফ্রন্টিয়ার্স ইন হিউম্যান নিউরোসায়েন্স* কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ 'নিউরোপ্রোটেক্টিভ ইফেক্টস অব ইয়োগা প্র্যাকটিস' এ ব্যাপারে একটি স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করে।

এতে বলা হয়, মস্তিস্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা নির্ভর করে গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণের ভিত্তিতে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিস্কে এই গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণ কমতে থাকে। ফলে শারীরিক সমস্ত কার্যক্রমের গতিও কমতে থাকে। এজন্যেই চল্লিশোর্ধ হওয়ার সাথে সাথে অনেকের খাওয়া, চলাফেরা, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে আসে ধীরগতি।

কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সপ্তাহে যারা ৪–২০ ঘণ্টা করে যোগচর্চা (যোগাসন, দমচর্চা, মেডিটেশন) করেন, ৫০ বছর বয়সেও তাদের মস্তিস্কের গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণ ২৫ বছর বয়সী যুবকের সমান। অর্থাৎ যারা নিয়মিত যোগ-ধ্যান অনুশীলন করেন, ৫০ বছর বয়সেও তারুণ্যে ও দৈনন্দিন কাজে তারা ২৫ বছরের যুবকের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন, ২৫-এর পর যে-কোনো বয়সে যোগচর্চা শুরু করলে আট সপ্তাহের মাথায় এই পরিবর্তন শুরু হয় এবং চর্চা অব্যাহত রাখলে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে চর্চাকারীর জীবনে স্থায়ী হয়।

তাই সুস্থতা ও দীর্ঘ তারুণ্যের জন্যেই প্রয়োজন যোগ-মেডিটেশন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করলে তা হবে সুস্থ জাতি গঠনে এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ।

কোয়ান্টাম ইয়োগা শিখুন সুস্থ থাকুন

চর্চার সুবিধার্থে প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোয়ান্টাম ইয়োগা ওরিয়েন্টেশন। মহিলা ও পুরুষদের জন্যে রয়েছে পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা। দুই দিনের এ ওরিয়েন্টেশনে যে-কেউ অংশ নিতে পারেন। কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করে আপনি লাভ করবেন–

- ☐ মনোদৈহিক সুস্থতা
- ☐ অফুরন্ত কর্মক্ষমতা ও প্রাণশক্তি
- ☐ ওজন নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বক
- ☐ তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধি

কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চার অনুভূতি

শিখলাম সমমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ

আলমগীর হোসেন

জনসেবার প্রথম শর্ত হলো শারীরিক, আত্মিক, মানসিক– সবদিক থেকে সুস্থ থাকা। যোগব্যায়াম শুধু শারীরিক সুস্থতা অর্জনের কৌশল শেখায় না, পরস্পরের প্রতি সমমর্মিতাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ায়।

[সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট]

ইতিবাচকতা অর্জন করেছি

কেয়া দেবনাথ

সুখানুভূতি যে অন্যের মাঝেও ছড়িয়ে দেয়া যায়, কোয়ান্টাম ইয়োগা ওরিয়েন্টেশন থেকে আমরা তা শিখলাম। মাত্র দুদিনেই আমরা ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করেছি। এই ইতিবাচক মনোভাব এবং এরকম উদ্যোগ বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে অব্যাহত থাকুক।

[সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট]

১৪ ও ১৫ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে আয়োজিত কোয়ান্টাম ইয়োগা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য

সুস্থতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে আমার

মাসুমা বেগম

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর আমার ওজন বেড়ে যাচ্ছিল। তখন আমি উপলব্ধি করি, নিজেকে সময় দেয়া প্রয়োজন। তাই নিজের যত্নের জন্যে দিনের একটা অংশ বের করে আমি যোগব্যায়াম করার সিদ্ধান্ত নিই। প্রায় পাঁচ বছর আগে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম শুরু করলেও নিয়মমাফিক চর্চা করছি গত আড়াই বছর থেকে। সকালের এই আধাঘণ্টা সময় আমি ব্যয় করি ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার জন্যে।

নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলনের ফলে গত দুই বছর ধরে আমার ঠান্ডাজনিত সমস্যাগুলো একেবারেই নেই। অথচ আগে একটু ধুলাবালি বা ঠান্ডায় আমার অনেক কষ্ট হতো। আমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি এসিডিটির সমস্যার ক্ষেত্রে। এই সমস্যা আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই ছিল। এজন্যে হজম শক্তিটাও কমে গিয়েছিল। এসিডিটির সমস্যা থেকে এখন আমি মুক্ত। সবকিছু মিলিয়ে যোগব্যায়াম করলে যেমন সুস্থতা বেড়ে যায়, তেমনি আত্মবিশ্বাসটাও দৃঢ় হয়।

[সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক]

তারুণ্য ফিরে পেয়েছি

বিপব কুমার সেন

ছাত্রাবস্থায় আমার এক শিক্ষকের মাধ্যমে যোগব্যায়ামের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। পরবর্তী ১০ বছর নিয়মিত আমি যোগব্যায়াম চর্চা করেছি। পড়াশোনা ও ব্যায়ামচর্চা নিয়ে জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় অতিবাহিত করেছি তখন।

তারপর বিভিন্ন কারণে একসময় এ থেকে দূরে সরে গেলাম। ফলে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ি।

এমনকি আমার ফ্রোজেন শোল্ডার এবং ব্যাকপেইন দেখা দেয়। ২০১৫ সালে আবার মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ব্যায়ামচর্চা শুরু করি। শারীরিক সমস্যাগুলো এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

সপ্তাহে পাঁচ দিন নিয়মিত আমি কোয়ান্টাম ব্যায়াম অনুশীলনের চেষ্টা করছি। পুনরায় ব্যায়াম শুরু করায় মনে হচ্ছে, আমি আমার তারুণ্য যেন আবার ফিরে পেয়েছি।

[সিনিয়র ম্যানেজার, মার্কেটিং, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স লি.]

দৈনন্দিন কাজের স্ট্রেস ও টেনশন কমেছে

মুহাম্মদ মঈনুল আহছান চৌধুরী

পেশাগত কারণে অনেক সময় বেশ স্ট্রেস নিয়ে কাজ করতে হয় আমাকে। দিনশেষে আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হতো। ২০১৫ সালে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশনে আমি সহজ কিছু যোগ ব্যায়ামের সাথে পরিচিত হই।

তখন থেকে প্রতিদিন সকালে ২০ মিনিট কোয়ান্টাম ব্যায়ামচর্চা করছি। ফলে আমার দৈনন্দিন স্ট্রেসগুলো অনেক কমেছে।

এছাড়া আমার পাইলস্‌ের সমস্যাও ব্যায়ামচর্চার ফলে দূর হয়েছে। দুবছর ধরে আমি উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খেতাম। এক মাস আগে আমার উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে দেখে ডাক্তার ওষুধের পরিমাণ একদম কমিয়ে দিয়েছেন। আমি আজীবন নিয়মিত যোগব্যায়াম চর্চা করতে চাই।

[সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এন্ড সিএফও, তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লি.]

পড়াশোনায় আমার মনোযোগ বেড়েছে

হাফিজুর রহমান আরফিন

যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ালেখা করি, তাই আমাকে দিনের অনেকটা সময় কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করতে হয়। বেশিক্ষণ কাজ করলে কোমরে ব্যথা হতো। প্রায়ই শুনতাম সহপাঠীদের মধ্যেও অনেকে একই সমস্যায় ভুগছে।

গত বছর কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে কোয়ান্টাম ব্যায়াম বইটি ডাউনলোড করি। সেখানে যোগব্যায়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি এবং বই দেখেই প্রতিদিন ১০ মিনিট ব্যায়াম করা শুরু করি। সপ্তাহে এখন আমি তিন-চার ঘণ্টা নিয়মিত কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম চর্চা করছি।

আমার কোমরে এখন আর কোনো ব্যাথা নেই। সঠিক খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সার্বিকভাবেই আমাকে স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলেছে কোয়ান্টাম ব্যায়াম। দিনের শুরুতে যোগাসন এবং তারপর মেডিটেশন করলে পুরো দিনটাই আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। এনার্জি লেভেল তো বেড়েছেই, সেইসাথে পড়াশোনায়ও মনোযোগ বেড়েছে।

[শিক্ষার্থী, ৪র্থ বর্ষ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি]

এলার্জি ও ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে এখন আমি মুক্ত

মৌরী হক

প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমি স্কিন এলার্জিতে ভুগছি। এ কারণে আমার সারা বছরই ঠান্ডাজনিত সমস্যা এবং সর্দি লেগেই থাকত। ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ওষুধ খেয়েও কোনো লাভ হচ্ছিল না।

এ বছর এপ্রিলে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিয়ে জানতে পারি–নির্দিষ্ট কিছু যোগাসন চর্চার পাশাপাশি যদি আমি আমার মনের শক্তিটাকে প্রবল করি, তাহলে এসব মনোদৈহিক রোগ থেকে আমি মুক্ত হতে পারব। তাই প্রতিদিন সকালে ২০ মিনিট আমি কোয়ান্টাম ব্যায়ামচর্চা করছি। স্রষ্টার রহমতে স্কিন এলার্জি ও ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে এখন আমি মুক্ত।

[শিক্ষার্থী, ২য় বর্ষ, আর্কিটেকচার, লিডিং ইউনিভার্সিটি, সিলেট]

রুকু-সেজদা দিয়ে তারাবীর নামাজ পড়ছি

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

তিন বছর আগে আমি কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিই। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনুশীলনে নিয়মিত হতে পারি নি। এদিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০০৯ সালে আমার একবার হার্ট অ্যাটাকও হয়েছিল। সেই থেকে আমি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারতাম না।

গত বছর থেকে আমার জন্যে প্রযোজ্য, এমন কিছু যোগাসন চর্চা আবার শুরু করি। কিছুদিনের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ অনুভব করতে লাগলাম। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমণ্ডি শাখায় আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্যায়াম কার্যক্রমে চার মাস যাবৎ আমি নিয়মিত অংশ নিচ্ছি। আমরা অংশগ্রহণকারীরা বেশ আনন্দের সাথে ব্যায়াম করি, সময়টাও ভালো কাটে।

এবার রমজানে আমি আট বছর পর রুকু-সেজদা দিয়ে ২০ রাকাত তারাবীর নামাজ আদায় করছি, যা আমার জন্যে অসম্ভব ছিল। কোয়ান্টাম ব্যায়াম এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আমার জীবনে ইতিবাচক গতি এনে দিয়েছে।

[অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ]

প্রত্যেক গৃহিণীরই কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম করা উচিত

হাসিনা আক্তার নীলা

এ বছর মার্চে দুদিনের কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিই। সেখানে যোগব্যায়াম সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। তখন থেকেই আমি প্রতিদিন বিকেলবেলা সংসারের কাজ সেরে ৪৫ মিনিট যোগাসন ও প্রাণায়াম চর্চা করছি।

এতে আমার ঠান্ডাজনিত অসুখগুলো–বিশেষ করে হাঁচি-কাশি আর হচ্ছে না। সিজনাল ফ্লু থেকেও আল্লাহর রহমতে মুক্ত আছি।

এছাড়া সংসারের কাজ একটু বেশি করলেই আগে আমার পিঠে ও কোমরে ব্যথা হতো। কিন্তু এখন এসব ব্যথা আর নেই। প্রতিবেলা খাবারের পর বজ্রাসনে কিছুক্ষণ বসে থাকলে বেশ স্বস্তি অনুভব হয়। আবার রাতের বেলা পাঁচ মিনিট গোমুখাসন করে ঘুমানোর ফলে আগের চেয়ে ভালো ঘুমাতে পারছি। সেইসাথে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠছি।

আমি মনে করি, প্রত্যেক গৃহিণীরই নিজের প্রতি প্রতিদিন এই সময়টুকু দেয়া উচিত। তাহলে আমরা এবং আমাদের পরিবারের সকলেই উপকৃত হবো।

[গৃহিণী]

যোগব্যায়াম চর্চার সময়টা জীবনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

সুরাইয়া রহমান

জন্মগ্রহণের মুহূর্তে মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদটি নিয়ে পৃথিবীতে আসে তা হলো তার এই চমৎকার দেহ। কিন্তু এটা বিনামূল্যে পাওয়ার কারণে বেশিরভাগ মানুষই দেহের যত্নায়নের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অমনোযোগী। ফলস্বরূপ আমরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ি।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা মানুষকে আজ খুব বেশি কর্মহীন ও অলস করে ফেলেছে। এটিও অসুস্থ হওয়ার একটি প্রধান কারণ। তাই কোয়ান্টামে আমরা বলি–যত আরাম তত ব্যারাম। এই ব্যারাম থেকে রেহাই পেতে প্রয়োজন যোগব্যায়াম চর্চা। আর কোয়ান্টাম ব্যায়াম হচ্ছে যোগব্যায়ামের সবচেয়ে সহজ, ফলপ্রসূ ও আধুনিক সংস্করণ।

যারা নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন, তারা সবসময় সুস্থ থাকেন। তারুণ্যকে শরীরে ও মনে দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারেন। মানসিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে আমার নিজস্ব কিছু অভিজ্ঞতা বলছি।

১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে গত ৩৯ বছর আমি নিয়মিত যোগব্যায়াম চর্চা করছি। তার সুফলও আমি পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে গত ২৩ বছর ধরে আমার সহকর্মীরা আমাকে কখনো অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকতে দেখেন নি। কর্মসূত্রে আমাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। কিন্তু এ কারণে আমার ক্লান্তিবোধ নেই। কারণ নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম অনুশীলনে আমার এনার্জি লেভেল সবসময়ই ভালো থাকে এবং মৌসুমি জ্বর বা হাঁচি-কাশি থেকে আমি মুক্ত থাকতে পারি।

২০ বছর হলো আমার বাসায় কোনো গৃহকর্মী নেই। ঘরের সব কাজ আমি নিজেই করি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেকের স্মরণশক্তি হ্রাস পায় এবং অনিদ্রা দেখা দেয়। স্রষ্টার রহমতে এগুলো কখনো আমার দেখা দেয় নি। কারণ আমি রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করি এবং প্রতিদিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠি। ফজরের নামাজ শেষে ব্যায়াম করি। এতে আমি সারাদিন ঝরঝরে থাকি। শারীরিক ও মানসিকভাবে ৩০ বছর আগের মতোই নিজেকে প্রাণবন্ত মনে হয় আমার।

যোগব্যায়াম ও মেডিটেশন চর্চা করে পারিবারিক ও পেশাজীবনে আমি প্রভূত উপকার পেয়েছি। আমি মনে করি, আজীবন নিজেকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্যে প্রতিদিন মাত্র ২০-২৫ মিনিট যোগব্যায়ামের জন্যে ব্যয় করাটা হবে জীবনের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। একটা কথা তো আছেই–শরীর ফিট তো জীবন হিট।

[পরিচালক সমন্বয়, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন]

উজ্জীবন ও অর্ধশলভাসন চর্চায় কোমরের ব্যথা নেই

আব্দুল্লাহ আল মামুন

২০১৩ সালে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিলেও যোগব্যায়ামে আমি নিয়মিত হতে পারি নি। এদিকে মোটরসাইকেল চালানোর জন্যে আমার কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। কোমরে বেল্ট পরেও কোনো উপকার হচ্ছিল না। এমন অবস্থায় ডাক্তার মোটরসাইকেল চালাতে একেবারে নিষেধ করে দিলেন।

কিন্তু মোটরসাইকেল ছাড়া আমার যাতায়াতে অসুবিধা হয়। তাই সুস্থতার জন্যে গত বছর কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশনটি রিপিট করলাম। তখন থেকেই উজ্জীবন এবং অর্ধশলভাসন নিয়মিত চর্চা করছি। ফলে আমার কোমরের ব্যথা পুরোপুরি সেরে গেছে।

ছয় মাস যাবৎ কোনোরকম কোমরের ব্যথা ছাড়াই আমি মোটরসাইকেল চালাচ্ছি। মেডিটেশনেও মনোযোগ বেড়েছে। প্রতিদিন সকালে আধাঘণ্টা কোয়ান্টাম ব্যায়াম সারাদিন আমাকে চাঙ্গা রাখছে।

[ইউনিট ম্যানেজার, মেট লাইফ বাংলাদেশ]

ইয়োগা চর্চায় দূর হয়েছে থাইরয়েডের সমস্যা

শাহানাজ পারভীন

তিন বছর আগের কথা। তখন উচ্চতা অনুযায়ী আমার ওজন প্রায় ১০ কেজি বেশি ছিল। প্রতিদিন সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার সময় হাঁপিয়ে যেতাম। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণ করে এমনকি ওষুধ খেয়েও ওজন নিয়ন্ত্রণ হচ্ছিল না। এর পাশাপাশি আমার থাইরয়েডের সমস্যাও ছিল।

এরকম একটি পরিস্থিতিতে আমি কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা শুরু করি ২০১৭ সালে। প্রতিদিন ভোরে আমার জন্যে প্রয়োজনীয় আসনগুলো চর্চা করেছি। যোগাসন শেষে ১৫ মিনিট প্রাণায়াম করাও আমার দৈনন্দিন অভ্যাস।

নিয়মিত ইয়োগা চর্চার ফলে আমি এখন বেশ সুস্থ। হলাসন চর্চার ফলে আমার থাইরয়েডের সমস্যাটা এখন আর নেই। আমার ওজনও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগের চেয়ে নিজেকে খুব হালকা ও ঝরঝরে মনে হয়। এছাড়া আমার কর্মোদ্দীপনা ও এনার্জি লেভেল বেড়েছে।

[গৃহিণী, ঢাকা]

যোগচর্চা করছেন মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যরা

ইউএস ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে অভিজাত ইউনিট নেভি সিল-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ-মেডিটেশনকে অন্তর্ভুক্ত করে। উল্লেখ্য, মার্কিন সৈন্যরা ২০০৬ সাল থেকেই যোগধ্যান চর্চা করে আসছে

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হচ্ছে যোগ-মেডিটেশন

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কী বলে?

যোগচর্চা করে সত্যিই কি কোনো কাজ হয়? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র কি যোগধ্যানের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সমর্থন করে? এমনি নানা প্রশ্ন পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই ষাটের দশক থেকে। রোগ নিরাময়ে যোগধ্যানের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করার আগপর্যন্ত তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল–সুস্থ হতে হলে গিলতে হবে মুঠো মুঠো ওষুধ কিংবা শরণাপন্ন হতে হবে ছুরি-কাঁচির।

যোগব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু, তা বের করার জন্যে গত ৫০ বছরে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্বের প্রভাবশালী মেডিকেল জার্নাল *ল্যান্সেট*। তাতে বলা হয়, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে যোগব্যায়াম অত্যন্ত কার্যকরী।

এরপর একে একে *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল, জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন, জার্নাল অব আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি, জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস*হ বিশ্বের প্রথমসারির প্রায় সকল মেডিকেল জার্নালে যোগধ্যানের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য গবেষণায় সারাবিশ্বে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ যোগব্যায়ামকে বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এ পর্যন্ত যোগ-মেডিটেশনের প্রসারে তারা বরাদ্দ করেছে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একদল গবেষক ১৭ হাজার রোগীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা দেখেন, যে-সব রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যোগ-মেডিটেশন চর্চা করেছেন, তাদের চিকিৎসা-ব্যয় কমে গেছে ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ যোগচর্চা বছরে জনপ্রতি ২৩৬০ ডলার বা প্রায় দুই লক্ষ টাকা সাশ্রয় করে।

এসব নানা কারণে পাশ্চাত্যে ক্রমশ বাড়ছে যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ। ২০১২ সালে সে-দেশের দু-কোটি মানুষ নিয়মিত যোগব্যায়াম চর্চা করত। পাঁচ বছরের মাথায় যোগব্যায়াম চর্চাকারীর সংখ্যা দেড়গুণ বেড়ে তিন কোটি ৭০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার সাড়ে ১১ শতাংশ।

ভারতে যোগ-মেডিটেশনের সরকারি স্বীকৃতি

স্বাস্থ্যের ওপর যোগব্যায়ামের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করে ভারতে ২০১৫-১৬ সালে ঘোষিত বাজেটে যোগ-মেডিটেশনের ওপর পূর্ব-আরোপিত সার্ভিস ট্যাক্স স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে রাজ্য সরকারগুলোর প্রতি নির্দেশ জারি করে যেন শিক্ষার্থীদের সুস্থ দেহ ও সতেজ মন অর্জনে যোগব্যায়াম চর্চায় আগ্রহী করে তোলা হয়।

একই বছর 'ইয়োগা ট্রেনিং ফর পুলিশ পার্সোনেল' স্কিমের আওতায় যোগচর্চাকে ভারতীয় পুলিশ সদস্যদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়।

যোগ-মেডিটেশনের ওপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের ভ্যাট প্রত্যাহার

ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর যোগ-মেডিটেশনের সার্বিক উপকারিতা দীর্ঘ একবছর যাবৎ পর্যবেক্ষণ শেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি দেশব্যাপী যোগ-মেডিটেশন প্রশিক্ষণের জন্যে ১০ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করে। ২০১১ সালে ব্রিটিশ সরকার যোগ-মেডিটেশনের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

যোগচর্চাকারীদের জন্যে আরো আনন্দের সংবাদ হলো, ইংল্যান্ডের শিক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড টিম্পসন গত বছর সংসদীয় আলোচনায় বলেন, অনলাইন আসক্তি থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্যে ইংল্যান্ডের স্কুলগুলোতে যোগ-মেডিটেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি ও আগ্রাসী আচরণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ইংল্যান্ডের স্কুলগুলো যোগ-মেডিটেশনকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করছে।

বাংলাদেশেও জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালায় যোগ-মেডিটেশন

জাতিসংঘ ও ভারত কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার একবছর আগেই ২০১৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসা নীতিমালায় বলা হয়, চিকিৎসকগণ যেন স্ট্রেস-আক্রান্ত ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়মিত যোগ-মেডিটেশন, শিথিলায়ন, দমচর্চার পরামর্শ দেন।

যে রোগে উপকারী যে আসন

গোমুখাসন

ব্যাকপেইন, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, পাইলস্, আর্থ্রাইটিস, হৃদরোগ

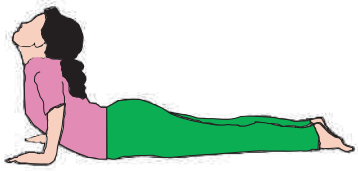

টনসিল, ঠান্ডা/ সর্দি, হজমশক্তি বৃদ্ধি, মেয়েলি সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, স্পন্ডিলাইটিস

কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটের চর্বি কমানো, ওজন নিয়ন্ত্রণ, দেহের গঠন সুন্দর

উষ্ট্রাসন

হস্তপদাসন

নিম্ন রক্তচাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, উচ্চতা বৃদ্ধি, পেটের চর্বি কমানো

সর্বাঙ্গাসন

কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস্, টনসিল, ঠান্ডা/ সর্দি/ কাশি

বজ্রাসন

হৃদরোগ, অনিদ্রা, আর্থ্রাইটিস, পাইলস্

অন্যান্য রোগে উপকারী আসন সম্পর্কে জানতে দেখুন : *রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা* (পৃষ্ঠা ১০৮-১১১)

যোগ-মেডিটেশনের সাথে চাই সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক জীবনাচার

yoga.quantummethod.org.bd

গড়ে তুলুন সঠিক খাদ্যাভ্যাস

- পর্যাপ্ত তাজা ফলমূল, সালাদ এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ করে একজন মানুষ অনায়াসে সুস্থ থাকতে পারেন।
- করলা, বাঁধাকপি, ডাঁটা, লালশাক, পুঁইশাক, সজনেসহ মৌসুমি ও আঁশজাতীয় সবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে খান।
- সোয়া লক্ষ মানুষের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, ফ্রেঞ্চফ্রাই, চিপস, কোমল পানীয়, মিষ্টি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার ওজন বাড়ায়। অন্যদিকে বাদাম, টক দই, তাজা ফলমূল, আঁশজাতীয় শাক-সবজি এবং পূর্ণ শস্যদানা জাতীয় খাবার ওজন কমায়। তাই বর্জন করুন সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবার ও ফাস্টফুড। যথাসম্ভব প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হোন।
- খাদ্যতালিকায় যতদূর সম্ভব কমিয়ে দিন গরু ছাগল মহিষ ভেড়া ইত্যাদির গোশত। এর বদলে খান সামুদ্রিক মাছ।
- সব ধরনের তেলে সম্পৃক্ত চর্বি থাকে, যা শরীরে প্রবেশের পর কোলেস্টেরলে রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও তেলের পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটে থাকে ওমেগা-৬ ফ্যাটি এসিড, যা শরীরের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পারে। তাই দৈনন্দিন খাবারে তেলের পরিমাণ যত কম থাকে তত ভালো।

মুঠোভর্তি বাদাম খান প্রতিদিন

নিয়মিত বাদাম খাওয়ার সাথে সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিদিন ৫০ গ্রাম বাদাম ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাড়ির রোগসহ নানা রোগ থেকে আপনাকে দূরে রাখবে। কারণ বাদামে রয়েছে শরীরের জন্যে দারুণ উপকারী বাদামের ফ্যাট। শুধু তা-ই নয়, এতে আরো রয়েছে প্রচুর উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার এবং এন্টি-অক্সিডেন্টের মতো প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান।

দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ফাইটোস্টেরল। এর সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে বিজ্ঞানীরা বাদামকেই চিহ্নিত করেছেন। ত্বক, চুল ও পেশির জন্যে বাদামের ভিটামিন বি কমপেক্স ও ভিটামিন ই অত্যন্ত উপকারী।

নিয়মিত দমচর্চা আপনাকে রাখবে সুস্থ

দমের মধ্য দিয়ে শরীরে শুধু অক্সিজেনই প্রবেশ করে না, এক ধরনের প্রাণশক্তিও প্রবেশ করে। *প্রাণায়াম* দেহকে জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হৃৎস্পন্দন থাকে স্বাভাবিক। ধমনীকে করে তোলে অধিকতর নমনীয় এবং সেইসাথে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে রাখে সক্রিয়।

অনিদ্রা-রোগীদের বেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে ২০ মিনিট প্রাণায়াম সুনিদ্রা আনে। দিনে কয়েকবার প্রাণায়াম অনুশীলন শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা ৩৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি সপ্তাহে দুবার করে যারা টানা আট সপ্তাহ যোগ ব্যায়াম এবং প্রাণায়াম করেছেন, তাদের উদ্বেগজনিত অসুস্থতার হার কমে গেছে অনেকটাই। *(টাইম ম্যাগাজিন, ১৬ নভেম্বর ২০১৫)*

আর প্রতিদিন অন্তত ২০ মিনিট হাঁটুন। হাঁটার গতি হবে ঘণ্টায় চার মাইল। অর্থাৎ মিনিটে প্রায় ১০০ কদম।

পানি পানে সজীব ত্বক, উজ্জ্বল তারুণ্য

চুমুকে চুমুকে পানি পান করুন সারাদিন। আপনার ত্বক দিন দিন হয়ে উঠবে আরো সজীব, প্রাণদীপ্ত। ভারী পরিশ্রম ও ব্যায়ামের আগে-পরে যথেষ্ট পানি পান করলে ক্লান্তি দূর হওয়ার পাশাপাশি অযাচিত পেশি-সংকোচনের ঝুঁকি কমে।

পর্যাপ্ত পানি পানে অভ্যস্ত যারা, তাদের ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে। কারণ প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বিপাকক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে শরীরে ফ্যাট জমে। এছাড়াও পানি ক্ষুধার অনুভূতি কমায়। তাতে অতিভোজনের সুযোগ কমে, খাদ্যগ্রহণ হয় পরিমিত। আবার ক্ষুধামন্দাতেও পানি পান কার্যকরী।

পানি পেশি ও কোষে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। এছাড়াও শরীরের গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ ও ছোট-বড় সব অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক আর্দ্রতা ও নমনীয়তা অটুট রাখতেও পানির ভূমিকা অনন্য। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস পানি পানের অভ্যাস করুন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে, সহজে পেটের কোনো পীড়া হবে না। দিনে অন্তত দেড় থেকে তিন লিটার পানি পান করুন।

কোয়ান্টাম ইয়োগা ও অন্যান্য ব্যায়ামের মধ্যে পার্থক্য

কোয়ান্টাম ইয়োগা	বৈশিষ্ট্য	অন্যান্য ব্যায়াম
কোয়ান্টাম ইয়োগা মনোদৈহিক ব্যায়াম। শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রাণবন্ততা–দুটোই অর্জিত হয়।	মানসিক প্রশান্তি	শুধু শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই ব্যায়াম হয়। মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয় না।
ধীরে ধীরে দেহকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। ফলে তারুণ্য বজায় থাকে দীর্ঘদিন।	তারুণ্যের স্থায়িত্ব	খুব দ্রুত স্থূলতা কমানোর চেষ্টা করা হয় বলে ত্বকে ভাঁজ পড়ে, চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ তাড়াতাড়ি পড়ে।
শরীরের কোনো ক্ষয় হয় না; তাই ক্ষয়পূরণের জন্যে কোনো বাড়তি বিশেষ খাবারেরও প্রয়োজন নেই।	বাড়তি খাবারের প্রয়োজনীয়তা	শারীরিক ক্ষয়সাধন হয়। ফলে তা পূরণের জন্যে বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয়।
স্নায়ু ও পেশি দুয়ের সুস্থতাই নিশ্চিত করা যায়।	স্নায়ু ও পেশির সুস্থতা	শুধু পেশিগুলোরই ব্যায়াম সম্ভব, স্নায়ুর নয়।
দেহের গড়ন সুগঠিত ও সুললিত হয়। চেহারায় কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।	দেহের গঠন ও লাবণ্য	দেহ স্লিম হয় কিন্তু চেহারায় লাবণ্য থাকে না, কাঠখোট্টা লাগে।
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো থেকে নিঃসৃত হরমোন প্রবাহ স্বাভাবিক হয়। ফলে আচার-আচরণ, আবেগে নিয়ন্ত্রণ আসে, মনোযোগ বাড়ে।	আবেগের ভারসাম্য	প্রচুর স্ট্রেস পড়ে, তাই আবেগে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়, কোলেস্টেরল বেড়ে যায়, দেহের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়।

সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টাম ইয়োগা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভারে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২২৪ জন পুরুষ ও ১০৪ জন মহিলাসহ মোট ৩২৮ জন নবনিযুক্ত বিসিএস ক্যাডার (প্রশাসন)। ২ ও ৩ ডিসেম্বর ২০১৬

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৩৩ জন পুরুষ ও ৭ জন মহিলাসহ মোট ৪০ জন সহযোগী অধ্যাপক অংশ নেন। ২৪ নভেম্বর ২০১৮

সুপ্রীম কোর্ট বার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে ২৫ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষসহ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের মোট ৬৫ জন আইনজীবী অংশ নেন। ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'ইয়োগা শিখুন, স্মার্ট জীবনযাপন করুন' শীর্ষক ওয়ার্কশপে অংশ নেন ১১৫ জন শিক্ষার্থী।

পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে ইয়োগা চর্চা করছেন ১২০৬ জন নবনিযুক্ত নারী পুলিশ কনস্টেবল (৭ আগস্ট ২০১৬)। এ পর্যন্ত ইয়োগা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৩,৪৫১ জন নারী পুলিশ কনস্টেবল।

জনপ্রিয় হচ্ছে কোয়ান্টাম ইয়োগা

- ☐ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভার এবং গাজীপুরে টেলিকমিউনিকেশন্স স্টাফ কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২২টি ব্যাচ। এতে অংশ নিয়েছেন ১,১১৭ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ২৬৬ জন উপ-সচিব ও ১২৪ জন যুগ্ম-সচিব।
- ☐ জুডিশিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নেন নবনিযুক্ত ৪৫ জন সহকারী বিচারকসহ মোট ৫০ জন।
- ☐ নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে অংশ নেন ৩৪৮ জন।
- ☐ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ-এর ৫০ জন প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
- ☐ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট ক্যাডেট কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ☐ আড়ং, ইউনিলিভার, কেয়ার, লিডস্ প্রভৃতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : বিশ্ব যোগ দিবস সংখ্যা, জুন ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

জুলাই ২০১৯

দক্ষিণ ভারতে কমিউনিটি বেইজড প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তক ডা. সুরেশ কুমার

সুস্থ জীবনাচারই পরিতৃপ্ত মৃত্যুর চাবিকাঠি

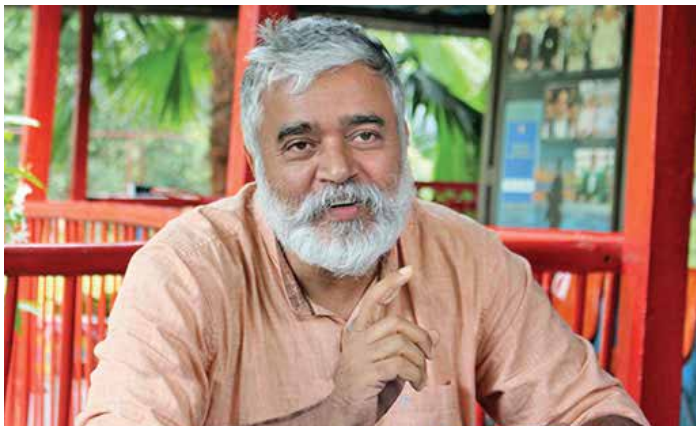

‘আমি যদি জীবনের সুস্থ-স্বাভাবিক দিনগুলোতে ভালো থাকার চর্চা না করি–সেটা দেহের হোক বা মনের–তাহলে কখনোই প্রত্যাশা করতে পারি না যে, আমার শেষ দিনগুলো সুখের হবে। এটাই বাস্তবতা। তাই আমার কথা হলো, Living well is the key to dying well. Meaningful and purposeful life is the key to peaceful death. কোয়ান্টামের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমেও আমি দেখছি এই একই চিন্তার প্রতিফলন–ধর্মবর্ণনির্বিশেষে কোয়ান্টামও সব ধরনের মানুষকে সুস্থ সুন্দর অর্থময় ও লক্ষ্যপূর্ণ জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলছে।’

কথাগুলো বলেন দক্ষিণ ভারতের কেরালায় কমিউনিটি বেইজড প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তক এবং ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়েটিভ মেডিসিন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন পরিচালক ডা. সুরেশ কুমার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদের সাথে তিনি ১৪-১৬ জুন বান্দরবান লামার কোয়ান্টামম সফর করেন। অনানুষ্ঠানিক এ সফরে তিনি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ, চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ান এবং ১৯ জুন ঢাকার শান্তিনগরে কোয়ান্টাম ল্যাব পরিদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ মৃত্যুবরণ করে আকস্মিকভাবে। বাকি ৮৫ ভাগ মানুষের শেষ বিদায়টি হয় স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি রোগ কিংবা বার্ধক্যজনিত দুর্দশার তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। উপরন্তু নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত কেউ যখন জানতে পারেন যে, মৃত্যু আসন্ন; তখন দৈহিক যন্ত্রণার পাশাপাশি মানসিক আত্মিক সামাজিক–সবদিক থেকেই তিনি মুষড়ে পড়েন। এই মানুষদের ভোগান্তি কমাতেই কাজ করে প্যালিয়েটিভ কেয়ার।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে প্রচলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাব্যবস্থার বাইরে সামাজিক পর্যায়ে প্রথম বিস্তৃত করেন ডা. সুরেশ কুমার। ১৯৯৩ সাল থেকেই তিনি এ ব্যাপারে কেরালার সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে থাকেন। এভাবেই ক্রমশ ওখানে প্যালিয়েটিভ কেয়ার হয়ে ওঠে সমাজভিত্তিক একটি কার্যক্রম। বর্তমানে এর রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল। এ কার্যক্রমের অর্থের জোগানও দেন এ স্বেচ্ছাসেবকরাই। ডা. সুরেশ মনে করেন, দাতা সংস্থাগুলো থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তার চেয়ে নিজেদের সাধ্যমতো দান বেশি কার্যকর।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার ব্যবস্থায় সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তোলার এ ধারণাটি বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত একটি মডেল। ভারতে রয়েছে এর ১৫০০টি শাখা, যার ১৩৫০টি খোদ কেরালাতেই। বাংলাদেশসহ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কাতেও অনুসরণ করা হচ্ছে এই ‘কেরালা মডেল’।

কথাপ্রসঙ্গে ডা. সুরেশ বলেন, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন এই কাজের শুরুতে আমার মহৎ কোনো চিন্তা বা উদ্দেশ্য ছিল কিনা? আমি বলি, ঠিক তা নয়, আসলে এটা করতে আমার ভালো লাগে, তাই করি। আর এ প্রয়োজনীয় কাজটি তো কাউকে না কাউকে করতে হবে।

এ-ছাড়াও আমি বিশ্বাস করি, চিকিৎসকরা যখন রোগীর সেবা করেন বা কেউ যখন অন্য কোনো সেবামূলক কাজ করছেন তখন কিন্তু তিনি সেবাগ্রহীতাকে করুণা করছেন না; বরং নিজেই নিজেকে সাহায্য করছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমাগত শিখছেন এবং জীবন সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি লাভ করছেন। নিজের উত্তরণ ঘটাচ্ছেন। তাই পরার্থে কাজ করতে হবে সদিচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে; অন্যকে করুণা করছি, তা ভেবে নয়।

আমি সবসময় চেষ্টা করি রোগীর কথা মন দিয়ে শুনতে। এ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি, কারণ প্রতিটি মানুষেরই একটি করে গল্প আছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কেউ কেউ তার জীবনীশক্তির জোরে সমস্ত ভোগান্তি ও প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারেন। নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেন। আবার উল্টোটাও দেখেছি। আসলে কে কীভাবে জীবনকে দেখছেন, তার ওপরই নির্ভর করে ভালো থাকা।

ঢাকায় তিন মাস পর কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

আগামী ২, ৩, ৪ ও ৫ আগস্ট (শুক্রবার-সোমবার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৬১ তম ব্যাচ। ভেন্যু : ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তন। জীবনকে সুস্থতা প্রশান্তি সাফল্যের পথে এগিয়ে নেয়ার অভিযাত্রায় অংশ নিন আপনিও। সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতিতে মেডিটেশন শেখার পাশাপাশি এ কোর্সে রয়েছে সর্বতোভাবে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশনা।

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে ঢাকায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের পূর্ববর্তী ব্যাচটি।

দীর্ঘ ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড হলো সাফল্যের সরলপথ। একজন মানুষকে যা সাহায্য করে জীবন সম্পর্কে সঠিক ও আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে, উদ্বুদ্ধ করে তার ভেতরের ইতিবাচকতা বিকাশে, অনুপ্রাণিত করে আত্মশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণে।

এ কোর্সের শিক্ষা একজন মানুষকে মুক্তি দিতে পারে এ-কালের অভিশাপ ভার্চুয়াল ভাইরাসের আসক্তি থেকে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, অনলাইন গেম, ভিডিও গেম, ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন আসক্তিসহ যাবতীয় ভার্চুয়াল ভাইরাসকে প্রতিহত করতে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স।

সেইসাথে কোর্সের অর্জন ও ইতিবাচক পরিবর্তনকে স্থায়ী রূপ দিতে রয়েছে কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নেয়ার সুযোগ। বছরে অন্তত দু-তিন বার সপরিবারে কোর্স রিজুভিনেশনে অংশগ্রহণ আপনার পরিবারকে করে তুলবে পারস্পরিক সমমর্মিতা ও অনুপ্রেরণার অফুরান উৎস।

প্রায় তিন দশকের পথ পরিক্রমায় মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে যেমন উপকৃত হচ্ছেন দেশের লক্ষ মানুষ, তেমনি এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে পরিবারে, সমাজে ও জাতীয় জীবনে। তাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে নিজে অংশ নিন। উদ্বুদ্ধ করুন আপনার আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিত-স্বজনদের।

ড. মো. সাহাদ চৌধুরী। প্রাক্তন কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস ও বিশিষ্ট লেখক। লেখালেখির জগতে তিনি বিশু চৌধুরী নামে সুপরিচিত। তার রচিত 'স্বর্ণশিখর' বাংলা আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও বহুল প্রশংসিত গ্রন্থ। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৭ ব্যাচে অংশ নেন। ১৭ জুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় 'নিবিষ্ট চাওয়া' বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার সেই আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

শুদ্ধ চাওয়াকে স্রষ্টাই পূর্ণতা দেন

ড. মো. সাহাদ চৌধুরী

গুণীজনরা বলেন, বড় কিছু পেতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন মানে কী? স্বপ্ন মানে আসলে ছক কাটা। কারণ আমাকে জানতে হবে–আমি কী চাই। আমার লক্ষ্য, স্বপ্ন, ছক যত স্পষ্ট হবে আমার অর্জনও হবে স্বাভাবিকভাবে তত বেশি। আত্ম উন্নয়নের মূল কথা এটাই।

এ কথাগুলো সেই তরুণ বয়সেই আমি জেনেছি কাজীদা–এদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের পুরোধা কাজী আনোয়ার হোসেন এবং গুরুজী মহাজাতকের কাছে। তারা দুজন ছিলেন প্রফেসর এম ইউ আহমেদের শিষ্য। পরবর্তীতে আত্ম উন্নয়ন বিষয়ে আমার লেখালেখির অনুপ্রেরণাও গুরুজী। তিনি একবার বলেছিলেন, 'লেখার ক্ষমতা পেয়েও না লিখলে আপনাকে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ এ ক্ষমতা তাঁর দেয়া।'

আমার জীবনে প্রথম আত্ম উন্নয়নমূলক বইটির সন্ধান আমি পাই ১৯৬৮ সালে, বড় ভাইয়ের বইয়ের আলমারিতে। নেপোলিয়ান হিলের লেখা *ল'জ অব সাকসেস ইন সিক্সটিন ওয়েজ।* বইটির মোট ১৬টি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই লেখা–You can, if you believe you can. তুমি পারবে যদি তুমি বিশ্বাস করো যে, তুমি পারবে। কথাটা আমাকে খুব আলোড়িত করেছিল সে-সময়।

নেপোলিয়ান হিল এ বইটিতে কিছু সাফল্যকৌশল বাতলে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল–'আপনি যা চান তা একটি কাগজে সুস্পষ্টভাবে লিখুন। ওটা পকেটে বা মানিব্যাগে রাখুন। মাঝে মাঝে দেখুন। জোরে জোরে পড়ুন।'

তখন আমার কৈশোরোত্তীর্ণ বয়স, আমি দেখলাম এর মধ্যে একটা সাসপেন্স আছে। আমিও লিখে ফেললাম আমার একটা লক্ষ্য।

ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু ম্যাট্রিকের ফল সে অনুযায়ী অতটা ভালো হয় নি। মনটা স্বভাবতই খারাপ। আর বইটা যখন হাতে পাই তখন আমি উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র। ঢাকা কলেজে পড়ি। তো আমিও আমার লক্ষ্য ঠিক করে কাগজে লিখে ফেললাম–'উচ্চ মাধ্যমিকে আমি বোর্ডে প্রথম হবো।'

লিখলাম বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকি–কে কখন দেখে ফেলে! হাসির পাত্র হবো তাহলে। মাঝে মাঝে কাগজটা খুলে দেখি। এর মধ্যে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা হলো। আমি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। কোথায় বোর্ডে প্রথম আর কোথায় দ্বিতীয় বিভাগ! ভাবলাম, কিছুই তো হলো না–কাগজটা ফেলে দিই। আবার ভাবলাম, দেখি না কী হয়, একটা স্মৃতি হিসেবেই না-হয় থাকুক কাগজটা।

যা হোক, একসময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় হয়ে এলো। পরীক্ষা দিলাম। ফল প্রকাশের দিন আমার মেজো ভাই ড. নঈম চৌধুরী, যিনি বর্তমানে এটমিক এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান, খবরের কাগজ পড়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, তোমার না রেজাল্ট বেরিয়েছে, দেখেছ? আমি কিছুটা ঢিলেঢালা ভঙ্গিতেই বললাম, দেখব, এত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? তিনি বললেন, তুমি রেজাল্ট দেখো নি এখনো? তুমি বোর্ডে চতুর্থ হয়েছ!

আমি হতবাক। এ-ও কি সম্ভব? পরে বুঝেছি, এসব পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম আর চতুর্থ স্থানধারীর নম্বরের পার্থক্যটা থাকে খুব সামান্যই এবং ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের রেজাল্ট বের হওয়ার পর নিজের লক্ষ্য অর্থাৎ কাগজের লেখাটা নিয়ে ঐ দ্বিধাটুকু যদি না থাকত, তবে আমি বোর্ডে ঠিক প্রথমই হতাম।

সত্যিকার চাওয়াটা আসলে এমনই। চাওয়া যদি নিখুঁত হয়, আন্তরিক হয়, এর জন্যে কর্মপরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তবে লক্ষ্যে আপনি পৌঁছবেনই। কে যেন আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে। কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলীর কথাই ধরুন। তিনি যখন নিজের ব্যাপারে বলতেন যে, তিনি একজন বিশ্বসেরা মুষ্টিযোদ্ধা, তখনো তার তেমন কোনো পরিচিতিই ছিল না। একসময় তার অবচেতন মনই ক্রমান্বয়ে তাকে নিয়ে গেছে তার কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে।

এটাই হয় আসলে। তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কোনোই বিকল্প নেই। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটা কথা আছে–'তুমি যদি উড়তে না পারো তবে দৌড়াও, দৌড়াতে না পারলে হাঁটো, তা-ও না পারলে হামাগুড়ি দাও। যা-ই করো, এগিয়ে তোমাকে যেতে হবেই।'

এ পি জে আব্দুল কালাম তার আত্মজীবনীতে থিরুক্কুরাল নামে একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। দুহাজার বছর আগে তামিল সাধক থিরুভাল্লুভার রচিত এ বইটি মূলত সহস্রাধিক ছোট ছোট নীতিকথা ও হিতোপদেশের একটি সংকলন। তাতে একটি কথা আছে–তুমি আকাঙ্ক্ষা করো। তোমার আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার লক্ষ্যে।

আকাঙ্ক্ষা বা চাওয়া নিবিষ্ট হলে, তাতে শতভাগ আন্তরিকতা থাকলে পরম করুণাময় কীভাবে তা পূরণ করেন, তার আরেকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নিজের জীবন থেকেই দিতে পারি।

সেবার রোমে গেছি। ভিসুভিয়াস দেখতে যাব। শৈশব থেকে এত পড়েছি ও শুনেছি ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির কথা। নির্ধারিত দিনে ভিসুভিয়াস পাহাড়ের নিচে সমবেত হলাম আমরা তিন সহকর্মী। চূড়া পর্যন্ত মোট উচ্চতা ১২৮০ মিটার, এর মধ্যে ৬০০ মিটার পর্যন্ত গাড়িতে ওঠা যায়। বাকিটা উঠতে হবে হেঁটে।

দিনটা ছিল বৃষ্টি আচ্ছন্ন, মেঘলা। সহকর্মী দুজন বয়সে তরুণ, ওরা তরতর করে উঠে যাচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে উঠছি। বার বার পিছিয়ে পড়ছি। আমার কষ্ট বুঝতে পেরে ওরা বলল, স্যার, আপনি না-হয় এখানেই থাকুন। বিশ্রাম নিন। আমরা চূড়াটা ছুঁয়েই খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব। আমি বললাম, শোনো, আমার একটি লক্ষ্য আছে। আমি ভিসুভিয়াসের চূড়ায় উঠব এবং সোচ্চারে ঘোষণা করব–সমস্ত প্রশংসা তাঁর!

ওরা আর কিছু বলল না। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পর অবস্থা এমন হলো যে, আমার সারা শরীরে ব্যথা। আমার হার্টও তখন ছিল বেশ দুর্বল। সবমিলিয়ে আর নড়তেই পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল একটা বাঁশের লাঠি যদি কোনোক্রমে পেতাম এখন, তাতে অন্তত ভর দিয়ে ওঠা যেত। কিন্তু তা কি হয়? এখানে কোথায় পাব তেমন লাঠি?

একটু জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে বসে বসে এসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি সহকর্মীদের একজন ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে, তার হাতে আমার বুক-সমান একটা বাঁশের লাঠি! কাছে এসে সে বিনয়ের সাথে বলল, স্যার, এটা কি আপনি ব্যবহার করবেন? পাহাড়ে উঠতে কিছুটা সুবিধে হবে।

আমি বিস্মিত! এমনটাও ঘটে? অতঃপর সেই পড়ন্ত বেলায় মেঘে ভিজতে ভিজতে লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে আমি ভিসুভিয়াসের চূড়ায় পৌঁছলাম। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলাম চারপাশ। ভাবছিলাম এ কী করুণা তাঁর! আমার সমস্ত চেতনা দিয়ে বললাম, প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমার। এ অবস্থানে এ উচ্চতায় আমাকে আসার সুযোগ ও সামর্থ্য দেয়ার জন্যে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো।

আসলে কাতর হৃদয়ে মানুষের একান্ত চাওয়াতে স্রষ্টা এভাবেই সাড়া দেন। এজন্যে আমাদের প্রত্যেককেই একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। পড়তে হবে, জানতে হবে এবং পরম করুণাময়ের কাছে সমর্পিত হতে হবে। মানুষের যে-কোনো শুদ্ধ চাওয়াকে পূর্ণতা তিনি দেনই।

অভিজাত রেস্তোরাঁর খাবার বর্জন করুন খাদ্য সন্ত্রাসের কবল থেকে বাঁচুন

গ্রামটির নাম ছিল সুখী গাঁ। কিন্তু এখন ওটাই হয়েছে দুখী গাঁ। কেন? চলুন শোনা যাক কী বৃত্তান্ত–

ছোট্ট গ্রামের পরিশ্রমী মানুষগুলো সুখেই ছিল। শাকসবজি, ফলমূল আর বাড়ির রান্না করা খাবার খেয়ে সুস্থ জীবনযাপন করত তারা। তিন দশক আগে দুই বিদেশি বন্ধু এলো সেখানে। প্রথমজন শুরু করল খাবারের ব্যবসা। গ্রামের মানুষকে বোঝাল সে–

জাতে উঠতে হবে, তাই খেতে হবে ভিনদেশি প্রক্রিয়াজাত খাবার। গ্রামের মানুষকে জাতে (!) তোলার মোহে মাতিয়ে তুলল সে। কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্ট ...। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় তার দোকান হলো। এরই মাঝে দ্বিতীয় বিদেশি গড়ে তুলল ঝকঝকে ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

কোমল পানীয় আর প্রসেসড ফুড খেয়ে মানুষ আক্রান্ত হতে লাগল কিডনি জটিলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে। অসুস্থ হয়ে আর যাবেই বা কোথায়? ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ক্লিনিকের পেছনে দেদারসে খরচ হতে লাগল তাদের অর্থসম্পদ। এখন সে গ্রামে প্রতি সাত জনে একজন কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত এবং প্রতি ১৬ জনে একজন ভুগছে ডায়াবেটিসে। বিদেশি বণিকদ্বয় তো বেজায় খুশি। কারণ গ্রামের প্রতিটি মানুষের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ (খাবার ও চিকিৎসাব্যয় বাবদ) প্রতি মাসে ঢোকে তাদের পকেটে। তাদের মুখের হাসি দিনে দিনে চওড়া হচ্ছে বটে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা দেখে আশপাশের গ্রামের মানুষ এ গ্রামের নাম রেখেছে দুখী গাঁ।

পাঠক, এই রূপক গল্পের সাথে যদি বাস্তবের কোনো মিল খুঁজে পান, তাহলে সেটা কোকিলতাল মাত্র! তবে সময়ের সাথে সাথে আমাদের ব্যস্ত জীবনে ঢুকে পড়েছে অনেক আধুনিক (!) অভ্যাস। তার একটি হলো নিত্যনতুন রেস্তোরাঁয় খাওয়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উসকানি আর মিডিয়ার অপপ্রচারে বন্ধুরা মিলে রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়া আর সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দেয়া এখন হালের ট্রেন্ড!

এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে খাবারের অর্ডার দেয়ার ফুটানি। কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে, তাই কর্মব্যস্ত দিনশেষে বাসায় রান্নার ঝামেলা এড়াতে সহজ পন্থা–অনলাইনে খাবার অর্ডার। এ-ছাড়া বিশেষ দিবস ও বিভিন্ন উপলক্ষে এখন সপরিবারে বাইরে খেতে যাওয়া পরিণত হয়েছে ফ্যাশনে। এভাবেই আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি সমস্যাসহ দীর্ঘমেয়াদি রোগব্যাধিকে। নামী রেস্তোরাঁর আকর্ষণীয় মোড়ক লাগানো দামি এ খাবারগুলো খেয়ে কীভাবে শরীরের বারোটা বাজছে আসুন দেখি–

বেকারি আর ফাস্টফুড ॥ খাদ্য সন্ত্রাসের নতুন রূপ

একটা সময়ে স্বনামখ্যাত বেকারিগুলোর প্যাকেট দেখে বিস্কুট, পাউরুটি, চানাচুর, বাটার বান, পেটিস, কেক নিশ্চিন্তে কিনত মানুষ। কারণ দিনের বানানো খাবার দিনেই বিক্রি করত তারা। কিন্তু এখন সে যুগ হয়েছে বাসি, নীতির গলায় লোভ দিয়েছে ফাঁসি!

কোনো বেকারির খাবারই এখন আর নিরাপদ নয়। কারণ মুনাফার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীরা মোড়কে উৎপাদনের প্রকৃত দিন-তারিখ লাগান না। লাগান তা-ই, যা দেখলে ক্রেতা প্রতারিত হয়ে নষ্ট খাবার কিনবেন। ফলে বাড়ছে মুনাফা, বাড়ছে ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পসার।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়, সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন আর সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে বেরিয়ে এসেছে থলের বেড়াল। উৎপাদন খরচ কমিয়ে অধিক মুনাফা করতে রংচঙা ফাস্টফুডের দোকান আর বেকারিগুলোতে চলছে রীতিমতো গোটা জাতিকে ভগ্নস্বাস্থ্য করার ষড়যন্ত্র! কীভাবে?

- শৌচাগারের পাশে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি করে কর্মীরা। তাদের নিজেদের পরিচ্ছন্নতার কোনো বালাই নেই। সরাসরি ওয়াসার বা ময়লা পানি ব্যবহার করা হয় খাবার তৈরিতে।
- জন্মদিনের কেক আর আইসক্রিমের ক্রিম বানাতে ব্যবহার করা হয় ক্ষতিকর চর্বি, কেমিক্যাল ফ্লেভার, পামঅয়েল ও কাপড়ের রং। যে রং কাপড়ে লাগালে বছরের পর বছর ধুলেও মলিন হয় না, সেই রং! কারণ ফুড গ্রেড কালারের দাম কাপড়ের রংয়ের চেয়ে আট/ দশগুণ বেশি।
- চানাচুর মচমচে করতে পোড়া পামঅয়েলে ভাজা হয়। খরচ বাঁচাতে মিষ্টিতে চিনির বদলে মেশানো হয় নিষিদ্ধ স্যাকারিন এবং ঘন চিনি বা সোডিয়াম সাইক্লামেট। টমেটোর সস তৈরি হয় কিছু রাসায়নিক উপাদান আর কাপড়ে দেয়া রং মিশিয়ে, যেখানে থাকে না টমেটোর 'ট'-ও।
- রান্নার জন্যে বাতিল তেল কম দামে কিনে আনা হয়। সস্তা, মেয়াদোত্তীর্ণ, পোড়া তেল ব্যবহৃত হয় খাবার বানাতে। একই তেল বার বার ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক। মেয়াদোত্তীর্ণ রুটি দিয়ে বানানো হয় বার্গার, স্যান্ডউইচ, পিৎজা।
- বাসি, পচা, ফাংগাস পড়া মাংস দিয়ে কিমা বানিয়ে ক্রেতাদের ধোঁকা দেয়া হয়। মরা মুরগি দামে সস্তা বলে তাদের প্রথম পছন্দ ওটাই!
- খাবার সুস্বাদু করার জন্যে ব্যবহার করা হয় নিষিদ্ধ কেমিক্যাল। কেমিক্যাল মিশিয়ে পচা ফলের জুস বিক্রি হয়।

ঘন চিনি বা সোডিয়াম সাইক্লামেট। স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে সারা পৃথিবীতেই এটি নিষিদ্ধ। এর সাথে বিষাক্ত সার ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিকল্প চিনি, যা সাধারণ চিনির চেয়ে ৫০ গুণ বেশি ক্ষতিকর। খরচ বাঁচাতে এই ভয়ংকর বস্তুটিই ব্যবহৃত হচ্ছে মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য, চকোলেট, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, বেকারি ও বেভারেজ দ্রব্য তৈরিতে। এসব খেয়ে দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ক্যান্সার, কিডনি সমস্যা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

মিষ্টি ॥ কী অনাসৃষ্টি!

বিয়ে অথবা জন্মদিন, পরীক্ষায় সাফল্য কিংবা চাকরি–আত্মীয়-বন্ধুদের মিষ্টিমুখ করানো বহু পুরনো রেওয়াজ। আর এই সুযোগের অসদ্ব্যবহারে পটু হয়ে উঠেছে সংশ্লিষ্টরা। খুব পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সাজিয়ে রাখা হলেও সরকারের ভেজাল বিরোধী অভিযানে বেরিয়ে এসেছে–

- উৎপাদনের একদিন পরের তারিখ বসানো হয় মিষ্টি ও দইয়ের প্যাকেটের গায়ে। মিষ্টি বানানো হয় দুধ ছাড়াই! চিনির বদলে স্যাকারিন আর ঘন চিনি ব্যবহার করা হয়। মেশানো হয় টিস্যু পেপার, ক্ষতিকারক রং ও কেমিক্যাল।
- কারখানায় মিষ্টি তৈরির পর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাছি ও পোকা পড়ে থাকে মিষ্টিতে। রান্না ও সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কার করা হয় কদাচিৎ।

এসব খাদ্য সন্ত্রাসীদের জারিজুরি ফাঁস ও সরকার কর্তৃক জরিমানার কথা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরবে প্রচার হচ্ছে। তাই আশু সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। বাইরের খাবার ছেড়ে ফিরতে হবে বাড়িতে তৈরি খাবারে। ছাড়তে হবে রেস্তোরাঁর খাবার অর্ডার করার অভ্যাস। কমবে স্বাস্থ্যঝুঁকি, অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল থেকে বাঁচবে জাতীয় স্বাস্থ্য।

প্রিয় পাঠক, এ নিবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত দৃশ্যপট কাল্পনিক হলেও আশঙ্কাগুলো একেবারে অমূলক নয়। আমাদের এই সুখী মানুষের দেশ যাতে স্বাস্থ্যহীন দুখী দেশে পরিণত না হয়, সে দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার পরিবারকে।

আপনার করণীয়

- সর্বতোভাবে বাইরের খাবার বর্জন করুন। ফাস্টফুড পুরোপুরি পরিহার করুন। অফিসের লাঞ্চে, পিকনিক কিংবা বেড়ানোর সময় বাসা থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে যান।
- বিশেষ সাফল্য, বিবাহ বার্ষিকী, সন্তানের জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে মিষ্টির বদলে খেজুর বা দেশীয় ফল দিয়ে অন্যদের আপ্যায়ন করুন।
- বাচ্চাদের টিফিনে বাড়ির রান্না করা খাবার রাখুন। কর্মজীবীরা ফল বা বাসায় বানানো খাবার সাথে রাখুন। প্যাকেটজাত কেক বা বান বর্জন করুন।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

তরুণদের মূল্যবোধ জাগ্রত করছে কোয়ান্টাম

অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ

এবছর এপ্রিল মাসে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে (আরডিএ) দুই দিনের কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অ্যালামনাই হিসেবে আমি এতে অংশ নিই এবং কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানতে পারি। এরপর ঢাকায় আলোকায়ন কার্যক্রমে এসে সিদ্ধান্ত নিই, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি আমি করব।

২২ বছর ধরে আমার ব্যাকপেইন। সবসময় কোমরে বেল্ট পরতে হতো। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি আর কোনো ব্যথা অনুভব করছি না। এখন আমাকে আর বেল্ট পরতে হচ্ছে না। আমি মনে করি, যিনি যত নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করবেন, তিনি তত বেশি উপকৃত হবেন, সফল হবেন।

আমার উপলব্ধি হলো, পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে সত্যিকার অর্থে বড় করে না। তরুণদের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে তাদের সামনে একটি রোল মডেল প্রয়োজন। আর এই রোল মডেল হলো কোয়ান্টাম।

[একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৮ ব্যাচ]

২০ বছর পর কাঁদতে পেরেছি

রাবেয়া সুলতানা

গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি প্যারালাইজড হয়ে যাই। অনেক চিকিৎসার পরও শারীরিকভাবে সুস্থবোধ করতাম না। একপর্যায়ে স্বামীর উৎসাহে মেডিটেশন চর্চা শুরু করি এবং লক্ষ করি, আমার শরীর শিথিল হয়ে আসছে। অসুস্থতার জন্যে যে বিরক্তিবোধ কাজ করত, মেডিটেশন করে তা আর হচ্ছে না।

আগে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারতাম না। নিচু হয়ে কোনো জিনিস তুলতে পারতাম না। বেল্ট ছাড়া একমুহূর্ত চলতে পারতাম না। কিন্তু কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি বেল্ট ছাড়াই হাঁটাচলা করতে পারছি। রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

আমি আট বছর বয়সে আমার পিতৃসম চাচাকে হারাই। তখন থেকে আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। চাপা দুঃখগুলো কখনো প্রকাশ করতে পারতাম না। কোর্সে এসে ২০ বছর পর আমি কাঁদতে পেরেছি। আমার মনে হয়েছে, কান্নার সাথে সমস্ত রোগ-বালাই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

[গৃহিণী। ৪৫৮ ব্যাচ]

কোর্সে এসে আমি প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছি

আফরোজা জামিল কঙ্কা

চার বছর ধরে কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয়। সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে আমি নিয়মিত দান করি। সেই সূত্রেই আমি কোর্সে এসেছি। কোর্সের প্রতিটি আলোচনা এত চমৎকার ও বিজ্ঞানসম্মত যে, সহজেই মনে গেঁথে যায়।

কোর্সে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিটা এসেছে পারিবারিক মেডিটেশন থেকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার বাবা (কর্নেল জামিল বীর উত্তম) শহিদ হন। আমার বয়স তখন ১২ বছর। জীবনের এতগুলো বছর পার করেও আমি সে বেদনা কখনো প্রকাশ করতে পারি নি।

পরবর্তীতে আমার মা মারা যান ২০১২ সালে। পারিবারিক মেডিটেশনে আমার মা-বাবা দুজনকেই খুব কাছ থেকে আমি অনুভব করেছি। অনেক প্রশান্তি পেয়েছি। ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর জন্যে আমার ভেতর যে ব্যথা ছিল, ক্ষোভ ছিল, সেটা মন থেকে চলে গেছে। আমি খুব হালকা বোধ করছি।

[চিত্রশিল্পী। ৪৫৮ ব্যাচ]

মমতা দিয়ে মায়ের হাতটা ধরতে চাই

আমিনুল মুরসালিন

মেডিকেল কলেজে আমি একজন সোশ্যাল মিডিয়া সেলিব্রেটি। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে কে কমেন্ট করছে, কয়টা লাইক এলো, কে কী ইমোজি রি-এক্ট করল, এগুলোর পেছনে প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা সময় আমার নষ্ট হতো।

ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে আমি পোস্ট দিতাম– প্রাণের বাড়িতে যাচ্ছি। অথচ বাড়ি গিয়ে পরিবারকে সময় দিতাম না। মনে হতো ফেসবুকই শান্তির জায়গা। ইউটিউবে প্রচুর সময় ব্যয় করতাম।

কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমার উপলব্ধি হলো, জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ইউটিউবের জন্যে আমি হারিয়েছি। পারিবারিক মেডিটেশনে মনে হয়েছে, আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন সেই মাকে আমি কতই না কষ্ট দিয়েছি, দুর্ব্যবহার করেছি। খুব অনুশোচনা হচ্ছিল। তাই এবার বাড়ি ফিরে আমি মমতা দিয়ে মায়ের হাতটা ধরতে চাই।

[শিক্ষার্থী, বিডিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। ৪৫৮ ব্যাচ]

এত দেরিতে কেন এলাম?

জগদীশ দেবনাথ

আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ১৯৭৩ সাল থেকে ধ্যানচর্চা করি। কোয়ান্টামে আসার জন্যে দীর্ঘদিন ধরেই আমার গুরুভ্রাতা হৃদয়রঞ্জন বিশী আমাকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। আমি তাকে সবসময় বলতাম, আমি তো ধ্যানচর্চা করছি। কোয়ান্টামে গিয়ে নতুন করে কী শেখার আছে!

অবশেষে আমার মেয়ে বলল, চলো কোয়ান্টামে যাই। এত মানুষ যখন যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই ভালো কিছু আছে। আমার মেয়ে একজন ডাক্তার এবং সে নিজেও মেডিটেশনে অংশ নিয়েছে।

এখানে এসে চার দিন পর মনে হচ্ছে, এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি! আমি ২০০৩ সাল থেকে সেগুনবাগিচায় থাকি, যা কোয়ান্টামের কার্যালয় থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথ। অথচ আমি এ কোর্সে এত দেরিতে কেন এলাম?

প্রতিটি মানুষেরই এই কোর্সে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে ধ্যানচর্চার মাধ্যমে শুধু নিজের নয়, চারপাশের সবকিছুর শুভকেন্দ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানের প্রায়োগিক রূপকে গুরুজী জনমানুষের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আরেকটি বিষয় আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে, তা হলো কোর্সে মায়েদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি। কারণ প্রতিটি পরিবারে তাদের ভূমিকা অপরিসীম।

[অবসরপ্রাপ্ত আই.আর.ও, নিবন্ধন পরিদপ্তর, ঢাকা। ৪৫২ ব্যাচ]

আমি নতুন জীবন পেয়েছি

সুরাইয়া আফরোজ সুপ্তি

২০১৭ সালে আমার মেরুদণ্ডের হাড়ে টিউমার ধরা পড়ে এবং পরবর্তীতে ক্যান্সারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তারপর আমাকে ২৮টি কেমোথেরাপি দেয়া হয়েছে। তখনো আমি জানতাম না যে, আমার কী হয়েছে।

যখন আমি জানতে পারলাম, সংসার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে নানান চিন্তা আমার মনে বাসা বাঁধতে শুরু করল। আমার মন বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি শরীরে কোনো শক্তি পেতাম না, কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। ক্ষুধা লাগত না, ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম হতো না। শুধু মনে হতো, আমি মারা যাব।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোর্সের প্রথমদিন বাসায় ফিরে সংসারের কাজগুলো ক্লান্তি ছাড়াই নিজে নিজে করেছি। দ্বিতীয় দিন থেকে আমি স্বাভাবিকভাবে খাবার খেতে পারছি। সেদিন ঘুমের ওষুধ ছাড়াই খুব ভালো ঘুম হয়েছে আমার। কোয়ান্টামে এসে মনে হয়েছে–আমি নতুন জীবন পেয়েছি।

[গৃহিণী। ৪৫৮ ব্যাচ]

নিজের সম্ভাবনা বিকশিত করার পথনির্দেশ পেয়েছি

খন্দকার মো. মঞ্জুরুল আলম

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে আমাদের সন্তানেরা। একসময় সমাজের একটা দৃঢ় কাঠামো ছিল, যা এখন অনেকাংশেই ভেঙে পড়ছে। অনেকগুলো ভাই-বোন মিলে পরিবারের ভেতরে একটা সঙ্ঘ ছিল। সেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গড়ে উঠেছে ছোট পরিবার।

পরিবারই আমাদের মূল্যবোধের জায়গাটা তৈরি করেছে, শিখিয়েছে পারস্পরিক যোগাযোগ, বোঝাপড়া ও আদান-প্রদান। বর্তমানে এই ঘাটতিগুলো শিশুর বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কর্মজীবী মা-বাবারা বাধ্য হয়েই শিশুর হাতে তুলে দিচ্ছেন ডিজিটাল ডিভাইস। যন্ত্রের ভেতরে শিশুরা আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছে।

এই শিশুদের রক্ষা করা আমাদের সবার কর্তব্য। আমরা যদি শিশুকে কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো দিতে পারি, তাহলে সে মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে। সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে উঠবে বৃহত্তর সঙ্ঘ এবং আমরা এগিয়ে যাব বড় সাফল্যের দিকে।

কর্মজীবন, পরিবারের ব্যস্ততা, নানাবিধ নিরাপত্তাহীনতা–সবমিলিয়ে এখন সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য হলো প্রশান্তি। সমাজে যে যেখানে আছে, যা-কিছু সে পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, কোনোভাবেই সে প্রশান্ত হতে পারছে না। গুরুজীর আলোচনায় উপলব্ধি করলাম, প্রায় সবাই ভোগবাদিতার প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের মনোদৈহিক নানা জটিলতা এবং এর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বহুমুখী। কোয়ান্টামে এসে আমি নিজের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার এবং সফল হওয়ার পথনির্দেশ পেয়েছি।

[প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। ৪৫৭ ব্যাচ]

আমি বাঁচার স্বপ্ন দেখছি

দুর্গা দাস

সম্প্রতি আমার শরীরে একটি টিউমার ধরা পড়ে। অপারেশনের পর বায়োপসি করে ডাক্তার জানালেন যে, আমার ক্যান্সার হয়েছে। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। প্রথম কেমোথেরাপি নেয়ার পর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ছিল। মনে হতো, একমাত্র মৃত্যুই এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দেবে।

পরবর্তীতে একজন চিকিৎসকের অনুপ্রেরণায় আমি এ কোর্স করতে আসি। এখন আমার শরীরে কোনোরকম যন্ত্রণা অনুভব করছি না। আমার মন অনেক প্রশান্ত এবং আমি ভালো আছি। মেডিটেশন করে আমি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারছি।

[নবম শ্রেণি, নিতাইপাল উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ৪৫৮ ব্যাচ]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি

উম্মে হাবিবা

আমরা পরিবারের তিন জন একসাথে কোর্স করতে এসেছি। এখানে আসার আগে আমার বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রায়ই আমি প্রচণ্ড রেগে যেতাম। আমি ভাবতাম, পরিবারের কেউ আমাকে ভালবাসে না। আমার স্বামী প্রতিদিন সকালে হাঁটতে যাওয়ার সময় আমাকে বলত, চলো, হাঁটতে যাই। কিন্তু আমার মনে হতো আমার পায়ে ব্যথা, আমি কোনোদিন সুস্থ হবো না।

কোয়ান্টামে এসে আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমস্যাগুলো আমার নিজের তৈরি। মেডিটেশন করে আমার অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন রাগ এলে আর চিৎকার করছি না। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। এ-ছাড়া আমি অনেক কোমল পানীয় পান করতাম। গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর কোমল পানীয় পান করব না।

[সহকারী শিক্ষক, ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা। ৪৫৭ ব্যাচ]

ফেসবুক ডিলিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি

আবু সুফিয়ান রাসেল

আমার ডান পায়ে ও কোমরে অনেক ব্যথা ছিল। সাত বছর ব্যথার জন্যে বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছি, যার ফলে ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে একপর্যায়ে আমার পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি নিয়মিত আমার বাসায় এসে ওষুধ দিয়ে যেতেন।

আমি বিস্মিত যে, কোর্সের প্রথমদিন মেডিটেশন করার পর থেকে আর কোনো ব্যথা অনুভব করি নি এবং আমাকে ওষুধও খেতে হয় নি।

আমি বন্ধুদের প্রায়ই বলতাম, ৪৮ ঘণ্টায় দিন হলে আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারতাম। আমার সময়গুলো কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, আমি খুঁজে পেতাম না। কোর্সের দ্বিতীয় দিন বুঝতে পারলাম, আমার সময়গুলো নিয়ে নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এই ফেসবুক আমার জীবনটাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ডজনের বেশি একাউন্ট আছে আমার। এগুলোতে দিনে ৮-১২ ঘণ্টা সময় আমি কাটাতাম।

কোর্সের তৃতীয় দিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম–ডিলিট ফেসবুক। আমার স্মার্টফোনে এখন ফেসবুক অ্যাপটা আর নেই। গত তিন দিন আমি এসবের কিছুই ব্যবহার করি নি। এখন আমার স্বপ্ন একটাই–আমি একজন ভালো মানুষ হবো।

[শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। ৪৫৮ ব্যাচ]

সফল হতে হলে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করতে হবে

অধ্যাপক ড. সমীর কে. সাহা

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ব্যক্তিজীবন, পরিবার, ধর্ম, সাফল্যের অন্তরায় সোশ্যাল মিডিয়া, সুস্বাস্থ্য–এ সবগুলো বিষয় সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এটাকে আমার পরিপূর্ণ একটি কোর্স মনে হয়েছে।

ব্যক্তিজীবনে আমি ফেসবুক, টুইটার-জাতীয় কিছুই ব্যবহার করি না। কিন্তু যোগাযোগ এবং গবেষণার জন্যে আমাকে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হয়। যে-কোনো জায়গায় আমার কাজগুলো করতে পারছি কিনা, এ বিষয়টি আমি নিশ্চিত হতে চাইতাম। তাই স্মার্টফোন ছাড়া জীবন প্রায় অচল মনে হতো।

এক যুগেরও বেশি সময় পর এ চার দিন আমি স্মার্টফোন পুরোপুরি বন্ধ রেখেছি। আমার মধ্যে কোনো অস্থিরতা কাজ করে নি; বরং স্মার্টফোন ছাড়া আমার সময় খুব ভালো কেটেছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স থেকে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া এটাই।

আরেকটি উপলব্ধি হলো, বর্তমানে আমাদের পণ্যাসক্ত করতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আমরা সে ফাঁদে পড়ে যাচ্ছি। যদি আমরা সচেতন হই এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ভালো হয়, তবে আমরা এ পণ্যসন্ত্রাস থেকে অনায়াসে বের হয়ে আসতে পারব।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুদের প্যারেডের ভিডিও দেখে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশ আরো একধাপ এগিয়ে গেছে। জীবনে সফল হতে হলে মেডিটেশন নিয়ে ভাবতে হবে, নিয়মিত চর্চা করতে হবে। তবেই একজন মানুষ উপকৃত হবেন। আমাদের জনশক্তির ৬০% হচ্ছে তরুণ। এই তরুণদের যদি কোয়ান্টামের আলোয় নিয়ে আসা যায় তবে দেশের উন্নতি বেগবান হবে।

[বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ঢাকা শিশু হাসপাতাল। ৪৫৮ ব্যাচ]

মাইগ্রেনের ব্যথা দূর হয়েছে

যুথি আহমেদ

প্রচণ্ড মাইগ্রেন নিয়ে আমি কোর্স করতে আসি। কিন্তু কোর্সের আলোচনা শুনে ও মেডিটেশন করে এ চার দিন আমি কোনো মাথাব্যথা অনুভব করি নি। কোনো ওষুধও খেতে হয় নি।

এ-ছাড়া আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। রাগের জন্যে পরিবার-পরিজন আমার সাথে কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু এখন যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি।

[চাকরিজীবী। ৪৫৮ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমার একমাত্র সন্তানও কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমাদের টাকা-পয়সা বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই। এজন্যে আমার সন্তান যে পরিমাণ মানসিক অত্যাচার ও অপমানসূচক কথাবার্তা আমাকে বলে, তা আর সহ্য করতে পারছি না। অথচ ওকে সর্বস্ব দিয়ে আমি লেখাপড়া করিয়েছি। নিজের বদ-স্বভাবের জন্যে বিদেশে সিটিজেনশিপ ও ভালো চাকরি ছেড়ে আজ একবছর হলো সে বাংলাদেশে আছে। ক্রেডিট কার্ডের ঋণের চাপ সহ্য করতে না পেরে সে চলে এসেছে। দেশে এসে যদিও পড়াশোনা করছে, চাকরির চেষ্টা করছে কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। এই অসহায় মা আপনার কাছে দোয়াপ্রার্থী।*

উত্তর : এই যে সর্বস্ব দিয়ে লেখাপড়া করিয়েছেন, কেন করিয়েছেন? মানুষ করার জন্যে? বিদেশেই বা কেন পাঠিয়েছেন? অধিকাংশ তরুণ কী করছে বিদেশে গিয়ে? বিদেশে কোনোরকম একটা কিছু করতে পারলে ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায় এবং ওখানে ক্রেডিট কার্ডের কোম্পানির কোনো শেষ নেই। ছেলেকে নিয়ে এখন চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। যখন সে ছোট ছিল, তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগটা নেয়া উচিত ছিল সে-সময়।

আমাদের দেশে এই কিছুদিন আগেও মনে করা হতো যে, ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারাটা হচ্ছে মা-বাবার জন্যে সবচেয়ে বড় সার্থকতা। সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক, সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে হবে। এর পরিণতি কী হলো? আপনার হয়তো আর্থিক সামর্থ্য নেই, কিন্তু আপনার ছেলে তো মিশছে বিত্তবানদের সাথে, নতুন পয়সা হয়েছে এমন পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ছেলেমেয়েরা 'মানুষ' হতে পারে না। কিছু ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে এরা মানুষ হয় না। তারা বাংলিশ হয়ে গেছে; না বাঙালি না ইংলিশ। তারা ধনাঢ্য পরিবারের ছেলেমেয়েদের বদ-অভ্যাস আয়ত্ত করেছে, অপব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়েছে কিন্তু আদব-কায়দা ও দেশীয় সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে মা-বাবাকে সম্মান-শ্রদ্ধাও সে করতে শেখে নি।

শিশুকে অবশ্যই তার দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে তাকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। সন্তানকে জীবনের লক্ষ্য দিতে হবে। সেজন্যে সন্তানকে সময় দিতে হবে। শুধু ক্লাসের শিক্ষা নয়, ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। নইলে সে প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না।

অভিজ্ঞতায় দেখেছি–ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বা ও-লেভেল এ-লেভেল করে যারা বিদেশে চলে গেছে, তাদের অধিকাংশেরই লেখাপড়া হয় নি। খুব নির্মম শোনালেও এটা সত্য। অতএব মা-বাবাদের বলব, ও-লেভেল এ-লেভেল সম্পন্ন হলেই সন্তানকে বিদেশে পাঠাবেন না। একদম নিশ্চিত হয়ে পাঠাবেন যে, সে উচ্চতর ডিগ্রির জন্যে অর্থাৎ পিএইচডি বা পোস্ট ডক্টরাল পড়াশোনার জন্যে যাচ্ছে।

আর বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া উচিত ফুল স্কলারশিপ হলে। পার্শিয়াল বা আংশিক স্কলারশিপে বিদেশে গেলে আপনার সন্তান কখনো পড়ালেখা সম্পন্ন করতে পারবে না। এই ফাঁদগুলো সম্পর্কে সচেতন হবেন।

আমেরিকাতে এবং ইউরোপে ঋণের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা। যারা শিক্ষাঋণ নেয়, তাদের সারাজীবন এই ঋণের সুদ বা কিস্তি দিয়ে যেতে হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট বলছে, ব্রিটেনে যারা শিক্ষাঋণ নিয়েছে তাদের ৭৫% সারাজীবনেও এটা শোধ করতে পারবে না। অতএব ফুল স্কলারশিপ ছাড়া বিদেশে পড়তে যাওয়াটা বোকামি।

আপনি ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন, সর্বস্ব দিয়ে কিছু ডিগ্রি অর্জন করিয়েছেন কিন্তু প্রকৃত শিক্ষায় সে শিক্ষিত হয় নি। ফলে সে মানুষ হয় নি আর সে-রকম আচরণই সে করছে। আমরা আপনার প্রতি সমব্যথী। কিন্তু তার জন্যে দোয়া করা ছাড়া কিছু করার নেই। প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝান যেন সে শোধরাতে পারে।

প্রশ্ন : *বিদেশে গিয়ে কাজ করাটা আপনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আমি ইতোমধ্যে কোরিয়াতে কাজ করার জন্যে লটারি জিতেছি। দেশে আমার বাবা, ভাই ও আমি মিলে ব্যবসা করি। সেখানে মাসে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা আয় হয়। কিন্তু তারা আমাকে আয়ের কোনো টাকাই দেয় না। আর আমি নিজের মতো করে দানও করতে পারি না। বর্তমানে আমি যদি কোরিয়া যাই, সেখানে আমার সর্বনিম্ন বেতন দেড় লক্ষ টাকা হবে। বেতনের টাকা দিয়ে আমি নিজের মনমতো দান করতে পারব। এখন আমার জন্যে বিদেশে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে নাকি বোকামি হবে? দয়া করে পরামর্শ দেবেন।*

উত্তর : বিদেশে গিয়ে কী করবেন? আমার মনে হয়, ওখানে উপার্জন করা দেড় লক্ষ টাকা আমাদের দেশে উপার্জিত ৪০ হাজার টাকার সমান। আপনি বিদেশে যে টাকা উপার্জন করবেন, তার ট্যাক্স আছে এবং সেখানকার খরচ আছে। আসা-যাওয়ার খরচ আছে, যারা বিদেশে আদম পাঠায়, তাদের সাথে লেনদেন আছে। সব পরিশোধ করার পর আপনার হাতে খুব বেশি অর্থ থাকার কথা নয়। এ ধরনের চাকরিগুলো খুব একটা সন্তোষজনকও হয় না।

তাছাড়া বিদেশে কতদিন আপনি কাজ করবেন? একবছর, দুই বছর বা তিন বছর। তারপর আপনি দেশে এসে কী করবেন? তখন আপনি ঘরেরও না ঘাটেরও না। আর আপনি ব্যবসা ছেড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে আপনাদের পারিবারিক ব্যবসাতে লোকবলের সংকট সৃষ্টি হবে।

তাই বাবা ও ভাইয়ের সাথে আরো মেহনত করেন। একটা সময় আসবে যখন আপনাদের ব্যবসা আরো বাড়বে এবং আপনিও তখন অভিজ্ঞ হবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আপনার আয় বাড়বে এবং ব্যয়ও করতে পারবেন পছন্দমতো।

যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তারা আসলে অধিকাংশই চিন্তাভাবনা না করে হুজুগে পড়ে যাচ্ছেন। আগেকার দিনে ক্রীতদাসদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো আর এখন মানুষ নিজেই প্রলুব্ধ হয়ে যায়। আর পুঁজিপতিদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এই ধরনের লোকই দরকার। মনে রাখবেন, সে আপনার শ্রমকে কাজে লাগিয়ে যদি ছয় লক্ষ টাকা উপার্জন করতে না পারে, তাহলে আপনাকে দেড় লক্ষ টাকা দেবে না। আপনি ওখানে গিয়ে যে পরিমাণ পরিশ্রম করবেন সেটা যদি নিজের দেশে করেন, আপনার উপার্জন অনেক বেড়ে যাবে।

শুধু ডিশ ওয়াশ করার জন্যে বিদেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু আপনি ব্যবসা করছেন, যদি ব্যবসার গোমর অর্থাৎ রহস্যগুলো বোঝেন এবং সততার সাথে কাজ করেন, তাহলে দেড় লক্ষ কেন, দেড় কোটি টাকাও আপনি উপার্জন করতে পারবেন।

প্রশ্ন : *আমার জীবনের মনছবি কোরআনের হাফেজ হয়ে একজন খতিব ও ইসলামি চিন্তাবিদ হবো। আমি আল্লাহর পথে চলতে চাই কিন্তু অনেকে আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। তারা বলেন, কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হয়ে আমি অন্ধকার জগতে প্রবেশ করেছি। গুরুজী, আমার মনছবি কি ঠিক আছে? আমার বয়স ১৫ বছর।*

উত্তর : আপনি যে আলোর জগতে প্রবেশ করেছেন, এটা তো আপনার এই প্রশ্নই প্রমাণ করে। যদি আপনি মনছবির জন্যে লেগে থাকেন, তাহলে অবশ্যই কোরআনের হাফেজ, খতিব এবং ইসলামি চিন্তাবিদ হতে পারবেন।

যেহেতু আপনি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, জীবনের সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ আপনার রয়েছে। কারণ আপনি মেডিটেশন করতে জানেন। রসুলুল্লাহ (স) জীবনের সত্যকে যে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, সেটা কিন্তু দীর্ঘসময় ধ্যানস্থ হওয়ার পরে। ২৫-২৬ বছর বয়স থেকে তিনি ধ্যানের জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি উপলব্ধির পর্যায়ে, নবুয়তের পর্যায়ে পৌঁছান ৪০ বছর বয়সে।

আপনি যেহেতু ধ্যান করতে অর্থাৎ আত্মনিমগ্ন হতে শিখেছেন, আপনার পক্ষে কোরআনের হাফেজ হওয়া এবং কোরআনকে উপলব্ধি করা আরো সহজ। আর কোয়ান্টামের আধুনিক ও কল্যাণমূলক জীবনদৃষ্টির চর্চা আপনাকে খতিব হতে বা আলোচনা করতে সাহায্য করবে। তেমনি আপনি ইসলামকে, কোরআনকে এবং আল্লাহর রসুলকে বুঝতে পারবেন আরো ভালোভাবে। আমরা দোয়া করি, আপনি যাতে অনেক বড় একজন মানবপ্রেমিক হাফেজ, খতিব ও ইসলামি চিন্তাবিদ হন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি জানি, আমার জীবনের একটি মহৎ লক্ষ্য আছে। প্রতিদিন আমি পা পা করে এ লক্ষ্য অর্জনের পথেই অগ্রসর হবো।

শান্তি আর সংহতিই ধ্যান ও শিল্পের গন্তব্য

নাসির আলী মামুন

নাসির আলী মামুন। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির পথিকৃৎ। প্রায় পাঁচ দশকের কর্মময় জীবনে ক্যামেরাকে যিনি মনে করেছেন একটি প্রাণময় সত্তা। কবি শামসুর রাহমান তাকে আখ্যায়িত করেছেন 'ক্যামেরার কবি' অভিধায়। ১৪ জানুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় 'আলোকচিত্রে শান্তি ও সংহতি' বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি সেই আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

শান্তিতে নোবেলজয়ী মাদার তেরেসা ঢাকায় এলেন ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে। খোঁজ পেলাম তিনি আছেন তেজগাঁওয়ের একটি চার্চে। আমি যথারীতি ক্যামেরা নিয়ে হাজির। তার ছবি তুলব। ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম বার কয়েক। কোনো লাভ হলো না। অপেক্ষা করছিলাম কখন তিনি বের হবেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর তিনি বের হলেন এবং দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন গাড়িতে ওঠার জন্যে।

আমি দৌড়ে গিয়ে দুহাত মেলে দাঁড়িয়ে পড়লাম মাইক্রোবাসের খোলা গেটের সামনে। গলায় ক্যামেরা ঝুলছে। 'এক্সকিউজ মি মাদার! আপনি কি আমাকে একটু সময় দেবেন?'

'পাঁচ মিনিট সময় তোমাকে দেবো।'–কিছুটা ক্ষুব্ধস্বরে এটা বলেই তিনি হনহন করে হেঁটে চার্চের ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

আমিও তার পেছন পেছন চার্চের ভেতরে একটা ঘরে ঢুকলাম। প্রথমেই তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি কি জানো, তুমি কী অপরাধ করলে?'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনি বললেন, 'পুরনো ঢাকায় যে মিশনারিজ অব চ্যারিটি আছে, সেখানে অনেকগুলো শিশু আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের সেবা করার সুযোগ ও সময় দুটোই তুমি নিয়ে নিচ্ছ।'

তার কথা বলা, বিরক্ত ভঙ্গিতে জানালার দিকে তাকানো–এসব আমি দ্রুততালে ক্যামেরাবন্দি করলাম। তারপর হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলাম তার কাছে।

এরকম কত স্মৃতি যে ছবি তুলতে গিয়ে হয়েছে, তার হিসাব নেই। একবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের ছবি তুলতে গেলাম। কিন্তু লোকের ভিড়ে আর নিরাপত্তাকর্মীদের বাধায় কিছুতেই তার কাছে যেতে পারছিলাম না। তিনি চেয়ারে বসে ছিলেন। হঠাৎ আমি লজ্জা ভেঙে চিৎকার দিলাম– 'এক্সকিউজ মি! মিস্টার প্রেসিডেন্ট।' তিনি অবাক হয়ে পাশ ফিরে তাকালেন, আর আমি সাথে সাথে ক্যামেরার শাটারে চাপ দিলাম।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলি। আমার বয়স তখন ১৮ বছর। এটা আমার সৌভাগ্য। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে চারদিক লোকে লোকারণ্য। আমি মাত্র দেড় মিনিটের মতো সময় পেয়েছিলাম মঞ্চে উঠে বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার।

এ পর্যন্ত আমি আট হাজারের বেশি মানুষের মুখচ্ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছি। আমার কাছে প্রত্যেকটা মানুষের চেহারা হলো একটা স্থাপত্য, একটা নকশা। যার সুনির্দিষ্ট ঠিকানা রয়েছে। একজন আলোকচিত্রী যখন কারো পোর্ট্রেট ছবি তোলেন তখন তার কাছে ব্যক্তির মুখাবয়ব ও নকশাটা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি ব্যক্তিটির আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নাও উঠে আসে সেই ছবিতে।

ছবির প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হয় সেই ছোটবেলায়। পত্রিকায়-ম্যাগাজিনে বা কাগজের ঠোঙা–যেখানেই ছবি পেতাম, সেটা আমি কেটে রাখতাম। এমনকি বাড়িতে রাখা পত্রিকার ছবিগুলোও রক্ষা পেত না। বন্ধুরা আমার এই ছবিপ্রীতির কথা জানত। তারাও আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করত। যাদের বাসায় রঙিন বই ছিল বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন রাখা হতো, তারা জানালার পাশে এগুলো রেখে দিত আমার জন্যে। আর আমি তাদের জ্ঞাতসারে ওগুলো চুরি করতাম এবং সব ছবি কেটে নিতাম। তারপর জায়গামতো রেখে আসতাম। এভাবেই ধীরে ধীরে ক্যামেরা আর ছবি তোলার প্রতি আমার আকর্ষণ তৈরি হতে লাগল।

আমি প্রথম ক্যামেরা হাতে পেলাম ১৯৬৬ সালের জুন মাসে। তখন আমি ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ক্যামেরাটা ধার নিয়েছিলাম পরিচিত এক স্টুডিও থেকে। সাথে ছিল আমার বড় ভাই। সে আমার ছবি তুলল। আমি তার ছবি তুললাম। সেদিন নিজের তোলা ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, অসম্ভব বড় একটি কাজ করে ফেলেছি।

আমাদের তখনো ক্যামেরা কেনার মতো অর্থ ছিল না। মা-বাবার বড় সংসার। সাত ভাই দুই বোন আমরা। পেপার কাটিংয়ের ছবিগুলো দেখে আমি স্কেচ করতাম। মুখচ্ছবির প্রতি আমার আগ্রহ প্রবল হতে শুরু করল। হাতে ক্যামেরা ছিল না ঠিকই। কিন্তু সেই ছোট বয়সেই আমি লক্ষ্য ঠিক করি ফেলি–কী করতে চাই এবং আমি কোথায় যাব ।

সে-সময় ফটোগ্রাফি মানেই ছিল ফুল, নদী, পাখি, নিসর্গের ছবি অর্থাৎ মূলত ল্যান্ডস্কেপ ভিত্তিক। কিন্তু আমি চাইলাম মানুষের মুখচ্ছবি ও অভিব্যক্তিকে আমার ক্যামেরায় ধারণ করতে, খ্যাতিমান মানুষদের মুখচ্ছবির ইতিহাস রচনা করতে। তখন বই-ম্যাগাজিনে আমাদের দেশের লেখক-শিল্পীদের যে ছবি ছাপানো হতো, তার সাথে ব্যক্তির আসল চেহারার কোনো মিল থাকত না। গায়ের রং বদলে যেত, গাল ভাঙা থাকলে দেখাত ফোলা। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আমি প্রথম পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। ১৯৭২ সালের কথা সেটা।

দেশের গুণী ও সফল মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনয়ের সাথে বলতাম– 'আপনি নিশ্চয়ই ছবি তুলতে স্টুডিওতে যান, আপনার সময় ও অর্থ দুটোই ব্যয় হয়। স্টুডিওর হয়ে আমিই না-হয় আপনাদের কাছে আসব। ছবি তুলে দেবো।' প্রথমদিকে অনেকেই পাত্তা দেন নি। আবার কেউ কেউ প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। তারপর ছবি তুলে প্রিন্ট করে তাদের উপহার দিতাম।

এভাবে কেটে গেল কয়েক বছর। এর মাঝে আমি অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি তুলে ফেললাম। ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমিতে আবেদন করলাম এই ছবিগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনী আয়োজনের জন্যে। ওরা বলল, একাডেমি কোনো গ্যালারি নয় যে এখানে ছবি প্রদর্শন করা হবে। তবে আমার জোরালো যুক্তি ছিল। আমার মতে, কবি-লেখক-সাহিত্যিক এবং শিল্পীরাই হলেন মহাতারকা। ফুল, পাখি, নদীর ছবি যদি প্রদর্শিত হতে পারে, এদের ছবি কেন নয়?

পরবর্তীতে বাংলা একাডেমি থেকে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। সে-বছরই ভাষা আন্দোলনের মাসে প্রদর্শনী হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবি শামসুর রাহমান বললেন, 'বাংলাদেশে বইয়ের মেলা হয়, পোশাকের মেলা হয়, কিন্তু লেখকদের ছবির প্রদর্শনী হয় না। এটা অভিনব। ব্যতিক্রমী।'

৪৭ বছর ধরে আমি ছবি তুলছি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের শুধু ছবিই তুলি না, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। সমাজে এদের প্রত্যেকেরই অনেক অবদান রয়েছে। অটোগ্রাফ এবং তাদের আঁকা ছবিও আমি সংগ্রহে রাখি। এসব নিয়ে আমি একটি ফটোগ্রাফি মিউজিয়াম বা ফটোজিয়াম গড়ে তোলার কাজ করছি। নতুন প্রজন্ম যেন জানতে পারে বিখ্যাত মানুষরা দেখতে কেমন ছিলেন, তাদের বেশভূষা ও তাদের অভিব্যক্তি কেমন ছিল। ফটোজিয়াম হবে তাদের জন্যে মুখচ্ছবির একটি ইতিহাস। কারণ পৃথিবীতে সবকিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

ফটোগ্রাফি আসলে সংগীত, স্থাপত্য, পেইন্টিং ইত্যাদি বহু কিছুর অর্কেস্ট্রেশন– একটা সিম্ফনির মতো। ক্যামেরায় ক্লিক করলে ছবি উঠবে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করাটাই আসল কাজ। যিনি তা করতে পারেন তিনিই শিল্পী। আমি সেই চেষ্টাই এখনো করে যাচ্ছি।

আর একজন শিল্পীকে সমাজ, দেশ ও সারা পৃথিবী নিয়েও ভাবতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে যদি হৃদ্যতা না থাকে, পরিবেশ যদি সুস্থ না হয়, তবে শিল্পচর্চাও অসম্ভব। এজন্যে আমাদের ধ্যানী ও জ্ঞানী হতে হবে। যখন একজন মানুষ নিজের কাজে একাগ্রতা ও মানবিকতার সমন্বয় ঘটায়, তখন সেটা হয়ে ওঠে অনবদ্য শিল্প। ধ্যানচর্চা ও শিল্পচর্চার গন্তব্য তাই একই–শান্তি ও সংহতি।

১৬ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯

বাংলাদেশ দলের ২৫টি পদকের ২১টিই অর্জন করল কোয়ান্টারা

১-৩ জুন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয় ১৬ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯। এতে অংশ নেয় বিশ্বের আটটি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও চাইনিজ তাইপে) জিমন্যাস্টরা। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয়া নয় জন জিমন্যাস্টের ছয় জনই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টা।

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল মোট ২৫টি পদক (১৩টি স্বর্ণ, পাঁচটি রৌপ্য ও সাতটি ব্রোঞ্জ) অর্জন করে। ২৫টি পদকের ২১টিই লাভ করে কৃতী কোয়ান্টারা। এর নয়টি স্বর্ণপদক, পাঁচটি রৌপ্যপদক ও সাতটি ব্রোঞ্জপদক।

১০-১১ বছর বয়সীদের গ্রুপে ফ্লোর, অল-অ্যারাউন্ড ও প্যারালাল বার ইভেন্টে এবং ১২-১৪ বছর বয়সীদের গ্রুপে ফ্লোর, প্যারালাল বার, রিং, পমেল হর্স ও অল-অ্যারাউন্ড ইভেন্টে কোয়ান্টারা স্বর্ণপদক অর্জন করে।

উল্লেখ্য, গত বছর ৩০ মে সিঙ্গাপুরে শুরু হওয়া ১৫ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮-তে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টা উহাইমং মার্মা। ১২-১৪ বছর বয়সের ক্যাটাগরিতে ভল্টিং টেবিল ইভেন্টে ব্রোঞ্জপদক পেয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে সে।

রমজানে রক্তদাতাদের সমমর্মিতার দৃষ্টান্ত

ব্লাড ক্যাম্প ও ল্যাব থেকে সংগ্রহ ৩,৯৮৯ ইউনিট রক্ত

কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্তদান করছেন রক্তদাতারা

প্রতি বছরের মতো এবারও রমজান মাসজুড়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেল ও ঢাকার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। রমজানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদানে শরিক হন মোট ৩,৯৮৯ জন রক্তদাতা। তাদের মধ্যে ব্লাড ক্যাম্প ও মোবাইল ক্যাম্পে রক্তদান করেন ৭৬১ জন এবং ল্যাবে এসে রক্তদান করেন ৩,২২৮ জন।

এবছর রমজানে ব্লাড ক্যাম্পের পাশাপাশি কোয়ান্টাম ল্যাবেও সংগ্রহের পরিমাণ ছিল গত বছরের তুলনায় বেশি।

আপনার এলাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬
blood.quantummethod.org.bd

আপনার জীবন গড়ার জন্যে
প্রয়োজনীয় কিছু ছোট ছোট ইটের
সাজানো রূপ
আত্মনির্মাণ
১৯৯৮ সালে প্রকাশের পর থেকেই
দুদশকেরও বেশি সময়ে
পৌঁছে গেছে লক্ষ পাঠকের হাতে।
পড়ুন
সমৃদ্ধ হোন
এগিয়ে যান আলোকিত জীবনের পথে

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুলাই ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আগস্ট ২০১৯

ডেঙ্গু রোগীদের জীবন বাঁচাতে ল্যাবে এসে রক্ত দিন

নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে নিরবচ্ছিন্ন ও আন্তরিক কর্মপ্রয়াসের নাম কোয়ান্টাম ল্যাব।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ডেঙ্গু জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার্থে প্রয়োজন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ প্লাটিলেট। দিন দিন বাড়ছে জরুরি রক্তের চাহিদা। এ পরিস্থিতিতে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াতে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্য ও রক্তদাতাদের ল্যাবে এসে রক্ত দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ারদের তিনি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন–নিজে রক্তদান করার পাশাপাশি বন্ধু-আত্মীয় ও পরিচিতদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করুন।

উল্লেখ্য, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে রক্তের আটটি উপাদান সরবরাহ করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোয়ান্টাম ল্যাব। এ উপাদানগুলো পৃথক করা সম্ভব হয় যখন রক্তদাতারা ল্যাবে এসে রক্তদান করেন। তাই মুমূর্ষের সেবায় ল্যাবে এসে রক্ত দিন।

বালা-মুসিবত থেকে সুরক্ষায় দান হোক প্রতিদিনের অভ্যাস

নানারকম অনিয়ম-অনাচার এবং অসচেতনতার ফলে আমরা আমাদের পরিবেশ ও পরিপার্শ্বকে ক্রমশ করে তুলেছি বিরূপভাবাপন্ন। ফলে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় আমাদের জীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলছে। এ-ছাড়াও অবিদ্যাজনিত ভ্রান্ত বিনোদন ও ভার্চুয়াল ভাইরাসের অপপ্রভাব অশান্ত অস্থির করে তুলেছে পরিবারগুলোকে।

তাই সব ধরনের বালা-মুসিবত থেকে সুরক্ষা পেতে সাধ্যমতো দান করুন। প্রতিদিন সকালে নাশতার আগে আপনার দানের অর্থ জমা রাখুন মাটির ব্যাংকে। দিনের শুরুতে দান হয়ে উঠুক আপনার নিয়মিত পারিবারিক অভ্যাস ও সংস্কৃতি। সমস্ত অকল্যাণ দূর হোক আপনার জীবন থেকে।

মাটির ব্যাংকটি পূর্ণ হলে জমা দিন আপনার নিকটস্থ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অফিসে। কোয়ান্টাম এ সঞ্চবদ্ধ দানের অর্থ বরাবরের মতোই ব্যয় করবে বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে। পরম করুণাময়ের রহমতে বিপদমুক্তির পাশাপাশি আপনার দান অবদান রাখবে দেশের দুস্থ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে।

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

শিশু ও নারী নিপীড়কদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হোক

আমরা গত দুযুগেরও বেশি সময় ধরে বলে আসছি, শিশু ও নারীর ওপর নিপীড়নের মাত্রা যে দিন দিন বাড়ছে–তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, এসব অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভুক্তভোগীরা বিচার পান না। ফলে এ জাতীয় বিকৃতি ও নির্যাতন সমাজে বাড়ছেই। তাই এসব অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন; যেন এমন ঘটনা কেউ আর ঘটানোর সাহস না করে।

গত ১৭ জুলাই ঢাকায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, সম্প্রতি শিশু ও নারীর ওপর নির্যাতনের মাত্রা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বলা যায়, আমরা সমাজের মানুষেরাই এ অপরাধীদের সুরক্ষা দিচ্ছি। সবকিছু জেনেশুনে কেউ এদের আশ্রয় দিচ্ছি, কেউ পালিয়ে যেতে সাহায্য করছি। কেউ-বা দিচ্ছি আইনি সহায়তা। যে কারণে এ অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। ফলে সহিংসতা ক্রমশ বাড়ছেই। তাই সবার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ–শিশু ও নারী নিপীড়ক-ধর্ষক-নির্যাতকের সহযোগী কেউ হবেন না। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন। দয়া করে কোনো আইনজীবী ধর্ষকের পক্ষে আদালতে দাঁড়াবেন না। আপনাদের আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আছেন, তাদেরকে কোয়ান্টাম পরিবারের এ আহ্বান ও অনুরোধ পৌঁছে দেবেন।

> শিশু ও নারী নিপীড়ক-ধর্ষক-নির্যাতকের সহযোগী কেউ হবেন না। এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন। দয়া করে কোনো আইনজীবী ধর্ষকের পক্ষে আদালতে দাঁড়াবেন না।

সাম্প্রতিককালে আমরা নানান দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। ঢাকাসহ সারাদেশে ডেঙ্গু, দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা এবং বজ্রাঘাত ও দুর্ঘটনায় অপমৃত্যু, গণপিটুনিতে নিরীহ মানুষ হত্যা ইত্যাদি।

আমরা বলতে পারি, এসব আসমানি-জমিনি বালা ও দুর্দৈব আসলে শিশু ও নারীর ওপর ক্রমাগত অন্যায়-অত্যাচার এবং বিচারহীনতারই অন্যতম ফল। যে জাতি নারীদের সম্মান দিতে জানে না, অতীতেও তাদের ওপর নানারকম গজব আপতিত হয়েছে। কারণ নিপীড়নের শিকার একজন ভুক্তভোগীর আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। আর গজব যখন আসে তখন তা ভালো-মন্দ বিচার করে না, তখন ভোগান্তি সহ্য করতে হয় বহু মানুষকেই।

তাই সমাজের কল্যাণে সেবামূলক কাজে সঞ্চবদ্ধভাবে অংশ নেয়ার পাশাপাশি চারপাশের মানুষকে আমাদের সচেতন করে তুলতে হবে। সর্বস্তরের মানুষের মাঝে নিঃসংকোচে ছড়িয়ে দিতে হবে নৈতিকতা, শুদ্ধাচার ও চিরায়ত ধর্মবাণীর মর্মার্থ। মাদকাসক্তি আর ফেসবুক-ইন্টারনেট-ইউটিউবের মতো ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোনো মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়। কেউ যেন মনোসামাজিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে নারীকে লাঞ্ছিত না করে।

গুরুজী বলেন, আসুন আগামী ৪০ দিন আমরা বিশেষভাবে দোয়া করি–শিশু ও নারী নির্যাতনকারীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হয়।

পবিত্র ঈদুল আজহা

এ শুদ্ধাচারগুলো অনুসরণে সচেতন হোন

- কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়। এটি পরম করুণাময়ের নির্দেশ পালনের একটি অনুষঙ্গ মাত্র। তাই কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞেস করবেন না। কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না।
- কেউ পশুর দাম জানতে চাইলে বলুন, আল্লাহ যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করেছি।
- কোরবানির পশুর দাম ও আকার নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকুন।
- কোরবানির গোশতের ওজন ও পরিমাণ নিয়ে কথা বলবেন না।
- কোরবানির পশু কেনার পর বাজারদর যাচাই করে এ নিয়ে অহেতুক আলাপে যাবেন না। 'দামে ঠকে গেছি'–এ ধরনের আফসোস করবেন না।
- কোরবানির গোশত যথাযথভাবে বিতরণ করুন। কোরবানির গোশত সংরক্ষণ করতে হবে, শুধু এই উদ্দেশ্যে ফ্রিজ কেনার ভ্রান্ত মানসিকতা পরিহার করুন।
- কয়দিন পরই তো কোরবানি করব–এই ভেবে কোরবানির পশুকে অযত্নে অবহেলায় রাখবেন না।
- কোরবানির পশুর সাথে সেলফি তুলবেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ-সম্পর্কিত প্রচার থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন।
- খাদ্য উৎসবে মেতে উঠবেন না। খাবারে পরিমিতি বজায় রাখুন।
- আপনার কোরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করুন। এ-ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে যথাসম্ভব সাহায্য করুন।
- ঈদের ছুটিতে পরিবারকে সময় দিন। টিভি ইন্টারনেট ফেসবুক ইউটিউব আসক্তিসহ সকল ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকুন।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬২ তম কোর্স ॥ ঢাকা

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা শহিদ কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের কবল থেকে বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। তার অসামান্য দায়িত্বনিষ্ঠার প্রতি সম্মান জানিয়ে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে মরণোত্তর বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। শহিদ তনয়া চিত্রশিল্পী আফরোজা জামিল কংকা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৫৮ ব্যাচে অংশ নেন।

শহিদের সন্তান হিসেবে আমি গর্বিত

আফরোজা জামিল কংকা

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। ভোর হয় নি তখনো। শেষ রাতের দিকে ফোন বেজে উঠল। আম্মা ধড়মড় করে উঠে ফোনটা তুললেন। ওপাশ থেকে বঙ্গবন্ধুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ : 'জামিল কোথায়? জামিলকে দে।' বঙ্গবন্ধুর কথার উত্তরে আব্বা বললেন : 'স্যার, আমি এখুনি আসছি। ঘর বন্ধ রাখুন, কেউ খুলতে বললেও খুলবেন না।'

তারপর আব্বা ফোন করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ ও আরো কয়েক জায়গায়, ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে দ্রুত ফোর্স পাঠানোর জন্যে। তড়িঘড়ি করে নিজে তৈরি হলেন। ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সিভিল ড্রেসেই রওনা দেবেন। কথাবার্তার শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে আমি ও আমার বড় বোন উঠে এসেছি।

আব্বা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছেন। আম্মা একটু বলতে চাইলেন–'তোমাকে কি যেতেই হবে?' আব্বা বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী বলছ তুমি? বঙ্গবন্ধু বিপদে, আর আমি যাব না!' তারপর শুধু বললেন, 'আমার মেয়েদের দেখে রেখো'।

সকাল হলো। রেডিওতে আমরা শুনলাম খুনিদের সদম্ভ ঘোষণা–বঙ্গবন্ধু নিহত! আব্বার খবর তখনো জানি না। উৎকণ্ঠায় আম্মা নানাদিকে ফোন করছেন। ড্রাইভার আইনুদ্দিন ততক্ষণে চলে এসেছে কিন্তু কথাই বলতে পারছে না। শুধু হাউমাউ করে কাঁদছে। দুপুরে জেনারেল সফিউল্লাহ ফোন করলেন, ইতস্তত করছিলেন বলতে, শেষ পর্যন্ত আম্মাকে দিলেন খবরটা–'ভাবি, জামিল ভাই আর নেই!'

সেদিনের ঘটনা আমরা পরবর্তীকালে জেনেছি আইনুদ্দিন চাচা ও সোবহানবাগ মসজিদের ইমামের বয়ানে। আব্বার গাড়িটা গণভবন থেকে রওনা করে মসজিদের কাছে এসে পৌঁছালে ব্যারিকেডের মুখে পড়ে। খুনিদের সহযোগী সৈনিকরা তাকে আর সামনে যেতে দেবে না। কিন্তু আব্বা যাবেনই। বাদানুবাদের একপর্যায়ে আব্বা নিজেই গাড়ি চালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সহযোগী ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা তখন আব্বাকে গুলি করে।

দুপুর পর্যন্ত আব্বার লাশ ওভাবেই পড়েছিল। বহু দেনদরবার শেষে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মধ্যস্থতায় রাত সাড়ে ১১টার দিকে বলা হলো লাশ আমরা দেখতে পারব, তবে শর্ত একটাই–কান্নাকাটি করা চলবে না! মধ্যরাতে আম্মা ও আমরা তিন বোন আব্বাকে শেষবারের মতো দেখলাম বন্দুকের সামনে বসে। আমার বড় বোনের বয়স তখন ১৬ বছর, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল বলে খুনিদের প্রচণ্ড ধমক–'ওকে ভেতরে নিয়ে যান!'

১৫ আগস্ট আব্বার মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমাদের জানানো হলো, গণভবনের এ বাড়িটা আমাদের ছাড়তে হবে। এখানে আর থাকা যাবে না। অথচ এ বাড়িটায় আমাদের কত স্মৃতি! বাড়ির পাশেই বঙ্গবন্ধুর অফিস। বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখেছিও এই গণভবনেই।

আমার তখন ১১ বছর বয়স। গণভবনের লেকে একদিন সমবয়সী কাজিনরা ছিপ ফেলে মাছ ধরছি। হঠাৎ পেছন থেকে শুনি দরাজ কণ্ঠ–'কে রে আমার লেকে মাছ ধরে?' তাকিয়ে দেখি বঙ্গবন্ধু! আমরা তো ছিপটিপ ফেলে ভয়ে দে দৌড়। বঙ্গবন্ধু ডেকে পাঠালেন। গুটি গুটি পায়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। কাছে যেতেই কৃত্রিম চোখ পাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমার লেকে মাছ ধরা হচ্ছে?' এরপর বিভিন্ন সময় দেখা হলে অনেক আদর করতেন।

শহিদ কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ

শীতকালে বিকেলে লেকের পাড়ে বসে চা খেতেন বঙ্গবন্ধু। আমাদের দেখলেই ডেকে পাশে বসাতেন। বলতেন, 'গান পারিস? দেখি গান কর একটা'। আমিও শুনিয়ে দিতাম–*আমার সকল দুঃখের প্রদীপ* ...। একবার আমরা কজন শিশুশিল্পী বিটিভির একটা অনুষ্ঠানে গান করলাম, সম্মানীর টাকাটা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর বন্যাত্রাণ তহবিলে জমা দিলাম। এমন কত স্মৃতি!

আব্বা প্রতিদিন সকালে ধানমণ্ডি গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গণভবনে নিয়ে আসতেন। আব্বার অফিস ছিল বঙ্গবন্ধুর অফিস রুমের সাথে লাগোয়া। মাঝখানে একটাই দরজা। এক দৌড়ে আব্বার অফিসে ঢুকে উঁকি দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দেখে চলে আসতাম। আব্বা প্রায়ই আক্ষেপ করতেন–'বঙ্গবন্ধুকে এত বলছি গণভবনে চলে আসতে কিন্তু তিনি একদম শুনছেন না আমার কথা। এখানে কিছু হলে আমরা নিরাপদ অবস্থানে চলে যেতে পারব'। বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'তুই কী বলিস জামিল! আমাকে কে মারবে? আর আমি জনগণের মানুষ, আমি এখানে এসে থাকতে পারব না।'

শেষের দিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার অনেক চেষ্টা ছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধু এসব শুনতে চাইতেন না। আব্বা তখন দুঃখ করে বলতেন, 'বঙ্গবন্ধুর বুকে একটা গুলি লাগবে আর আমার বুকে একটা'। সেটাই হলো শেষ পর্যন্ত।

এরপর খুব দুঃসময় গেছে আমাদের। সর্বত্রই তখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা, আর বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আমার আব্বা মারা গেছে! কাউকে বলতে পারি না, কোথাও যেতে পারি না। স্কুলে যেতে ভালো লাগত না–বন্ধুরা কী বলবে!

এদিকে আব্বার যেদিন চল্লিশা হলো সেদিনই আম্মা টের পেলেন–গর্ভে তার চতুর্থ সন্তান! আট মাস পর আমাদের সেই বোনের জন্ম হলো। আব্বার পেনশন-প্রভিডেন্ট ফান্ড তুলতে গেলে আম্মাকে বলা হলো–টাকা পেতে হলে আগে এ মর্মে সই দিতে হবে যে, কর্নেল জামিল ক্রসফায়ারে মারা গেছেন। আম্মা রাজি হলেন না। তখন কটাক্ষ করে বলেছে–'যাদের জন্যে জান দিয়েছে তাদের কাছে যান না কেন? ওদের কাছে গিয়ে সাহায্য চান!'

এমন বহু তিক্ত পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয়েছে সে-সময়। কিন্তু আজ শুকরিয়া আদায় করি, অনেক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আম্মা আনজুমান আরা জামিল আমাদের চার বোনকে মানুষ করেছেন। সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্যে সেদিন হয়তো আমাদের অনেক কিছুরই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রয়োজনটাকে আমরা প্রয়োজনই মনে করেছি। কখনো সেটাকে লোভে পরিণত করি নি।

সবচেয়ে বড় কথা, বুঝতে শেখার পর থেকে আমরা কখনো আব্বার মৃত্যু নিয়ে পরিতাপ করি নি–লোকটা এভাবে মরে গেল! জীবন দিয়ে দিল? বরং সবসময় গর্বিত হয়েছি–বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আব্বা শহিদ হয়েছেন। কাপুরুষের মতো পালিয়ে যান নি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন তার দায়িত্ব পালনে। এটাই আমাদের সাহস দিয়েছে সব বাধা ঠেলে এগিয়ে যেতে।

এই ইতিবাচকতার শিক্ষাই আরো পূর্ণাঙ্গভাবে পেলাম কোয়ান্টামে এসে। আব্বা মারা যাওয়ার পর কত রকম বিপর্যয়ের ভেতর আমরা বেড়ে উঠেছি, কিন্তু আমাদের সাইকোথেরাপি-কাউন্সেলিং কিছুই হয় নি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে পারিবারিক মেডিটেশনে যখন মা-বাবাকে অনুভব করা এবং তাদের জন্যে দোয়া করতে বলা হলো তখন খুব কাঁদলাম। আব্বা-আম্মাকে জড়িয়ে ধরে যে অনুভূতি আমার হলো, সেটা বলে বোঝাতে পারব না। এত বছরের জমে থাকা ক্ষোভ-দুঃখ-ঘৃণা অনেকটাই দূর হয়ে বেশ হালকা মনে হলো নিজেকে।

সবমিলিয়ে কোয়ান্টাম মেথড একটা অসাধারণ কোর্স। কোরআনকে ভিত্তি করে এর পুরো বিষয়বস্তু, সেইসাথে অন্যান্য ধর্মের নৈতিক শিক্ষা ও মনীষীদের কথাগুলোও খুব সুন্দরভাবে এখানে সংকলিত হয়েছে। গুরুজীর কথা ও মেডিটেশন এত বছর পর আমার জন্যে একটা সাইকোথেরাপির মতোই কাজ করেছে। কোয়ান্টাম আমার জীবনে এনে দিয়েছে নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন :
ডা. আতাউর রহমান

মেধা বিকশিত হোক সৃষ্টির কল্যাণে

প্রতিটি যুক্তিসঙ্গত চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরের সামর্থ্যই সাফল্য। সফল তিনি-ই, যিনি আপাত ব্যর্থতার ছাই থেকে গড়ে নিতে পারেন নতুন প্রাসাদ। প্রতিটি অর্জনকেই মনে করেন নতুন শুরুর ভিত্তি। প্রতিটি অর্জন শেষেই শুরু করেন আরো বড় অর্জনের অভিযাত্রা।

শিক্ষা-ক্যারিয়ার-সাফল্য সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি জানতে পড়ুন

কোয়ান্টাম কণিকার এই বাণীর মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সাফল্যের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রচলিত সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা সাফল্য মনে করি সাময়িক প্রাপ্তিকে, আর্থিক সচ্ছলতা ও নির্দিষ্ট কিছু অর্জনকে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় সবকিছুর। আনন্দ-দুঃখ, হাসি-কান্না বা পার্থিব যা-কিছু, সবই ক্ষণস্থায়ী।

সফল ও ব্যর্থ মানুষের বাহ্যিক কাঠামোতে তেমন কোনো পার্থক্য না থাকলেও জীবনদৃষ্টিতে রয়েছে বিস্তর ফারাক। একজন সফল মানুষ কাজ করেন তার লক্ষ্য বা মনছবিকে সামনে রেখে। আর একজন ব্যর্থ মানুষ অলস বা নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন করেন অতীত ব্যর্থতার স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয়ে। পৃথিবীর প্রতিটি সফল মানুষই কোনো না কোনো ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছেন। কিন্তু ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বার বার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন। তাই পেয়েছেন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

মেধা বিকশিত হোক মানুষের কল্যাণে

সফল হওয়ার জন্যে জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাফল্যযাত্রা।

কল্যাণকর লক্ষ্য : একজনের লক্ষ্য যদি হয় মানুষের রোগশোক দূর করা, তাহলে তিনি সফল ও সুখী হবেন। তিনি চিকিৎসক হতে পারেন, গবেষক হয়ে রোগশনাক্তকারী পরীক্ষাপদ্ধতি ও যন্ত্রাংশ আবিষ্কার করতে পারেন, প্রাণঘাতী রোগের ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন, অর্থাৎ রোগীর পাশে দাঁড়ানোর অনেক বিকল্প তার রয়েছে। তাই কল্যাণের অংশ হয়ে তিনি হবেন সুখী জীবনের অধিকারী।

অকল্যাণকর লক্ষ্য : আর একজন যদি চিকিৎসক হতে চান শুধু এ কারণে যে, এ পেশায় অঢেল টাকা উপার্জনের সুযোগ রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে তিনি চিকিৎসক হয়েও হতাশ হবেন, হতে না পারলেও হতাশ হবেন। চিকিৎসক হয়ে হতাশ হবেন কারণ, পার্থিব অবৈধ উপার্জনের সাথে সাথে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মতো অশান্তি হবে তার পারিবারিক সদস্য। আর হতে না পারলে হতাশ হবেন অন্য চিকিৎসক বন্ধুদের অন্তঃসারশূন্যতা চাপা দেয়া বাহ্যিক বিলাস দেখে। অন্য যে-কোনো পেশার ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

শোষকের অস্ত্র হবেন, নাকি শোষিতের সহায়?

বেশুমার টাকা উপার্জনকে তরুণদের একটা বড় অংশ এখন সফলতা মনে করছেন। কিন্তু একজন মানুষের আসলেই কতটা অর্থের প্রয়োজন? বিশ্বে ১৬০ কোটি লোকের যেখানে মাথা গোঁজার নিরাপদ আশ্রয় নেই, সেখানে বিল গেটস প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকা খরচ করে ওয়াশিংটন লেকের পাশে বাড়ি (নাকি প্রাসাদ!) বানিয়েছেন। *(হ্যাবিটেট, ২০১৫)* এই বাড়িতে তিনি কতটুকু সময় থাকবেন আর এর সুযোগ-সুবিধাগুলোর কতটুকুই বা ভোগ করতে পারবেন? তাহলে এই ব্যক্তি কি একজন তরুণের আদর্শ হতে পারেন?

বর্তমান সময়ের আরেক প্রযুক্তি মাফিয়া জাকারবার্গের কথাই ধরা যাক। গত ৯ মার্চ কর্মরত অবস্থায় মারা যান ফেসবুকের ৪২ বছর বয়সী কর্মী কেইথ উথলে। আন্তর্জাতিক সাময়িকী দ্য ভার্জের প্রতিবেদন অনুযায়ী এর কারণ ফেসবুকের দেয়া অসম্ভব টার্গেট পূরণের অতিরিক্ত চাপ।

প্রতিবেদনে আরো উঠে এসেছে, সহিংসতাপূর্ণ বক্তব্য, মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণী হত্যা ও অত্যাচারের গ্রাফিক ভিডিও, যৌনতা ও শিশু পর্নোগ্রাফিতে উৎসাহব্যঞ্জক কনটেন্ট তৈরির জন্যে ফেসবুক কর্মীদের বাধ্য করে। *(২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, দ্য ভার্জ)*

এ বছরের প্রথম ছয় মাসে ফেসবুকের আয় দুই লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা মাত্র! কাদের সময় লুট করে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচার করে ফেসবুক এ টাকা আয় করেছে তা পাঠককে ভেঙে বলার প্রয়োজন হয় না। এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করা কি কোনো তরুণের লক্ষ্য হতে পারে? বা জাকারবার্গ যদি বছরে অনেক টাকা বেতন দেন, তাহলেই কি একজন তরুণ তার নৈতিকতা অর্থের কাছে বিসর্জন দেবেন?

জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাই এখনকার তরুণদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন। তামাক বা ক্ষতিকর নেশায় আসক্তকারী (হোক তা ভিডিও গেম, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন বা মাদক) প্রতিষ্ঠানে একজন তরুণ যখন তার মেধা ব্যয় করবেন, বিনিময়ে প্রচুর অর্থের সাথে সাথে প্যাকেজ হিসেবে অশান্তি, হতাশা ও অকল্যাণকে তিনি নিজের জীবনের স্থায়ী সঙ্গী করে নেবেন।

অপরদিকে মানুষের কল্যাণে মেধা ব্যয় করেছেন এমন মানুষদের মধ্যে আমরা বেগম রোকেয়ার কথা জানি। উনিশ শতকে এই মহীয়সী নারী উপলব্ধি করেছিলেন, একটি সমাজকে এগোতে হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষিত হতে হবে। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদের লক্ষ্য তাহাই।'

বেগম রোকেয়া শুধু নিজের জন্যে বাঁচেন নি। মানুষের কল্যাণে, নারীদের জাগরণে কাজ করেছেন বলে তিনি এখনো আমাদের কাছে স্মরণীয়।

কল্যাণের পথেই আসবে সাফল্য

মানুষ কোনো বার্বি বা কারখানার পণ্য নয়, একই ছাঁচে যা বার বার একইরকমভাবে তৈরি হয়। প্রতিটি মানুষই সৃষ্টিবৈচিত্র্য, গুণে ও মেধায় অনন্য। এই স্বকীয় মেধাকে আবিষ্কারও করতে হবে নিজেকেই। এজন্যে–

- ☐ প্রতিদিন কিছুটা সময় আত্মনিমগ্ন হোন। অন্যকে দেখে বা ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে আপনার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করবেন না। প্রয়োজনে দীর্ঘসময় কোয়ান্টায়ন বা নীরব থেকে নিজের মেধা খুঁজে বের করুন। জীবন থেকে আপনি কী চান তা স্পষ্ট করে জানুন। নিজের উপলব্ধি লিখে রাখুন ও বার বার পড়ুন।
- ☐ জীবনের লক্ষ্য নিয়ে মনছবির মেডিটেশন করুন। প্রক্রিয়াটি জানতে পড়ুন *সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড*। পাশাপাশি *অটোসাজেশন, কোয়ান্টাম কণিকা, আত্মনির্মাণ* ইত্যাদি আত্ম উন্নয়নমূলক বই ও সফল ব্যক্তিদের জীবনী হাতের কাছে রাখুন ও নিয়মিত পড়ুন।
- ☐ সুযোগ করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সৎসঙ্গে যুক্ত হয়ে সেবামূলক কাজে অংশ নিন।
- ☐ শিশুদের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবেন না। বরং তার মেধা ও যোগ্যতা খুঁজে পেতে এবং বিকশিত করতে সহায়তা করুন।

ইতিহাস সাক্ষী, তথাকথিত সাফল্যের নামে ভ্রান্ত সংস্কার ও অবিদ্যাগুলো থেকে যুগে যুগে সমাজকে মুক্ত করেছে তরুণরাই। মিথ্যার দাপট যত বেশি হোক, শেষ পর্যন্ত অকল্যাণের ওপর কল্যাণ, অসত্যের ওপর সত্যই জয়ী হয়।

আর যুগে যুগে তারাই প্রকৃত অর্থে সফল হয়েছেন, মানুষের হৃদয়ে অমর হয়েছেন, যারা চেনা পথের বাইরে হেঁটেছেন, অন্যের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাই পেশা বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের মেধা বিকাশের সুযোগ ও মানুষের কল্যাণ, দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

একজন সফল বা প্রাচুর্যবান মানুষ তিনিই, যার জীবনে কোনো অভাববোধ নেই। আর এই অনুভূতি তখনই আসে যখন তিনি শুধু নিজের জন্যে বাঁচেন না; বরং সবাইকে সাথে নিয়ে গড়ে তোলেন সুখী ও সার্থক জীবন।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

চিকিৎসকদের অবশ্যই এ কোর্সটি করা উচিত

ডা. গাজী মো. রফিকুল হক

আমি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করি। আমরা চিকিৎসকরা যতক্ষণ ডিউটিতে থাকি, ততক্ষণই আমাদের নানারকম ব্যস্ততা আর অস্থিরতায় কাটাতে হয়। কখনো কখনো এমন মুমূর্ষু রোগীও আসে, যাকে চিকিৎসাসেবা দেয়ার মতো সুযোগও আমাদের থাকে না। কিন্তু রোগী এবং তার স্বজনেরা আশা নিয়ে চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি তখন অসহায়বোধ করি।

এরকম নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। কারণ প্রতিটি রোগীই আসছেন রোগ আর যন্ত্রণা নিয়ে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে আমার মনে হয়েছে, মেডিটেশনের বাণী চিকিৎসকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে রোগীদের আরো ভালো সেবা দেয়া সম্ভব হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ চিকিৎসকই ওষুধনির্ভর, সার্জারি-নির্ভর চিকিৎসা দিচ্ছেন। কীভাবে আমরা রোগীর মনোবল বাড়াতে পারি, সুস্থতার বিশ্বাস দিতে পারি–এই শিক্ষা আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজে ছাত্ররা পায় না বললেই চলে। আমি গুরুজীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, এই শিক্ষাগুলোই তিনি আমাদের দিলেন। সেইসাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের সূত্র শেখালেন।

[ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, জেনারেল হাসপাতাল, জামালপুর। ৪৫৭ ব্যাচ]

আদর্শ মানুষ হতে প্রয়োজন মেডিটেশন চর্চা

কল্পনা রাণী রায়

শারীরিক-মানসিক কোনো অসুস্থতা বা সমস্যা আমার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কয়েকদিন ধরে আমার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছিল। রাতে আমার ভালো ঘুম হতো না। তরতাজা অনুভূতি নিয়ে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারতাম না।

বোনের উৎসাহে আমি এ কোর্সে অংশ নিয়েছি। শিথিলায়ন মেডিটেশন করে আমি প্রথমদিনই অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। এখন আমার ঘুম ভালো হচ্ছে। আমি মনে করি–সুস্থ থাকার জন্যে, ভালো থাকার জন্যে এবং একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্যে প্রত্যেকেরই মেডিটেশন চর্চা করা প্রয়োজন।

[অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ৪৫২ ব্যাচ]

বিশ্বস্ত ও নিরাপদ জায়গাটি আমি খুঁজে পেয়েছি

এডভোকেট মোর্শেদা আক্তার নীলা

একজন কর্মজীবী মা হিসেবে আমি সন্তানের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সে তার অবসর সময়ে ভালো কিছু শিখতে পারবে। কিন্তু একটা পর্যায়ে আমার সন্তানের কাছে মায়ের চেয়ে প্রিয় হয়ে গেল স্মার্টফোন। দেখলাম, আমি বাসায় যাওয়ার পর সে আর দৌড়ে আমার কাছে আসছে না, স্মার্টফোন নিয়েই ব্যস্ত থাকছে।

নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় ব্যস্ত, কী নিয়ে ব্যস্ত? আসক্ত ও অসুস্থ একটা পরিবার, একটা সমাজ তো আমি চাই না। যদি সন্তানই আমার থেকে দূরে চলে যায়, তাহলে এত সাফল্য আর জ্ঞান আমার কী কাজে আসবে?

কোয়ান্টামের আলোকায়ন কার্যক্রমে আসার সূত্রে স্মার্টফোন-আসক্তির কুফল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমি পেয়েছিলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি আমি করব। মনের ভেতরে চেপে রাখা কষ্টগুলো বলার বিশ্বস্ত ও নিরাপদ জায়গাটি আমি এখানে এসে খুঁজে পেয়েছি। ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে মেডিটেশনের ভূমিকা অনেক। কোয়ান্টাম আমাদের আলোকিত জীবনের পথ দেখাচ্ছে।

[আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট। ৪৫৫ ব্যাচ]

বিশ্বাসের শক্তি সম্পর্কে এখন আমি সচেতন

মো. ফুয়াদ হাসান

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমার আফসোস হচ্ছে, এ কোর্সটি আগে কেন করি নি। ছোটবেলা থেকেই আমার পেটের সমস্যা। এজন্যে আমাকে নিয়মিত ওষুধ খেতে হতো। আমার এ অসুখ কোনোদিন ভালো হবে, এই বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু কোর্সে এসে মেডিটেশন করে সত্যিই আমি সুস্থবোধ করছি। পেটের কোনো সমস্যাও আর হয় নি।

প্রায়ই আমার দাদিকে বলতে শুনতাম–বিশ্বাসে মেলায় বস্তু। কিন্তু এ বিশ্বাস কীভাবে অর্জন করব, তা আমি বুঝতাম না। কোর্সের আলোচনা শুনে বিশ্বাসের শক্তি সম্পর্কে আমি এখন সচেতন। আমার ভেতরে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে–আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব।

[শিক্ষার্থী, ফিশারিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৬ ব্যাচ]

কোয়ান্টাম আমাদের নৈতিক মূল্যবোধকে স্পর্শ করেছে

অধ্যাপক গৌতম রায়

পেশাগত কারণে কাজের চাপ ও নানারকম স্ট্রেসের ভেতর থাকতে হয় আমাকে। প্রায়ই আমার ভেতরে হতাশা কাজ করত। আসলে প্রতিটি মানুষেরই কোনো না কোনো যন্ত্রণা থাকে–কখনো তা ব্যক্তিগত, কখনো পারিবারিক বা সামাজিক। সবমিলিয়ে অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি আমার করা প্রয়োজন। এখানে আমি স্ত্রী ও ছেলেকে সাথে এনেছি। কারণ আমি চাই–একটা পরিণত বয়সে যাওয়ার আগেই আমার সন্তান যেন জীবনকে সুন্দর করার শিক্ষাগুলো পায়।

আমার বিশ্বাস, একজন মানুষকে পরিবর্তন করতে হলে তার নৈতিকতার তিনটি জায়গায় স্পর্শ করতে হয়–তার মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাস। এ তিনটি বিষয়কে যদি জাগ্রত করা না যায়, তাহলে ব্যক্তিমানুষের কোনো পরিবর্তন হয় না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাদের মূল্যবোধকে স্পর্শ করেছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাসকে প্রগাঢ় করেছে। আমি বিশ্বাস করি, এখানে চার দিনে যা শিখলাম, তা নিয়মিত চর্চা করলে আমরা জীবনকে আরো সুন্দর করতে পারব।

[শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। ৪৫৭ ব্যাচ]

জীবন সম্পর্কে আশাবাদী হতে পেরেছি

সালমা আক্তার রুজমিন

২০১৮ সালে আমার স্ট্রোক হয় এবং আমার শরীরের বাম পাশ প্যারালাইজড হয়ে যায়। তারপর থেকে আমি বাম হাতে কোনো কাজ করতে পারি না, হাঁটতে পারি না। অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

অথচ অসুস্থতার আগে আমার জীবনটা ছিল প্রজাপতির মতো। আমার নাম 'রুজমিন' শব্দের অর্থও প্রজাপতি। চাকরি, সংসার, স্বামী-সন্তান নিয়ে সুস্থ কর্মব্যস্ত জীবন ছিল আমার। প্যারালাইজড হওয়ার পর সব বদলে গেল।

এই কোর্সে এসে মেডিটেশন করে আমার খুব ভালো লেগেছে। আবার কর্মময় জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশা জন্মেছে আমার ভেতর। গুরুজীর আলোচনা শুনে নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। জীবন নিয়ে আশাবাদী হতে পেরেছি। আবার প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়ানোর আত্মবিশ্বাস পেয়েছি আমি।

[প্রাক্তন এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, হেড অফিস, ফু-ওয়াং। ৪৫২ ব্যাচ]

ব্যাকপেইন অনুভব করছি না

মো. তারিকুল ইসলাম

সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড বইটি পেয়েছিলাম ২০০৩ সালে। নিজে নিজে মেডিটেশন করতাম কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি আমার করা হয়ে ওঠে নি। এত বছর পর এখানে এলাম রোগমুক্তির জন্যে।

জব স্ট্রেসের কারণে ২০১১ সালে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার পোস্ট লাম্বার ডিস্কে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। ডাক্তার আমাকে পেইনকিলার, এসিডিটির ওষুধ ও পেশি শিথিল হওয়ার ওষুধ দিলেন। আর জানালেন, ওষুধে ব্যথা ঠিক না হলে সার্জারি করাতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া একদমই হাঁটাচলা করতে নিষেধ করলেন। আমার পরিচিত সবাই শুনে অবাক হতো–এই বয়সে ব্যাকপেইন!

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের উদ্দেশ্যে আমি যখন সিলেট থেকে ঢাকায় রওনা করি তখনো আমার শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। ব্যথা নিয়েই আমি ক্লাস করতে শুরু করলাম। প্রথমদিন মেডিটেশন করে বাসায় ফেরার পর থেকেই আমি আর ব্যথা অনুভব করছি না। এটি আমার অন্যতম সাফল্য। আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে বিশাল শক্তি দিয়েছেন, সেটাই অনুভব করলাম গুরুজীর সান্নিধ্যে এসে।

[প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫১ ব্যাচ]

রাগ অনেকটাই কমে গেছে

মো. মাসনুন আমিন খাঁন

আমি দুই বছর যাবৎ এজমা রোগে আক্রান্ত। এজমার কারণে রাতে অনেক কাশি হতো। আমি ঠিকমতো ঘুমাতে পারতাম না। কোর্সে মেডিটেশন করে আমার এখন কাশি হচ্ছে না এবং ঘুমেরও কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না।

প্রায়ই আমি অনেক রেগে যেতাম। কিন্তু রাগকে আমি প্রকাশ করতে পারতাম না, ভেতরে দমিয়ে রাখতাম। এজন্যে মন ভার হয়ে থাকত। মেডিটেশনে দমচর্চা করে আমি অনেক হালকা বোধ করছি। আমার রাগও অনেকটা কমেছে।

আগে আমি মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করতাম। তাদেরকে সালাম দেয়ার অভ্যাসও আমার ছিল না। গুরুজীর বক্তব্য শোনার পর আমি প্রতিদিন বাসায় ফিরে তাদেরকে সালাম দেই। তাদের সাথে আমি এখন সুন্দর আচরণ করছি।

আমি অনেক নেতিবাচক চিন্তা করতাম। গাড়িতে উঠলেই মনে হতো, গাড়িটা যদি এক্সিডেন্ট করে! পরীক্ষার সময় মনে করতাম, যদি প্রশ্ন অনেক কঠিন হয়! কিন্তু এখন আমি ইতিবাচক চিন্তা করতে পারছি। এই পরিবর্তনগুলো আমাকে ভালো মানুষ হতে অনেক সাহায্য করছে।

[অষ্টম শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। ৪৫২ ব্যাচ]

উৎফুল্ল ও সতেজ মনে হচ্ছে

কানিজ খাদিজা

আমার মধ্যে নার্ভাসনেস অনেক বেশি কাজ করত। যে-কোনো কাজ করার সময় আমি খুব ভয় পেতাম। মনে হতো, কাজটা আমাকে দিয়ে হবে না। আর আবেগপ্রবণ হওয়ার কারণে মানুষের সামান্য কথায় খুব কষ্ট পেতাম। তাদের ক্ষমা করে দিলেও আমি কষ্টটা ভুলতে পারতাম না। প্রায় রাতেই আমার ঘুম হতো না। আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে হতো। আমার চাচাশ্বশুর আমাকে কোয়ান্টামে আসতে পরামর্শ দিলেন। আমারও মনে হলো, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এ কোর্সটি আমার করা প্রয়োজন।

রাগ-ক্ষোভের আলোচনায় গুরুজী বললেন, কাউকে ক্ষমা করতে চাইলে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিতে হয়। ক্ষোভ বা কষ্ট বহন করে বেড়ালে আমরা নিজেরই ক্ষতি করি। এ কথাটি আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে। মেডিটেশনে আমার ভেতরের সব নেতিবাচক আবেগ যেন মুছে যাচ্ছে। নিজেকে উৎফুল্ল ও সতেজ মনে হচ্ছে। আমার ভয়ও দূর হয়েছে। এখন আমি বিশ্বাস করি, আমি অনেক কিছু করতে পারব।

সেইসাথে পণ্যের আসক্তি সম্পর্কে আমি সচেতন হয়েছি। বর্তমানে প্রায় সবার মধ্যেই নিত্যনতুন পণ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। এই আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসার পথ পেলাম কোর্সে এসে।

[একাউন্ট্যান্ট, দীপশিখা। ৪৫৫ ব্যাচ]

মা-বাবার প্রতি আরো যত্নশীল হতে শিখেছি

ডা. জান্নাতুল মাওয়া শুভ্রা

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসার আগে আমি হতাশ একজন মানুষ ছিলাম। জীবনে যা-কিছু পাই নি, তা নিয়ে সবসময় আমার মন খারাপ থাকত। এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি, জীবন থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। কোর্স করে আমি ইতিবাচক চিন্তা করতে শিখেছি এবং সব প্রাপ্তির জন্যে স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করতে শিখেছি।

আমি একজন নিয়মিত রক্তদাতা। কোর্সে গুরুজী যখন রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন, তা আমাকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

অন্যকে নিরাময় করার মেডিটেশনে যখন মাকে দেখলাম, আমার উপলব্ধি হলো–সন্তান হিসেবে আমরা মা-বাবার প্রতি সেভাবে মনোযোগ দেই না। অথচ আমাদের জীবনে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমার বিশ্বাস, এই উপলব্ধি আমাকে মা-বাবার প্রতি আরো যত্নশীল হতে সাহায্য করবে।

[শিক্ষার্থী, এফসিপিএস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ৪৫২ ব্যাচ]

শান্ত রাখতে পারছি নিজেকে

অধ্যাপক তানজিদা হোসেন

ছাত্রজীবনে শিখেছিলাম কোনোকিছু অর্জন করতে হলে তার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয় আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হয়। এভাবে চেষ্টা করেই আমি এত দূর এসেছি। তবে অনেক সাফল্যের পরও আমি এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে জানতে পারলাম, এই শূন্যতা দূর করা সম্ভব অন্যের কল্যাণ করার মাধ্যমে। এর মতো প্রশান্তি আর কিছুতে নেই।

নিজের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে প্রতিটি মানুষের অগাধ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন–এ উপলব্ধিও পেয়েছি গুরুজীর আলোচনা শুনে। তিনি আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতে শিখিয়েছেন।

কোর্সে আসার আগে আমার প্রচণ্ড রাগ ছিল। আমি কাবাঘরের সামনেও দাঁড়িয়ে দোয়া করেছি, যেন রাগটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি। কোর্স করে মনে হচ্ছে, আমি নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি। আমার অস্থিরতা কমেছে এবং অপ্রয়োজনীয় চিন্তা থেকেও আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে পারছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

[অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা। ৪৫১ ব্যাচ]

স্মার্টফোন ছাড়াই ভালো আছি

দিপক দেব নাথ

আমার এ কোর্সে আসার প্রধান কারণ হলো হাইপারটেনশন। সুস্থ হওয়ার আশায় আমি গত দুই বছর ধরে ওষুধ খাচ্ছি। ডাক্তার বলেছিলেন এ ওষুধ সারাজীবন চলবে। ওষুধ না খেলে আমার ঘাড়ে ব্যথা হতো, বুক ধড়ফড় করত। কিন্তু কোর্সের চার দিন মেডিটেশন করে আমি ওষুধ ছাড়াই ভালো আছি।

ছোটবেলা থেকেই আমার স্কিন এলার্জি ছিল। ধুলাবালি একেবারেই সহ্য করতে পারতাম না। ধুলো লাগলেই শরীরে লাল ফুসকুড়ি উঠত, খুব চুলকাত। কোর্সের আলোচনায় জানতে পারলাম–স্কিন এলার্জির অন্যতম উৎস মনের নেতিবাচকতা। এরপর থেকে আমি নিয়মিত সুস্থতার অটোসাজেশন দিয়েছি। এই কদিন আমার এলার্জির সমস্যাও হয় নি।

এ-ছাড়াও রাতে আমার ঘুম হতো না। আমি সারারাত ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতাম, ভোরবেলা ঘুমাতে যেতাম। সর্বশেষ কবে সকালে নাশতা করেছি আমার মনে নেই। আমার স্মার্টফোনে ইন্টারনেট সবসময় চালু থাকত। কিন্তু এ চার দিন আমি শুধু মায়ের সাথে কথা বলার জন্যে ফোন ব্যবহার করেছি। স্মার্টফোন ছাড়াই আমি ভালো আছি।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, জেনেটিক্স এন্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। ৪৫১ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *কয়েক মাস পরেই আমার মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা। পড়াশোনা শেষে পেশাগত জীবনের একটা লক্ষ্য ঠিক করেছি। সেভাবেই মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি নিচ্ছি। নিয়মিত মনছবির মেডিটেশন করছি। গুরুজী, আমার জন্যে দোয়া করবেন। কোনো বিশেষ পরামর্শ থাকলে দেবেন।*

উত্তর : আমার তরুণ বয়সে যে কয়েকটি বই আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল, তার একটি হচ্ছে নোবেলজয়ী জার্মান কথাসাহিত্যিক হেরম্যান হেস রচিত *সিদ্ধার্থ*। তখন এসব বই কষ্ট করে যোগাড় করতে হতো। বহু অনুসন্ধানের পর পেয়েছিলাম বইটা। আসলে ভক্ত যখন তৈরি হয় জানার জন্যে, জ্ঞানের জন্যে, গুরু তখন নিজেই ধরা দেন–কখনো বাণীরূপে, কখনো গ্রন্থরূপে, কখনো ব্যক্তিরূপে। আর মানুষ যখন অনুসন্ধান করে, সে পায়। বাইবেলেও এ কথাটা খুব চমৎকারভাবে বলা হয়েছে–তুমি খোঁজো, পাবে।

যা-ই হোক, *সিদ্ধার্থ* বইটার প্রধান চরিত্রের নাম সিদ্ধার্থ। সে সিদ্ধান্ত নিল ব্যবসা করবে। উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র কমলা বলল, তুমি তো কিছু পারো না, তুমি কীভাবে ব্যবসা করবে? তখন সিদ্ধার্থ যে উত্তরটা দিয়েছিল তার বাংলা মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়–দেখ, তুমি যখন জলে একটা পাথর নিক্ষেপ করো তখন তা ভূতলে পৌঁছার জন্যে একদম সোজা গিয়ে পড়ে। সেটাই দ্রুততম সময়ে ওখানে পৌঁছানোর জন্যে তার সহজতম পথ।

অর্থাৎ সে এঁকেবেঁকে চলে না। এদিকেও যায় না, ওদিকেও যায় না। একইভাবে সিদ্ধার্থ যখন তার লক্ষ্যস্থির করে তখন সে অপেক্ষা করে আর চিন্তা করে অর্থাৎ তার করণীয় কাজে মনোসংযোগ করে। সেইসাথে উপবাস করে অর্থাৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে সব ধরনের কষ্ট সহ্য করে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কী করে? কেন তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না? কারণ তারা শুধু মোড়ামুড়ি করে। এটা-সেটা, এদিক-সেদিক অনেক কিছু করতে থাকে। এখানে সিদ্ধার্থের অপেক্ষা করার মানে হলো নীরবে নিজের কাজটা করে যাওয়া এবং লক্ষ্যের বিপরীত কিছুকে জীবনে স্থান না দেয়া। পাথর যেভাবে নিজের সহজ ছন্দ ও গতিতে পানিতে ডুবে যায়, সিদ্ধার্থও তেমনি প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে ডুবে যায় এবং একটু একটু করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। কোনোরকম সন্দেহ সংশয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব–কিছুই সে মাথায় ঢোকার সুযোগ দেয় না।

আপনার জন্যেও আমার পরামর্শ এটাই। যে লক্ষ্য আপনি নির্ধারণ করেছেন সেজন্যে নীরবে কাজ করে যাবেন। লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, এমন সবকিছু সচেতনভাবে এড়িয়ে যাবেন। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা কথা কাজ সঙ্গ সবকিছু বর্জন করবেন হাঁসের মতো। সেটা কেমন? হাঁসকে যদি কখনো দুধ দেন, হাঁস দুধটুকু সুন্দরভাবে খেয়ে নেবে কিন্তু দুধের মধ্যে যে পানি বা জলীয় অংশটা আছে সেটা ওভাবেই পড়ে থাকবে। আপনার করণীয়ও হবে সেটাই, যা আপনার লক্ষ্য সহায়ক।

আর মনে রাখবেন, আপনার লক্ষ্যটা যেন হয় নিজের জন্যে এবং মানবতার জন্যে কল্যাণকর।

প্রশ্ন : *আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে আগে নিয়মিত অংশ নিতাম। পরবর্তীতে নানা ব্যস্ততায় ধীরে ধীরে অনিয়মিত হয়ে পড়ি। বর্তমানে আমরা দুজনই শারীরিক-মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। আমাদের দুটি সন্তান। এক ছেলে, এক মেয়ে। তারা আমাদের অনুমতি ছাড়াই প্রেম করে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। ছেলে ভালো পড়াশোনা করে ব্যবসা শুরু করেছিল, বেশ উন্নতিও করছিল। কিন্তু সম্প্রতি বন্ধুদের প্ররোচনায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। তারপর থেকে আমাদের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন কষ্ট। ছেলের মাদকাসক্তির কারণে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হতাশ হয়ে বাঁচার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। একসময় আমি সিগারেটে আসক্ত হয়ে পড়ি। ছেলে মাদক ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু অর্থনাশ করে এখন শূন্য হাতে ঘরে বসে আছে। আমরা খুব কষ্টে দিনযাপন করছি। আমার জন্যে দোয়া করবেন গুরুজী। আমি যেন ধূমপান ত্যাগ করে আপনার নির্দেশিত পথে চলতে পারি।*

উত্তর : সন্তান আপনাদের অনুমতি ছাড়া প্রেম করে বিয়ে করে ফেলেছে। প্রথমত, প্রেম কেউ অনুমতি নিয়ে করে না। কোনো কালেই কেউ তা করে নি। দ্বিতীয়ত, বিয়ে করে ফেলার পর আপনাদের তরফ থেকে অনুমোদন দেয়া ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে? সাধারণত সন্তান বিয়ে করে ফেললে বুদ্ধিমান মা-বাবা অনুমোদন দিয়ে নিজেরাই বিষয়টি সহজ করে নেন। আর আবেগপ্রবণ মা-বাবা এ নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করে নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহের জন্ম দেন।

আসলে মা-বাবার কখনোই উচিত নয়–সন্তানের ব্যাপারে কোনো ধরনের নেতিবাচক ভাবনাকে নিজের মধ্যে প্রশ্রয় দেয়া বা ধারণ করা। কারণ যখনই আপনি সন্তানের ওপর রাগ ক্ষোভ বিরক্তি পুষে রাখবেন, শেষ পর্যন্ত তা সন্তানের ক্ষতির কারণ হবে। সেই ক্ষতির প্রভাবটা আবার এসে পড়বে আপনার জীবনেই। সন্তানের ক্ষতি মানে আপনারই ক্ষতি। তাই সন্তানের প্রতি কোনো নেতিবাচকতা মনে স্থান দেবেন না।

আর অন্যরা আপনার ছেলেকে মাদকাসক্ত করেছে তা মনে করছেন কেন? আমরা আসলে নিজের সন্তানের দোষ দেখি না। অন্যরা কীভাবে মাদকাসক্ত করে? প্রেমও কি অন্য আরেকজন করে দিয়েছে? সে-তো দুধের শিশু না যে তাকে ফিডার দিয়ে মাদক খাইয়ে দিয়েছে। ব্যবসা থেকে অর্জিত টাকা সে বিপথে ব্যয় করেছে। টাকা সঠিকভাবে ব্যয় করার জন্যে সঠিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। প্রশ্ন হলো, এ শিক্ষাগুলো তাকে আপনারা দিয়েছেন কিনা।

আর এখন ছেলে শূন্য হাতে আছে থাকুক। যতদিন নাবালক ছিল মা-বাবা হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব ছিল। ছেলে যখন সাবালক হলো, উপার্জন করতে শিখল, বিয়ে করল, তারপর তাকে নিয়ে এত চিন্তা করা অপ্রয়োজনীয়। এই সন্তান-আসক্তির কোনো মানে হয় না। তার জন্যে এখন আপনার কাজ হচ্ছে দোয়া করা। সে খারাপ হয়েছে, এই চিন্তায় আপনার বাঁচার প্রতি আগ্রহ কমে আসবে কেন? আগ্রহ কমলেও আপনি মারা যাবেন, আগ্রহ বেশি হলেও মারা যাবেন। মৃত্যু যখন আসবে, সবাই মারা যাবে।

আমরা আপনার প্রতি সমবেদনা জানাই এবং দোয়া করি। তবে এই ভুলটা অনেকেই করেন। মেডিটেশন ও ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে নিয়মিত হওয়ার পর সময়টা যখন ভালো হতে শুরু করে, ব্যস্ততা বাড়তে থাকে তখন এই ব্যস্ততার অজুহাতে তারা প্রোগ্রামে আসা কমিয়ে দেয়। কী কারণে ব্যস্ততা বাড়ল, সুযোগ বাড়ল–সেটা তখন আর চিন্তা করে না। মনে করে, সবকিছু তার নিজের চেষ্টাতেই হয়েছে। আল্লাহর রহমতে যে কাজগুলো সহজ হয়েছে, সেটা তখন ভুলে যায়। যার ফলে কাজের পাশাপাশি অনেক অকাজের মধ্যেও সে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে ভুলে যায়।

ধরুন, আপনি কিছু টাকা পেলেন। মনের আনন্দে তা খরচও করছেন। কিন্তু টাকার প্রবাহ যদি নিয়মিত না হয়, তাহলে সেটা একদিন শেষ হয়ে যাবে। যখন সত্যি সত্যি শেষ হয়ে যায় তখন মানুষ টের পায়, আরে, আমার তো সব শেষ হয়ে গেল!

আপনার ক্ষেত্রেও তেমন ঘটনাই ঘটেছে। এই যে ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে সবার আগে আসতেন, নিয়মিত মেডিটেশন করার ফলে একটা ইতিবাচক আবহে ছিলেন। সবমিলিয়ে ভালো ছিলেন। তারপর ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে অনিয়মিত হয়ে গেলেন। যখনই অনিয়ম করতে শুরু করলেন তখন ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ কমে গেল। তারপর ক্রমান্বয়ে আজকের এই অবস্থা। আপনি সিগারেট ধরলেন। ছেলেমেয়েরা প্রেম করে বিয়ে করল এবং অন্য জায়গায় চলে গেল। ছেলে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল।

তাই সবসময় মনে রাখবেন–যে কারণে আপনার জীবনে সুযোগ ও সাফল্য এসেছে তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবেন না। সৎসঙ্ঘের ইতিবাচক বলয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। যত ব্যস্ততাই আসুক–মেডিটেশন, সাদাকায়ন ও ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে উপস্থিতি ঠিক রাখবেন। বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন।

আর সিগারেট ছাড়তে আবার দোয়া লাগে নাকি? ছেড়ে দিলেই হলো। একজন পুরুষ মানুষ আপনি, সিগারেট ছাড়তে পারবেন না, এটা একটা কথা হলো? সিগারেট যদি শান্তি দিতে পারত তাহলে সিগারেট-বিড়িখোররা সবাই শান্তিতে থাকত। আমরা ভুলটা করি এখানে। দুশ্চিন্তা কমানোর জন্যে সিগারেট খাই, আরো বেশি টাকা হলে মদ খাই এবং পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলি।

অতএব আবার নিয়মিত মেডিটেশন শুরু করুন। আল্লাহর কাছে তওবা করুন, কান্নাকাটি করুন। তিনি যে-কোনো অবস্থা থেকে পুনরায় যে-কারো উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি জানি, করুণাময়ের করুণা সবসময় সৎকর্মশীলদের সাথেই থাকে। আমি সৎকর্মশীল। বিজয় আমারই।

বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে কোয়ান্টাম ইয়োগা

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন ১১৩, ১১৪ ও ১১৫ তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের নবনিযুক্ত ৩০ জন নারী ও ৯৮ জন পুরুষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। ২৬ ও ২৭ জুলাই

শিক্ষার্থী সেমিনার : ব্রেন+মাইন্ড+মেডিটেশন = সাফল্য

আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েটে) কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজন করে 'ব্রেন+মাইন্ড+মেডিটেশন = সাফল্য' শীর্ষক তিনটি শিক্ষার্থী সেমিনার। শিক্ষার্থীরা মন ও মস্তিষ্কের সঠিক ব্যবহার করে কীভাবে সাফল্য অর্জন করবে, এ নিয়ে সেমিনারগুলোতে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল।

১৮ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল অডিটোরিয়ামে ৮৬ জন ও ১৩ জুলাই আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অংশ নেয় ১৭০ জন শিক্ষার্থী।

১১ জুলাই রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অংশ নেন ১৪৫ জন শিক্ষার্থী। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুয়েটের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রাফিকুল ইসলাম শেখ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সেলিম হোসাইন।

এ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কেমিক্যাল ও ফুড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. মোহাম্মদ নুরুর রহমান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অজেয় ১৯

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিকে গতিশীল রাখতে ৩০ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় 'অজেয় ১৯'। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও ভিডিও ডকুমেন্টারির সমন্বয়ে পরিচালিত এই সেশনটিতে শিক্ষার্থীরা রক্তদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে এবং স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এতে অংশ নেয় ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৬৫ জন শিক্ষার্থী।

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার

কুমিল্লা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ

- যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৯ জুলাই মোট ১২টি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির মোট ৮৮৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রতিষ্ঠানটির ৭০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
- ২৭ জুলাই নাটোরে কাফুরিয়া হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উচ্চ বিদ্যালয়ে দুটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। একটি সেশনে অষ্টম ও দশম শ্রেণির ১২৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। আরেকটি সেশনে অংশ নেন মোট ৯৭ জন অভিভাবক।
- ২০ জুলাই গোপালগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে ১৮৫ জন শিক্ষার্থী, ১৫ জন শিক্ষক, ১০ জন কর্মকর্তা ও আট জন দায়িত্বশীলসহ ২১৯ জন অংশ নেন।
- ২০ জুলাই ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এইচএসসি প্রথম বর্ষের ১৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ১৮ জুলাই মেট্রোপলিটন ক্রিয়েটিভ স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী ও আট জন শিক্ষক অংশ নেন ।

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ মহিলা কলেজের সেমিনারে শিক্ষার্থীরা সানন্দে গ্রহণ করেন দেশপ্রেম ও সালাম চর্চার স্টিকার

- ১৫ জুলাই কুমিল্লা কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুটি সেশনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রতিষ্ঠানটির একাদশ শ্রেণির ১৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ১৩ জুলাই কুমিল্লায় হোচ্ছামিয়া লুৎফুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ মোট ১৭৩ জন অংশ নেন।
- ৭ ও ৮ জুলাই ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে সবুজ বিদ্যাপীঠ স্কুল ও কলেজে তিনটি সেশনে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী ও ২৪ জন শিক্ষক অংশ নেন।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

জাতীয় দুর্যোগে মানুষের পাশে

৬১ দিনে (জুন-জুলাই) প্লাটিলেট সরবরাহ ৬,৮২৯ ইউনিট

২০০০ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেড় যুগের যাত্রায় যে-কোনো জাতীয় দুর্যোগে যখনই রক্তের প্রয়োজন হয়েছে, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এগিয়ে এসেছে মুমূর্ষের সেবায়।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

২৯ জুলাই রাত ১১টা। তখনো কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্তের জন্যে বসে আছে প্রায় একশ জন। কারণ ঢাকার সাম্প্রতিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে নগরবাসীকে। সবচেয়ে বেশি অসহায় বোধ করছেন ডেঙ্গু হেমোরেজিক বা ডেঙ্গুজনিত রক্তক্ষরণে আক্রান্ত রোগীদের স্বজন ও পরিবারের সদস্যরা। হন্যে হয়ে প্রিয়জনের জন্যে তারা খুঁজে ফিরছেন প্লাটিলেট। আর নিরাপদ ও বিশুদ্ধ রক্তের চাহিদা পূরণে আস্থা অর্জনের দরুন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীর স্বজনদের প্রথমেই পাঠাচ্ছেন কোয়ান্টাম ল্যাবে।

সেদিন কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে শুধু প্লাটিলেট সরবরাহের পরিমাণ ২৭৫ ইউনিট। ডেঙ্গু রোগীদের জন্যে প্রয়োজনীয় প্লাটিলেট প্রস্তুত ও সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে নিরলসভাবে কাজ করছেন কোয়ান্টাম ল্যাবের সর্বস্তরের কর্মী।

উল্লেখ্য, পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের জন্যে এক ইউনিট প্লাটিলেট বা অণুচক্রিকা প্রস্তুত করতে প্রয়োজন হয় একই গ্রুপের চার ব্যাগ রক্ত।

এ পর্যন্ত সরবরাহ ১১,১৫,৯৫৪ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান

অগ্নিদগ্ধ রোগীর প্রয়োজনে ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা

২০১৪ সালে দেশে অগ্নিদগ্ধ রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। আর বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন রোগীদের জরুরি ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় প্রয়োজন রক্তের একটি বিশেষ উপাদান ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি)। সে-বছর বার্ন ইউনিটের রোগীদের প্রয়োজনের একটি বড় অংশ–২০,৮৮৪ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে আট তলা ভবন রানা প্লাজা ভেঙে পড়ে নিহত হন ১১ শতাধিক পোশাক শ্রমিক। আহত হয়েছেন আরো কয়েক সহস্র শ্রমিক। এ দুর্গতদের জন্যে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে। আহতদের চিকিৎসার্থে তিন-চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও মানুষ রক্তদান করেছেন। এসময় কোয়ান্টাম ল্যাবে তিন দিনে সংগ্রহ হয় আড়াই হাজারেরও বেশি ইউনিট রক্ত।

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সন্ধানীসহ একাধিক হাসপাতালে শত শত ব্যাগ রক্ত দিয়ে আসা হয় যেন রক্তের সেবাদানকারী সব প্রতিষ্ঠান মানুষের দুঃসময়ে সেবা দিতে পারে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মাননা

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে ২৩ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. মিলন অডিটোরিয়ামে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমসহ দেশের ১০টি রক্তদাতা সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ছবিতে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান (ডানে)।

১৭ জুলাই কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে রক্তদান করেন দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা উই *লাভ* ইউ ফাউন্ডেশনের ৩২ জন সদস্য। তাদের মধ্যে আট জন কোরিয়ান নাগরিক ও বাকি ২৪ জন বাংলাদেশী। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস (১৪ জুন) উপলক্ষে তারা রক্তদান করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন

[স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, গাইনি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়]

বাইরের সাহায্য ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে আমরা যে-কোনো কাজ করতে পারি, যদি আমরা তা মন থেকে চাই। যেমনটা কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম স্ব-উদ্যোগ ও স্ব-অর্থায়নে কাজ করে যাচ্ছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান, ১৭ জুলাই ২০১৭

ডা. সামন্ত লাল সেন

[প্রধান সমন্বয়ক, শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি]

আমাদের বার্ন ইউনিটে দিনে গড়ে ৪০-৫০ ইউনিট রক্ত প্রয়োজন হয়। এ রোগীদের অধিকাংশই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা গরিব অসহায় মানুষ। বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রক্তের জন্যে আমরা তাদের কোয়ান্টামে পাঠাই। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই এ সেবাদান সম্ভব হচ্ছে।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান, ২৭ মে ২০১৫

অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার

[সায়েবা'স মেথডের উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা, মাম'স ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ]

আমাদের সকল রোগীর পক্ষ থেকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম ও রক্তদাতাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ মাম'স ইনস্টিটিউটে রোগীদের যে রক্তের প্রয়োজন হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগই আমরা পাই কোয়ান্টাম থেকে।

মুক্ত আলোচনা, ১ অক্টোবর ২০১৮

আপনার এলাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬
blood.quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন : আগস্ট ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

সেপ্টেম্বর ২০১৯

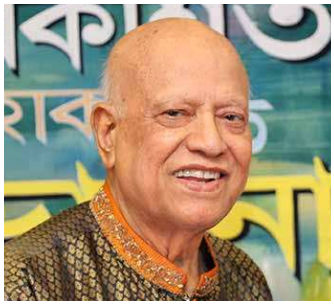

সবার অংশগ্রহণে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

আবুল মাল আবদুল মুহিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা কোনো বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। ঢাকার অর্থনীতি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, নীলফামারীও এগোচ্ছে সেই একই গতিতে। গ্রামের উন্নয়ন স্বল্প পরিসরে হলেও গতিটা কিন্তু শহরের মতোই।

এর মানে হচ্ছে, দেশের সকল মানুষ এই অর্থনৈতিক উন্নয়নে একসাথে অংশগ্রহণ করছে। তাই আমি মনে করি, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাই আমাদের সামনে এই অগ্রযাত্রার সুযোগ করে দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলাম। ২৫ মার্চ কালো রাতের ঘটনার পর আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২৭ মার্চ বৈঠক করি। প্রায় ৭০ জন বাংলাদেশি আমার ম্যানহাটনের বাসায় সেই বৈঠকে অংশ নেন। সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো–পশ্চিম পাকিস্তানের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে আমরা ইউএস কংগ্রেসের সামনে প্রকাশ্যে সমাবেশ করব। ওখানে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরাসহ প্রায় তিন শত মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। প্রবাসে থেকেও আমরা সেদিন এভাবেই আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

কোয়ান্টামের এই আয়োজনে এসে আমার খুব ভালো লাগছে যে, এখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান সংখ্যায় অংশ নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটাও আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রার একটি লক্ষণ।

[২৪ আগস্ট কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৯০ তম পর্বে একথা বলেন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ, লেখক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। আলাপচারিতার ভিত্তিতে এ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ।]

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

সময় থাকতে সচেতন হোন দেহ-মন সুরক্ষায়

দেহ হচ্ছে আত্মার বাহন। দেহ সুস্থ নয় তো আত্মাও সুস্থ নয়। আত্মা যাতে যথার্থভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্যে দেহের ফিটনেস খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটা বুঝি আসলে তখন, যখন দেহের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিগড়ে যায় কিংবা স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া বিকল হয়ে পড়ে। তখন একে ঠিক করার জন্যে যতরকম চেষ্টা দরকার আমরা করি, প্রয়োজনে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় আমরা ব্যয় করে ফেলি। কিন্তু একবার বিগড়ে গেলে শরীর আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে খুব কমই। মনের ক্ষেত্রেও তা-ই। মন ও আত্মার পরিচর্যার জন্যে প্রার্থনা ও নিয়মিত মেডিটেশনের গুরুত্ব আমরা সবাই জানি, যা মনোজগতের যে-কোনো বিপর্যয় প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাই সময় থাকতেই সচেতন হোন। দেহ-মন সুরক্ষায় মনোযোগী হোন।

> পবিত্র কোরআনের আমপারাভুক্ত সূরাগুলোর মূল শিক্ষাই জবাবদিহিতা, যার মর্মার্থ হলো–আমার মেধা সময় শ্রম অর্থ কীভাবে ব্যয় করছি, তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে।

১৫ থেকে ১৮ আগস্ট–চার দিনব্যাপী একটি বিশেষ আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন সারাদেশ থেকে সমবেত আর্ডেন্টিয়ার ও ফাউন্ডেশনের সকল পর্যায়ের অর্গানিয়ারবৃন্দ।

গুরুজী বলেন, যতক্ষণ আমরা সুস্থ থাকি, শারীরিকভাবে শক্ত সমর্থ কর্মক্ষম থাকি–নিজেদের আমরা জবাবদিহিতার বাইরে মনে করি। কিন্তু সত্য হলো, শরীর এর বাইরে নয়। আমরা কেউই আসলে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নই। নিজেদেরকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে মনে করি বলেই আমরা নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনায় পড়ে যাই। অথচ পবিত্র কোরআনের আমপারাভুক্ত সূরাগুলোর মূল শিক্ষাই জবাবদিহিতা, যার মর্মার্থ হলো–আমার মেধা সময় শ্রম অর্থ কীভাবে ব্যয় করছি, তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। আসলে জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন হলে জীবনের সবকিছুতেই একটা একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। দেহ-মন সুস্থ রাখার জন্যেও চাই এই একাগ্রতা।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বুদ্ধিমান মানুষ সবসময় সংকট সৃষ্টি হওয়ার আগেই সচেতন থাকে, যেন পরিস্থিতি সংকটাপন্ন না হয়। সুস্থতা ও প্রশান্তি অর্জনের জন্যে এটাই সঠিক জীবনদৃষ্টি। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা ক্রাইসিস বা সংকট মোকাবেলায় যত দক্ষ ও ক্ষিপ্র, নিয়মিত কাজের বেলায় সাধারণত ততটা নই। দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা–বিশেষত রুটিন অনুসরণে আমাদের ততটাই অনীহা। কারণ দেহ-মনের সুস্থতা এবং জীবনের অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ ও সচেতনতার অভাবে যে আমাদের কখনো ভুগতে হতে পারে, বিভিন্ন ভোগান্তি আসতে পারে, তা আমরা বিশ্বাসই করি না। আর এটাই হলো ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই যে-কোনো সংকট আসার আগেই আমাদের সচেতন হতে হবে–হোক সেটা দেহ-মনের সুস্থতা ও প্রশান্তিজনিত, হোক সেটা জীবনের অন্য কোনো ব্যাপারে। অতএব দেহ-মনের সুরক্ষায় নিয়মিত মেডিটেশন, ব্যায়াম ও আত্মিক পরিশুদ্ধির বিষয়ে সচেতন হোন।

আদর্শ মানুষ ও সমাজ গড়ার কার্যক্রম কোয়ান্টাম মেথড

ড. কাজী নুরুল ইসলাম

৪৭ বছর ধরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। এ পর্যন্ত বহু শিক্ষক দেখেছি, দেশে-বিদেশে লেখাপড়া করেছি, প্রায় দুশ সভা-সেমিনারে অংশ নিয়েছি। কিন্তু আমি কখনো এতটা মুগ্ধ হই নি, যতটা হয়েছি এ চার দিনে। আমি বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আদর্শ মানুষ গড়ার একটি কার্যক্রম। আলোকিত সমাজ নির্মাণের কার্যক্রম।

এখানে আসার আগে আমি কিছুটা সন্দিহান ছিলাম–চার দিন বসে থাকতে পারব কিনা। কিন্তু প্রথমদিনের পরই আমার সমস্ত ক্লান্তি কোথায় চলে গেছে আমি জানি না। এখন মনে হচ্ছে, অন্য অনেক কাজ বাদ দিয়ে হলেও আরো ২০ বছর আগে এখানে আসা উচিত ছিল আমার। তাহলে ছাত্রছাত্রীদের আরো অনেক কিছু দিতে পারতাম।

২০ বছর আগে আমি ও আমার স্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এর লক্ষ্য ছিল–শিক্ষার্থীদের সামনে সব ধর্মের নৈতিক শিক্ষা তুলে ধরা এবং একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণ। সে দায়িত্ব আমরা নিষ্ঠার সাথে পালন করছি। এখানে এসে দেখছি–একই কাজ গুরুজী করে চলেছেন আরো বড় পরিসরে এবং অনেক আগে থেকেই।

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী নুরুল ইসলাম। কোয়ান্টাম মেথড ৪৬১ ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি একথা বলেন। সহধর্মিণী অধ্যাপক ড. আজিজুন নাহার ইসলামকে সাথে নিয়ে তিনি এ কোর্সে অংশ নেন।]

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬২ তম কোর্স ॥ ঢাকা

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

দেশের বিশিষ্ট স্থপতি ও নগর-বিশ্লেষক মোবাশ্বের হোসেন। কমনওয়েলথ এসোসিয়েশন অব আর্কিটেক্টস এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সভাপতি। ১ জুলাই ২০১৯ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় 'সুস্থ পরিবেশ সমৃদ্ধ জাতি' বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

আজকের তরুণরাই একালের মুক্তিযোদ্ধা

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন

দেশ স্বাধীন হওয়ার বছর তিনেক পরের কথা। কমনওয়েলথের একটি কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। ওখানে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোত্থেকে এসেছেন? আমি বললাম, বাংলাদেশ। তিনি শুনলেন বার্বাডোজ। আমি যতই বলি 'বাংলাদেশ', তিনি শোনেন 'বার্বাডোজ'! তার হয়তো কোনো দোষ ছিল না, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নাম তিনি কখনো শোনেন নি, তাই চিনতে পারছিলেন না। কিন্তু বহির্বিশ্বে আজকের চিত্র পুরোটাই ভিন্ন।

এখন বিদেশে যত অনুষ্ঠানে যাই, বাংলাদেশকে সবাই একনামে চেনে। খেলাধুলার পাশাপাশি নানামুখী দক্ষতা, সাফল্য ও মেধার বিবেচনায় যে-কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলেমেয়েরা বেশ ভালো করছে। তাদের কল্যাণে বাংলাদেশকে এখন বিশ্বজুড়ে সবাই চেনে।

২০১৩ সালে সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের ডিজাইন নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো ঢাকায়। ৪৫০টি ডিজাইন জমা পড়ল। একজন বাদে বিচারকমণ্ডলীর সবাই ছিলেন বিদেশি। প্রতিটি ডিজাইনে শুধু কোড নম্বর লিখে বিচারকদের দেয়া হলো, যাতে বোঝা না যায় ডিজাইনটি কোন দেশের প্রতিযোগীর। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় স্থান পেল ২০টি ডিজাইন, যার পাঁচটিই ছিল বাংলাদেশের। আমাদের ভবিষ্যৎ স্থপতিদের এই অর্জনের কথা আমি সব জায়গায় গর্বভরে বলি।

বিশ্বে স্থাপত্য পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আগা খান পুরস্কার। সম্প্রতি একই বছর বাংলাদেশের দুজন স্থপতি এ পুরস্কার পেলেন, আগে কোনো দেশই এমনটা পায় নি। আমি তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে খুব আশাবাদী।

একটা পরিসংখ্যান বলি। এখন এদেশের আবাদী জমির পরিমাণ ১৯৭১ সালের তুলনায় অর্ধেক। অন্যদিকে আমাদের বর্তমান জনসংখ্যা সে-সময়ের দ্বিগুণেরও বেশি। কিন্তু তখন আমাদের খাদ্যঘাটতি থাকলেও এখন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ থেকে আমরা আমাদের কৃষকদের দক্ষতা বুঝতে পারি। তাই কোনোভাবেই এই দেশ ও জাতি নিয়ে হতাশ হওয়া যাবে না।

আমরা আসলে হতাশ হই কখন? যখন মিডিয়ায় কোনো নেতিবাচক খবর শুনি। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন তো, পত্রপত্রিকায় কোন খবরটা ছাপানো হয়? কোথায় কী খারাপটা হচ্ছে সেগুলোই বেশি। আসলে ভালো কাজ হলো মানুষের সহজাত, এগুলো হওয়ারই কথা। যেমন দিয়াশলাই আগুন জ্বালাবে, কিন্তু যদি জ্বালাতে না পারে তখন এটা হবে নিউজ। তাই নেতিবাচক খবর শুনে হতাশ হওয়া যাবে না। প্রতিদিনের ভালো কাজগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি।

তবে মনে রাখতে হবে, কোনোকিছু গড়তে সময় লাগে বেশি। কিন্তু ধ্বংস করতে লাগে কয়েক মুহূর্ত। যেমন ধরুন, ৫০ জন মিলে কলা চাষ করল। ফলন হতে সময় লাগল কয়েক মাস। কিন্তু এক রাতে একজন দুষ্ট লোক করাত দিয়ে সব কলাগাছ কেটে দিল কয়েক মিনিটে। এই একজনের মন্দ কাজের তথ্যটাই কিন্তু মিডিয়ায় আমরা দেখতে পাব। কারণ এসব খবরে পত্রিকার কাটতি বাড়ে। হিসাব করলে কিন্তু সমাজে ভালো মানুষের সংখ্যাই বেশি। এই ভালো মানুষগুলো যদি সচেতন হয়ে রুখে দাঁড়াত, তাহলে ঘটনা অন্যরকম হতো। তাই আমাদের সচেতন হতে হবে আমাদের অধিকার নিয়ে।

সচেতন হতে হবে পরিবেশ নিয়েও। কারণ সমস্ত উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়বে যদি তা পরিবেশবান্ধব না হয়। উন্নত দেশগুলোতে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদেরও প্রতিদিন অন্তত আড়াই কিলোমিটার হাঁটতে হয়। তাদের দেশের রাস্তা, ফুটপাত, পার্কিং সবকিছু ওভাবেই নকশাকৃত। কিন্তু এদেশে তা এখনো হয় নি। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, আমরা হাঁটতে রাজি নই। সবাই শুধু ব্যক্তিগত গাড়ি চাই। গাড়ি নিয়ে ড্রইংরুম পর্যন্ত চলে যেতে পারলে আমরা বাঁচি! আর এটা বদলাতে হলে রাস্তাঘাটগুলোর স্থাপত্য-নকশায় তো বটেই, সবার আগে পরিবর্তন করতে হবে আমাদের চিন্তা, আমাদের পরিকল্পনা। দেশের যাবতীয় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস-আদালত, যা আজও রাজধানীকেন্দ্রিক, এর সুষম বণ্টন ও বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাথে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতি মনে পড়ে। স্বাধীনতার পর উপমহাদেশের প্রখ্যাত স্থপতি মাজহারুল ইসলাম গেলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে। সাথে আমাকেও নিয়ে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই তরুণ আর্কিটেক্ট মুক্তিযুদ্ধ করেছে। এদের দিয়ে এখন দেশের কাজ করাতে হবে।' বঙ্গবন্ধু আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'বাবারা! শুধু ঢাকা শহর নিয়ে প্ল্যান করলে হবে না। সারা বাংলাদেশ নিয়ে প্ল্যান করতে হবে। না হলে বিপদে পড়বা।'

সেই কথাটাই আজ সত্যি হয়েছে। আসলেই আমরা এখন ঢাকা শহর নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। অথচ পৃথিবীতে আর কোনো রাজধানী নেই, যার চারপাশটা জড়িয়ে আছে ছোট-বড় ছয়টি নদী দিয়ে। কিন্তু আমরা এই সৌভাগ্য ধরে রাখতে পারি নি। নদীগুলোকে ক্রমান্বয়ে দূষিত করে তুলেছি।

বর্তমানে আমাদের যে রেলব্যবস্থা, তার একটু উন্নতি করলেই ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলাচল সম্ভব। ফলে ঢাকা থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বের পঞ্চগড় পর্যন্ত একজন কর্মজীবী মানুষ সহজেই প্রতিদিন আসা-যাওয়া করতে পারবে। অর্থাৎ এরকম কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই আমাদের যা আছে তা নিয়েই ঢাকার জনবসতি অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব।

আমার বিশ্বাস আমরা পারব। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র নয় মাসে একটি দেশ স্বাধীন করার নজির কোনো জাতির নেই। দেশ গড়ার কাজটাও আমরা পারব এবং এটা আমাদের তরুণরাই করবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরাও তরুণ ছিলাম। তখন আমরা জানতাম আমাদের শত্রু কে, কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং সারাদেশের মানুষ আমাদের পাশে ছিল। কিন্তু আজকের তরুণরা জানে না তাদের শত্রু কে। চারপাশে শত্রু আছে না মিত্র! যদিও পদস্খলনের শঙ্কা সবসময়ই থাকে। তারপরও তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এটাই হলো মুক্তির সংগ্রাম, যা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর কথায় তো আছেই যে, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। আমি মনে করি, আজকের তরুণরাই একালের মুক্তিযোদ্ধা।

তাই আমাদের অন্যের দিকে তাকালে চলবে না। যার যার কাজটা ভালোভাবে করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা বাড়ির নিচের অংশটুকু পরিষ্কার রাখব, জ্বালানি গ্যাসের অপচয় করব না–অন্তত এভাবে শুরুটা করি। ছোটবেলায় গল্প পড়েছিলাম, এক দেশের রাজা একটি পুকুর খুঁড়তে বললেন। তারপর প্রজাদের নির্দেশ দিলেন, রাতে সবাই দুধ দিয়ে পুকুরটি পূর্ণ করবে। কিন্তু সকালে দেখা গেল পুকুরে শুধুই পানি। কারণ প্রজারা প্রত্যেকেই ভেবেছিল, সবাই তো দুধ ঢালবে আমি না হয় পানিই দেই। কিন্তু এমন প্রজা আমরা কেউই হতে চাই না।

আমার ব্যক্তিগত জীবনেও আমি নিজের কাজের প্রতি সবসময় শ্রদ্ধাশীল থাকার চেষ্টা করেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার পরিবার আমাকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জোর করেছিল। আমার মা ও ভাইয়ের ছিল লন্ডনের সিটিজেনশিপ। কিন্তু আমি দেশ ছেড়ে যেতে চাই নি। পরেও বহুবার বিদেশে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু বরাবরই আমি চেয়েছি বাংলাদেশে থাকতে। কারণ আমি এখনো বিশ্বাস করি, একটু উদ্যোগী হলেই আগামী আট-নয় বছরের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারব। শ্রেষ্ঠ হওয়ার সমস্ত গুণ ও যোগ্যতা এদেশের মানুষের রয়েছে।

সুস্বাস্থ্যের সহজ সূত্র : পরিচ্ছন্নতা

দৃশ্যপট ১ : ঢাকায় দেশসেরা এক বিদ্যাপীঠে কয়েক হাজার মানুষের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠান চলছে। পরিপাটি সুন্দর অনুষ্ঠানস্থলে দুপুরের বিরতি শেষে দেখা গেল, যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে খাবারের প্যাকেট, খালি পানির বোতল, টিস্যু পেপার। সচেতন কেউ কেউ ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট ঝুড়ি খুঁজতে গিয়ে উল্টো কথা শুনেছেন–'সবাই তো যেখানে-সেখানে ফেলছে। আপনি একা সচেতন হয়ে কী করবেন?'

দৃশ্যপট ২ : ইউরোপের একটি দেশ থেকে পাঁচ বছরের এক শিশু তার মা-বাবার সাথে বেড়াতে এলো বাংলাদেশে। মা-বাবা বাংলাদেশী হলেও বাংলা ভাষাটা তার শেখা হয় নি। কারণ তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা প্রবাসেই। এদেশে প্রায় মাসখানেকের অবস্থানকালে বাংলা শেখা বা বলার ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ শিশুটি দেখাল না। তবে একটি শব্দ শিখে ফেলল কয়েকদিনের মধ্যেই আর তা হলো– 'ময়লা'। ঘরে-বাইরে যেখানেই সে অপরিচ্ছন্ন কিছু দেখে বা আবর্জনা দেখে, বার বার আঙুল নির্দেশ করে তারস্বরে বলতে থাকে–ময়লা! ময়লা!

তীব্র আবেগ ও ভালবাসায় আমরা গেয়ে উঠি– *এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/ সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি*। আবার সেই আমরাই প্রতিদিন কত অবলীলায় অপরিচ্ছন্ন করে তুলছি এই জন্মভূমিকে। প্রকৃতির যত্নে গড়ে ওঠা জল-স্থল দিন দিন পরিণত হচ্ছে আবর্জনার ভাগাড়ে। শুধু ভাবমূর্তি আর সৌন্দর্যই নয়, অপরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে ব্যাহত হচ্ছে দেশবাসীর সার্বিক সুস্থতাও। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তই বলছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে রয়েছে আমাদের শারীরিক-মানসিক সুস্বাস্থ্যের সরাসরি সম্পর্ক।

পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থতার যোগসূত্র

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা ৩০ জোড়া দম্পতির ওপর একটি গবেষণা চালান। তাদের মধ্যে যারা বলেছেন, তাদের আবাসস্থল ততটা পরিচ্ছন্ন নয় এবং জিনিসপত্র প্রায়শই এলোমেলো থাকে, গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের পরিমাণ বেশি। ফলে বিষণ্নতা ও হতাশায় তারা আক্রান্ত হন সহজেই।

ব্রিটিশ জার্নাল অব স্পোর্টস মেডিসিন-এর রিপোর্টে উঠে এসেছে, একজন মানুষের স্ট্রেস লেভেল কমানোর ক্ষেত্রে প্রতিদিন ন্যূনতম ২০ মিনিটের শ্রমসাধ্য কাজই যথেষ্ট। আর তা যদি হয় পরিচ্ছন্নতার কাজ, তাহলে প্রাপ্তি হবে বহুমুখী।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির ফিজিক্যাল একটিভিটি ডিপার্টমেন্টের এসোসিয়েট প্রফেসর নিকোল কিথ পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেন। এতে দেখা গেছে, ব্যক্তির শরীর ও মনের ওপর পরিচ্ছন্নতার প্রভাব সীমাহীন। যারা গোছানো ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করে, তাদের কর্মক্ষমতা ও সুস্থতা অন্যদের চেয়ে বেশি।

অ্যালার্জির সংক্রমণ ও ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে সুরক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি-র রিপোর্টে উঠে এসেছে–বাসস্থানের অভ্যন্তরে বায়ু দূষণের মাত্রা কখনো কখনো বাইরের দূষণের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। আর এর জন্যে দায়ী হলো অপরিচ্ছন্নতা। এ তথ্য কারোই অজানা নয় যে, ক্ষতিকর পোকামাকড় ও মশার অন্যতম উৎপত্তিস্থল হলো ঘরে-বাইরে আবর্জনা ও জমে থাকা পানি। আর এ থেকেই ঘটে রোগ-জীবাণুর সহজ বিস্তার।

বোস্টনের সিমন্স কলেজের সেন্টার ফর হাইজিন এন্ড হেলথ ইন হোম এন্ড কমিউনিটির কো-ডিরেক্টর ও গবেষক এলিজাবেথ স্কট বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে জমে থাকা অপরিচ্ছন্ন পানিতে স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পেয়েছেন, যা মারাত্মক স্কিন অ্যালার্জি ও অন্যান্য রোগের কারণ।

দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে সহজেই

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন-এর পরিসংখ্যান হলো, প্রতিবছর হাসপাতালগুলোর জরুরি বিভাগে প্রতি তিন জনে একজন রোগী আসেন কোনো না কোনোভাবে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে। তাদের অর্ধেকের বেলায় পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে নিজের বাড়িতেই। ২.৫ মিলিয়ন রোগীর ক্ষেত্রে এ আঘাত হয় খুবই গুরুতর–হিপ জয়েন্টে ফ্র্যাকচার বা ট্রমাটিক হেড ইনজুরি। গবেষণায় এসেছে, সাধারণত এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটে অপরিচ্ছন্ন পিচ্ছিল বাথরুমে পা পিছলে এবং বাসায় ছড়ানো-ছিটানো জিনিসের কারণে পড়ে গিয়ে।

মনোযোগায়ন ও সুনিদ্রার জন্যে

জার্নাল অব নিউরোসায়েন্স কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা মতে, ঘরভর্তি আসবাব আর উপচে পড়া দ্রব্যসামগ্রী ব্যক্তির মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে। এ প্রভাব থেকে শিশুরাও মুক্ত নয়। চারপাশের বিশৃঙ্খলা শৈশব থেকেই তাদেরকে বিশৃঙ্খল মনোভাবের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

২০১১ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলেন, এলোমেলো স্তূপীকৃত জিনিসপত্র আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক। মস্তিষ্কের ভিজুয়াল করটেক্সকে তা সুনির্দিষ্ট কিছুতে দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর প্রতি আকৃষ্ট করে।

ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশনের একটি জরিপে উঠে এসেছে, যারা নিয়মিত নিজের বিছানা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখে, অন্যদের চেয়ে তাদের ঘুম তুলনামূলক ভালো হয়। শতকরা ৭৫ ভাগের ভাষ্য হলো, এই পরিচ্ছন্নতা তাদের দ্রুত শিথিল হতে সাহায্য করে এবং জেগে ওঠার পরও দেয় তরতাজা অনুভূতি।

সৃজনশীলতা বিকাশে

ব্যক্তির সৃজনশীলতা বিকাশে রয়েছে সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের ইতিবাচক প্রভাব। পরিচ্ছন্নতার কাজকে একঘেয়ে মনে হলেও এমন নীরব সময়গুলোই নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা এমনকি সমস্যার সমাধানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডার্বির মতে, যারা নিয়মিত পরিচ্ছন্নতার কাজে সময় দেন, তাদের মধ্যে নিজের দক্ষতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ জন্মে।

সামাজিক সুসম্পর্ক

আত্মীয়-পরিজন ও চারপাশের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও রয়েছে পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ির

ভূমিকা। শহুরে ব্যস্ত জীবনে সময় বের করে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করা অনেকের জন্যেই দুরূহ কাজ। আবার আত্মীয়-প্রতিবেশীকে আমন্ত্রণ জানানোর কাজটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে না বাসস্থানটি পরিপাটি দৃষ্টিনন্দন করার সময় পাওয়া যায় না বলে। অথচ নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে উঠলে সুগম হবে সামাজিক হৃদ্যতা।

পরিচ্ছন্নতা ও সুবিন্যাসায়ন

পরিচ্ছন্নতা ও সুবিন্যাসায়ন হলো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ঘরবাড়ি ও কর্মক্ষেত্রকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রথম ধাপ হলো, যা-কিছু অপ্রয়োজনীয় তা চিহ্নিত করা। শুধু এ-কাজটি করলেই দেখা যাবে, যেসব পণ্যে চারপাশ ঠাসা আছে বছরের পর বছর, তার অধিকাংশই বাইরে বের করে দেয়া যাবে সহজেই।

ধর্মের দৃষ্টিতে

দেহ-মনে ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকেই আরো সংহত করে। প্রতিটি ধর্মেই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

...তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ (পরিমণ্ডল) পরিচ্ছন্ন-পবিত্র রাখো। আর অপরিচ্ছন্নতা-অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। *[সূরা মুদাসসির, আয়াত ৪-৫]*

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। *[হাদীস]*

ভগবদ্‌গীতায় ঐশ্বরিক সম্পদ হিসেবে যে গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো–পরিচ্ছন্নতা। *[দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ : ১-৩]*

আমাদের দেশে পরিবেশ আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং আলোকিত মানুষ গড়ার অগ্রপথিক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ভাষায়–'পরিচ্ছন্ন মানুষই আলোকিত মানুষ। যে মানুষ পরিচ্ছন্ন নয়, সে কখনো আলোকিত হতে পারে না।' ইংরেজিতে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য–Charity begins at home. অর্থাৎ ঘর থেকেই শুরু হোক সেবা এবং ভালো আচরণ-অভ্যাস। তাই আসুন, পরিচ্ছন্ন হই। শুধু নিজের বাসাটিই নয়, সচেতন হই কর্মস্থল পথঘাট পার্ক যানবাহন–সবকিছুর ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সূচিত হোক জাতিগত পরিবর্তন। পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক আমাদের চারপাশ, প্রিয় স্বদেশ।

তথ্যসূত্র : সাইকোলজি টুডে
লাইফ ম্যাগাজিন
এমএসএন
আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র : কোয়ান্টাম কণিকা

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

আরো আগে কেন আসি নি

মেজর জেনারেল (অব)
অধ্যাপক ডা. মো. আলী আকবর

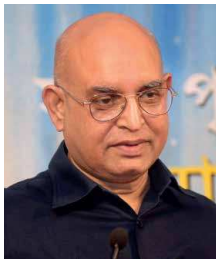

কোয়ান্টামে আসার আগে একটা দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলাম–এখানে এলে ধর্ম-কর্ম থাকবে কিনা। কিন্তু কোর্স করে আমার ভুল ভেঙেছে। আমার মনে হয়, ধর্মের নামে যত গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা আছে, কোয়ান্টাম তার ঊর্ধ্বে। মেডিটেশনকে আমার জাদু মনে হয় নি। এটা বিজ্ঞান। তাই সবারই মেডিটেশন চর্চা করা প্রয়োজন।

প্রথমদিন ক্লাস শেষে যখন ফিরে গেলাম, খেয়াল করলাম রেগে কথা বলার সময় আমার ভেতরে সংকোচ কাজ করছে। আমার মনে হচ্ছিল–রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। অনুভব করলাম, মেডিটেশন করে আমি কিছু একটা অর্জন করেছি। আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি।

এখানে এসে মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আমি ২০ বছর আগে কেন আসি নি! তবে দেরিতে এলেও গুরুজী আমাদের যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা যদি আমরা অনুসরণ করি, নিশ্চয়ই আমরা একদিন ভালো মানুষ হতে পারব। আমাদের জীবন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।

[ইউরোলজি বিশেষজ্ঞ। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ৪৬১ ব্যাচ]

জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ পেলাম

মো. গোলাম মোস্তফা

আমার কোমর ও হাঁটুতে ব্যথা ছিল। প্রতিদিন ক্লাস নেয়ার জন্যে স্কুলে তিন তলায় ওঠা-নামা করতে খুব কষ্ট হতো আমার। এ চার দিন মেডিটেশন করার পর আমার ব্যথা আর নেই। তিন তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে এখন আমার আর অসুবিধা হচ্ছে না। দীর্ঘদিন পর আমি সঠিকভাবে নামাজ পড়তে পেরেছি।

ছেলেকে নিয়ে আমি এ কোর্সে এসেছি। বর্তমান পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সন্তানদের নিয়ে আমরা অনেক টেনশনে থাকতাম। এ কোর্সে এসে আমার মন অনেকটাই শান্ত হয়েছে। এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করছি। এখন মনে হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তা ও নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জায়গা আমরা পেয়েছি, সেটা হলো কোয়ান্টাম। শিক্ষকতার সুবাদে আমি অনেক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু জীবনযাপনের জন্যে যে প্রশিক্ষণ তা এখানে এসে পেলাম।

[সহকারী শিক্ষক, এম.পি.এস.টি স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া। ৪৬১ ব্যাচ]

ধর্মবর্ণনির্বিশেষে মানবকল্যাণই কোয়ান্টামের মূল কথা

আগাথা দীপ্তি গোমেজ

সম্প্রতি একজন আত্মীয়া মারা যাওয়ায় আমার মনটা প্রায়ই খারাপ থাকত। শান্তির একটি জায়গা খুঁজছিলাম। এমন সময় কোয়ান্টামের সন্ধান পাই। কিন্তু এ কোর্সে এসে মনে হয়েছে, কীভাবে আমি চার দিন বসে থাকব! প্রথম দুঘণ্টা আলোচনা শুনেই ভালোলাগা কাজ করতে শুরু করল। তারপর প্রতিটি আলোচনা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। মন ও মস্তিষ্কের সমন্বয়ে একজন মানুষ তার নিজের জীবন বদলে দিতে পারে, এ বিশ্বাস গুরুজী আমাদের ভেতর জাগ্রত করেছেন।

আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে কোয়ান্টামের অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ। আমি গ্রামে বড় হয়েছি। সেখানে আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান মিলেমিশে থাকতাম। সবার উৎসবে সবাই যেতাম। এ সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্ম কখনো বাধা হয় নি। কোয়ান্টামকে আমি তেমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পেয়েছি। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে এখানে সবকিছুর ওপরে মানবকল্যাণ। এখানে সবাই সবার জন্যে প্রার্থনা করেছে, যা সামগ্রিক মঙ্গলের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন।

[প্রাক্তন সভাপতি, প্রবাসী বাঙালি-খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেকটিকাট। ৪৬১ ব্যাচ]

রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নেব না

অনন্যা ইসলাম

আমি কোর্সে এসেছি মূলত রাগের কারণে। অল্পতেই আমি খুব রেগে যেতাম। মা-বাবা কোনো কথা বুঝিয়ে বললে আমি তা শুনতাম না। বাসায় সবার সাথে চিৎকার করতাম। রেগে গিয়ে নিজের মোবাইল ফোন ল্যাপটপও আমি ভেঙে ফেলেছি।

কোর্সে এসে আমার উপলব্ধি হলো, রাগ মানুষকে কিছু দিতে পারে না বরং জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নেয়। আমি এখন বিশ্বাস করি, আমি আর রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নেব না। রাগ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ককে আমি আরো বেশি কাজে লাগাতে পারব।

আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, আমি ফেসবুক ও ইউটিউবে খুব আসক্ত। কিন্তু গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শিখেছি। জীবনে সফলতার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। বড় কিছু অর্জন করতে হবে, এই অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এখন আমি ফেসবুক বর্জন করে আমার সাফল্যের পথকে আরো উন্মোচন করতে পারব বলে বিশ্বাস করি।

[শিক্ষার্থী, অনার্স, বস্ত্র পরিচ্ছদ ও বয়ন শিল্প বিভাগ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ। ৪৬১ ব্যাচ]

আমার জীবনদর্শনে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন

ডা. নাসরীন আক্তার

আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত আছি। আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনের পড়াশোনা, ওয়ার্ডে সময় দেয়া, সন্তানের দায়িত্ব পালন–একসাথে এত কিছু সামলে উঠতে পারছিলাম না। গত সাত-আট মাস ধরে আমি মনোযোগ দিয়ে পড়তেও পারছিলাম না। এসব টেনশনে রাতে আমার ভালো ঘুম হতো না। আবার সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠলেও এক ধরনের অস্থিরতায় ভুগতাম। সব মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, আমি পাগল হয়ে যাব।

কোর্সের দ্বিতীয় দিন গুরুজীর আলোচনায় একটি কথা আমার খুব ভালো লাগল–যিনি যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তার যোগ্যতা আছে সেখানে প্রথম হওয়ার। সেদিন বাড়ি ফিরে মেডিটেশন করে আমি পড়তে বসলাম এবং একঘণ্টায় আটটা প্রশ্নের উত্তর পড়ে ফেললাম।

সেদিন রাতে ঘুমানোর আগে আমি স্মার্টফোন বন্ধ করে রান্নাঘরে রেখে এলাম। মেডিটেশনে মনের ঘড়িতে ভোর পাঁচটায় এলার্ম দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি পাঁচটা বাজে! রাতে ঘুমও ভালো হলো।

কোর্সের চার দিনের আলোচনা ও মেডিটেশন আমার জীবনদর্শনে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। আমি এখন প্রত্যয়ী। চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে আমি এমনভাবে তৈরি করতে চাই–যেন আমার কথা ও আচরণে রোগীরা কষ্ট না পান। তারা যেন সুস্থ হওয়ার আশা ফিরে পান।

[মেডিকেল অফিসার, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ৪৬১ ব্যাচ]

জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি

তানভীর মোহাম্মদ সাইফ

কোয়ান্টামে আসার আগে আমার মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, অহংকার, হিংসা ছিল। এর পাশাপাশি টেনশনের কারণে আমি প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছিলাম। কোর্সের আলোচনা শুনে আমি টেনশন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমি এখানে এসেছিলাম ভালো শিক্ষার্থী হতে। কিন্তু এখন উপলব্ধি করলাম, প্রথমে আমাকে ভালো মানুষ হতে হবে। একজন ভালো মানুষ হলেই আমি ভালো শিক্ষার্থী হতে পারব।

আমার জীবনে কোনো লক্ষ্য ছিল না। জীবনে কী হতে চাই বুঝতে পারতাম না। মনছবির মেডিটেশন করে আমি আমার লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছি।

[শিক্ষার্থী, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। ৪৫২ ব্যাচ]

মেডিকেল কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এ কোর্স

ডা. এ কে এম মনিরুদ্দিন চৌধুরী

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা অপ্রতুল। একজন মানুষ কীভাবে রোগ প্রতিরোধ করবেন ও সুস্থ থাকবেন, সেই বিদ্যা আমাদের শিক্ষা-কার্যক্রমে নেই। আর এই সীমাবদ্ধতা দূর করার সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত উদ্যোগ নিয়েছে কোয়ান্টাম। কীভাবে সুস্থ থাকা যায়, কীভাবে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কীভাবে মানুষ তার পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকে দৃঢ় করবে, সুখী হবে–এ বিষয়ে এমন কার্যকর কোর্স আমি দেশে-বিদেশে কোথাও দেখি নি।

আমাদের মেডিকেল কোর্স কারিকুলামের মধ্যেও আমরা শুধু রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনা করি। প্রতিরোধের চর্চা কোথাও গড়ে ওঠে না। একজন চিকিৎসকও তাই নিজের ব্যাপারে সচেতন নন। কিন্তু এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। আর এ থেকে মুক্তির পথ হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। সুস্থতা ও প্রশান্তির জন্যে গুরুজীর এ উদ্যোগটি সত্যিই অপূর্ব, যা আমাকে আশান্বিত করেছে। গতকাল আমি অটোসাজেশন চর্চা করে ঘুমিয়েছি। সকাল থেকেই নিজেকে প্রাণবন্ত লাগছে। আমি মনে করি, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলামের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

[সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন, লিংকন ইউনিভার্সিটি কলেজ, মালয়েশিয়া। ৪৬১ ব্যাচ]

মানসিক প্রশান্তিটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি

নিশিতা আলম

অধিকাংশ মানুষই এখন স্মার্টফোনে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে চোখ ক্লান্ত হয়ে এলে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার ক্ষেত্রেও এতদিন তা-ই ছিল। ঘুমাতে ঘুমাতে আমারও রাত দুটা-তিনটা বেজে যেত। এ কোর্সের দ্বিতীয় দিন আমি রাত ১১টার সময় আমার স্মার্টফোন বন্ধ করে ঘুমিয়েছি এবং এলার্ম ছাড়াই সময়মতো ঘুম থেকে উঠেছি।

এখানে আসার আগে আমি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলাম যে, এখন থেকে আমি সবসময় প্রশান্তির ভুবনে থাকব। তৃতীয়দিন মেডিটেশন করে আমি সত্যিই প্রশান্তির ভুবনে আছি বলে মনে হয়েছে। আমার মধ্যে একটা তরতাজা অনুভূতি কাজ করছিল। চার দিন কোর্স করে আমার মধ্যে কোনো ক্লান্তি আসে নি। এমন প্রসন্ন আমি এর আগে কখনো অনুভব করি নি। এ কোর্স থেকে এই মানসিক প্রশান্তিটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করি।

[মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৬১ ব্যাচ]

নামাজে চাই হুদরিল ক্বালব, যার পূর্বশর্ত ধ্যান

মওলানা মো. শরিফুল ইসলাম

এখানে আসার আগে আমার সংশয় ছিল–কোয়ান্টাম ও ইসলাম সাংঘর্ষিক কিনা। কিন্তু গুরুজীর আলোচনা শুনে আমার সেই ধারণাটা পাল্টে গেছে। নামাজের ক্ষেত্রে আমরা সারাজীবন অনুসরণ করেছি রুকু-সেজদা, তাজবীহ-তাহলীল। মেডিটেশন করে আমি উপলব্ধি করলাম যে, নামাজের মূল বিষয়টিই হচ্ছে ধ্যান। আত্মনিমগ্ন না হলে নামাজ পরিপূর্ণ হয় না। আমরা জানি, হুদরিল ক্বালব বা একাগ্রচিত্ততা ছাড়া নামাজ কবুল হবে না। আর আমি মনে করি, এর পূর্বশর্ত হচ্ছে মেডিটেশন বা ধ্যান। কেউ যদি মনোযোগ সহকারে নামাজ পড়তে চায় তার অবশ্যই মেডিটেশন চর্চা করা উচিত।

আমি একটি মসজিদে ও ঈদের জামাতে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। হাজারো মানুষ সেই জামাতে নামাজ আদায় করেন। এখানে আসার পর সেই মানুষগুলোর প্রতি আমি এক ধরনের দায়িত্ববোধ অনুভব করলাম যে, মুসল্লিদের স্বার্থে একজন ইমামের অবশ্যই নিয়মিত ধ্যানচর্চা করা উচিত।

এ চার দিন আমার অন্যতম প্রাপ্তি হলো এলার্ম ছাড়া সময়মতো ঘুম থেকে ওঠা। তৃতীয় দিন রাতে আমি মনের বাড়িতে গিয়ে অটোসাজেশন দিয়েছি যে, চারটা বাজার দুই মিনিট আগে আমি ঘুম থেকে উঠব। ভোরবেলা চোখ খুলে দেখি ঘড়িতে ঠিক ৩:৫৮ মিনিট। আলহামদুলিল্লাহ! এমন সুন্দর টেকনিকে আমি বিস্মিত হলাম।

[শিক্ষক, তালিমুল ইসলাম মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ। ৪৬১ ব্যাচ]

সাহসী হয়েছি, রোগমুক্ত হয়েছি

হুমায়ারা আকতার

আমি একবছর ধরে শুচিবায়ু রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'ওসিডি'। আমি বার বার হাত ধুতাম। সেটা এত বেশি ছিল যে, সাত দিনে এক প্যাকেট হ্যান্ডওয়াশ শেষ হয়ে যেত। এ-ছাড়াও বাইরে থেকে বাসায় ফিরে আমি কয়েকবার গোসল করতাম। ঘরে-বাইরে তাই সবসময় আমার মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করত।

এই অস্থিরতার জন্যে আমার সাত বছরের একমাত্র সন্তানকে আমি আদর করতে পারতাম না। খেলাধুলা করে সন্তান যখনই আমার কাছে আসত, আমি রেগে যেতাম। তার সাথে দুর্ব্যবহার করতাম। বার বার তার হাত ধুয়ে দিতাম, কখনো কখনো তাকে গোসল করতে বলতাম। তাকে খাওয়ানোর আগে একই প্লেট আমি অন্তত ১০ বার পরিষ্কার করতাম।

এসব যন্ত্রণায় আপনজনদের আমি দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলাম। ফলে খুবই কষ্ট হতো আমার। আমি প্রায়ই কান্নাকাটি করতাম। ওষুধ খেয়ে শুধু ঘুমাতাম কিন্তু ওষুধ আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারে নি। আমার স্বামীও আমাকে নিয়ে খুব টেনশন করতেন।

একদিন কোয়ান্টামের একটি ভিডিওতে আমার মতো একজনের সুস্থ হওয়ার কথা শুনলাম। তাই সুস্থ হওয়ার আশায় আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসি। এখানে এসে প্রথমদিন থেকেই আমার অনেক ভালো লেগেছে। অস্থিরতা ও টেনশন অনেক কমেছে। গত তিন দিন বাসায় ফিরে আমি আমার সন্তানকে আদর করেছি। মাকে কাছে পেয়ে সে খুব খুশি। আমার স্বামী আমার এ পরিবর্তন দেখে আনন্দিত।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমি কখনো ঢাকা শহরে একা চলাফেরা করি নি। প্রথমদিন আমার স্বামী আমাকে কোর্সে নিয়ে এলেন। এরপর থেকে আমি একাই যাতায়াত করছি। কোর্সের বিভিন্ন আলোচনা শুনে আমার সাহস বেড়েছে। একা চলাচল করতে এখন আর ভয় করছে না।

[গৃহিণী। ৪৬১ ব্যাচ]

সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনযাত্রার একটি প্রতিচিত্র

ড. ইফতেখার আহমেদ খান

১০ বছর আগে থেকে আমার ভুলে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়। তাই আমি সবকিছু নোট করে রাখতাম। প্রথমদিন কোর্সে এসে আমার নির্ধারিত আসনে কোনো নোটবুক না পেয়ে আমি মনে মনে রেগে গিয়েছিলাম। এরপর দ্বিতীয় দিন মনে রাখার কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো। ভুলে যাওয়ার প্রবণতা কীভাবে কাটিয়ে উঠতে হয় তা আমার জানা ছিল না। আশা করি, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে শেখা এ টেকনিকগুলো প্রয়োগ করে আমি আমার স্মরণশক্তি বাড়াতে পারব। ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।

আমি জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই, অনেক কিছু করতে চাই। কিন্তু আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার মাধ্যম ও প্রক্রিয়া আমি এ কোর্স থেকে নিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি এখন আত্মবিশ্বাসী।

চার দিন পর আমার মনে হচ্ছে, এই কোর্সটি মানুষকে কাজের পেছনে লেগে থাকতে শেখায়। মানুষের মনে আনন্দ ও ভালো থাকার অনুভূতি বাড়াতে শেখায় এবং জীবন সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষা দেয়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সকে এক বাক্যে বলা যায়–এটা সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনযাত্রার প্রতিচিত্র।

[সহকারী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৬১ ব্যাচ]

দেহ ও মনে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারি–এ বিশ্বাসই পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে প্রথম প্রয়োজন।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমরা গত একবছর ধরে সন্তান নিতে চাচ্ছি। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন গুরুজী।*

উত্তর : ইদানীং বিয়ের পর অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রী মনে করেন, আগামী তিন-চার বছর তারা ঘুরে বেড়াবেন, নিজেদের মতো সময় কাটাবেন, ক্যারিয়ার গুছিয়ে নেবেন এবং সন্তান নেবেন না। এতে অবচেতনভাবেই তাদের ব্রেনে প্রোগ্রাম হয়ে যায় সন্তান না নেয়ার। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পরবর্তীতে তারা চাইলেও আর সন্তান নিতে পারছেন না কিংবা সন্তান হচ্ছে না। কারণ ব্রেনে তো ইতোমধ্যেই একটা অনীহা তৈরি হয়ে গেছে সন্তানের ব্যাপারে।

কিন্তু বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পরিবার গঠন। শুধু দুজনে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে বিয়ে নয়। ঘুরে বেড়াবেন কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে সন্তানসন্ততিসহ পরিবার গড়ে তোলা, প্রজন্ম গড়ে তোলা। তাই বিয়ের পর যত দ্রুত সম্ভব সন্তান নিয়ে নেবেন এবং পর পর চারটা। ১০ বছর পর আপনাকে এদের দেখাশোনা করতে হবে না। তারাই একে অন্যকে দেখে রাখবে। বড় সন্তান হবে ছোটদের লিডার। আর প্রত্যেকেই তো লিডারশিপ চায়। ওরা চার জনই যথেষ্ট–গল্প করা, খেলাধুলা এবং সেইসাথে একে অপরের দেখাশোনা করার জন্যে।

আসলে সন্তান নেয়ার ব্যাপারে এই যে অনীহা এবং পরিবার ছোট রাখার জন্যে হাজারো প্রচারণা–এর সবই হলো একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অংশ। ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সে-দেশের প্রেসিডেন্টকে যে মেমোরেন্ডাম দিয়েছিল, তার মূল বিষয়টিই ছিল–বিশ্বের যেসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে জনসংখ্যা কমানোর জন্যে কী কী নীতি অবলম্বন করা উচিত তার বিস্তারিত বিবরণ।

চীন ভারত তুরস্ক ইন্দোনেশিয়াসহ ১৩টি দেশের ব্যাপারে তারা একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। তারা দেখল, এদের জনসংখ্যা যদি বেড়ে যায়, বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ অপপরিকল্পনার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল–তোমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা জনসংখ্যা। এটা কমাও। 'ওয়ান চাইল্ড পলিসি' করো। তোমাদের তো এমনিতেই অনেক মানুষ। 'এক সন্তান নীতি' চালু করলে তোমরা লাভবান হবে।

চীন এত বছর পর বুঝতে পেরেছে এই নীতি ছিল জাতির জন্যে একটি ভুল সিদ্ধান্ত, যা চীনকে সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। বর্তমানে চীন এই সর্বনাশা নীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে। কারণ এই ভ্রান্ত নীতির ফলে বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি মিলে ওদের একটি বৃহত্তর পরিবারের ছয় জন মানুষের পরবর্তী বংশধর হচ্ছে মাত্র একজন! অথচ একসময় চীনের বড় শক্তি ছিল তাদের পরিবার, যা আজ শেষ হয়ে গেছে। ফলে সামাজিক অস্থিরতাও ঢুকে পড়েছে তাদের জীবনে। একটি সন্তান তো কখনোই ছয় জনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

আর চীনে যেহেতু প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছে, যখনই বোঝা গেছে গর্ভস্থ সন্তান মেয়ে, তখন তারা ভ্রূণহত্যা করেছে। নরহত্যার সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। এর শাস্তি তো পেতে হবে। আবার কন্যাশিশুর ভ্রূণহত্যার ফলে সমাজে নারী-পুরুষের সংখ্যায়ও তৈরি হয়েছে ভারসাম্যহীনতা।

যুক্তরাষ্ট্র খুব ভালোভাবে জানত, জনসংখ্যা হচ্ছে সম্পদ এবং একটি জাতির সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার প্রাথমিক ভিত্তি। তাদের বহু বছরের গবেষণায় তারা ঠিকই বুঝেছিল–সেই দেশগুলোই হয়ে উঠবে আগামীর পরাশক্তি–যেখানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যারা এটিকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবে। নতুন একটি গবেষণা রিপোর্টে তারা প্রশ্ন তুলছে–উন্নয়নের জন্যে জনসংখ্যাই কি নিয়তি? (*দ্য ইকনোমিস্ট*, ১৭ এপ্রিল ২০১৯)

গত এক যুগ ধরে আমাদের দেশে স্লোগান ছিল–'দুই সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।' সম্প্রতি আমাদের সরকার নীতিগতভাবে তার অবস্থান বদলেছেন। এখন নতুন স্লোগান হচ্ছে, ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট। 'একটি হলে ভালো হয়'–অন্তত এই নীতি থেকে সরে এসেছেন বলে আমরা সরকারকে অভিনন্দন জানাই। একটি ভালো সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন। আর জনসংখ্যা বাড়ানোর কথা আমরা বলে আসছি গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে। আমরা এখন সেইদিনের প্রত্যাশায় যেদিন সরকারিভাবে বলা হবে–'চারের কম নয়, বেশি হলে ভালো হয়।'

মনে রাখবেন, যারা এদেশের জনসংখ্যা কমাতে চায়, তারা আমাদের বন্ধু নয়। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকদের এজেন্ট। একথা বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কারণ আমরা জাতির কল্যাণে ও আমাদের জাতিসত্তার বিকাশের জন্যেই কথাগুলো বলছি। তাই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে কেউ পড়বেন না। আসলে জনসংখ্যাই হচ্ছে শক্তি–পরিবারের জন্যে, জাতির জন্যে এবং দেশের জন্যে।

আরেকটি বিষয়–কোনো কারণে স্বাভাবিকভাবে যদি সন্তান না আসে, বুঝবেন যে, টেস্টটিউবে কোনো কল্যাণ নেই। টেস্টটিউব বেবি নিতে যাওয়াটা অর্থহীন। এখন আপনারা নিজেদের জন্যে নিয়মিত হিলিং করবেন, সুস্থ সন্তানের মনছবি করবেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। সেইসাথে সন্তানকে সবসময় প্রত্যাশিত মনে করবেন। আমরা আপনাদের জন্যে দোয়া করি।

প্রশ্ন : *আমার দেবর কয়েক বছর আগে মারা যায়। এরপর আমরা তার স্ত্রী ও মেয়ের ব্যয় বহন করতাম। এখন দেবরের স্ত্রী বিয়ে করেছে। মেয়েটার বয়স ১৭ বছর। মেয়েকে আমার কাছে থাকতে বলেছি, কিন্তু মেয়ে তার মায়ের কাছে থাকতে চায়। তাই এখন আমরা আর মেয়ের খরচ দিচ্ছি না। এটা কি ভুল হচ্ছে?*

উত্তর : অবশ্যই ভুল হচ্ছে। যেহেতু মেয়ের মা বিয়ে করেছে, তার ব্যাপারে আপনাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। তার ভরণপোষণের দায়িত্ব এখন তার নতুন স্বামীর। আর এটা তো ঠিক যে, মেয়েকে নিজের কাছে রাখার ব্যাপারে মায়ের অধিকার সবচেয়ে বেশি। কারণ মায়ের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা ও মমতা তাকে কেউ দিতে পারবে না। মেয়ে তার মায়ের সাথে থাকতে চাইবে, এটাও স্বাভাবিক।

এখন আপনাদের জন্যে মানবিক হবে–যদি মেয়েটির ভরণপোষণ আগে যেভাবে করতেন এখনো সেভাবেই করেন। যতদিন পর্যন্ত সে স্বাবলম্বী না হচ্ছে কিংবা বিয়ে না করছে ততদিন পর্যন্ত এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। আপনি এতদিন ভরণপোষণ করতেন মানে আল্লাহ আপনাকে সেটা করার সামর্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে একজনের রিজিক দেন কেউ বলতে পারে না।

লামাতে যখন আমরা কোয়ান্টামের কার্যক্রম শুরু করি, আমাদের সবকিছুই ছিল স্বল্প পরিসরে। তারপরও আমরা বলেছিলাম, কেউ কোয়ান্টামমে এলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় যেন ফিরে না যায়। কারণ লামার দুর্গম দীর্ঘপথে কোথাও সে খাবারের দোকান পাবে না। একজন কর্মীর প্রশ্ন ছিল–কত লোককে খাওয়াব? আমাদের বক্তব্য ছিল, যত লোক আসে ততজনকে খাওয়াবেন। কারণ সে তার রিজিক নিয়ে এসেছে। তাকে না খাওয়ালে আমাদের অকল্যাণ হবে।

আসলে কারো জন্যে কিছু করতে পারাটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের। তাই সবসময় চিন্তা করবেন অন্যের জন্যে কতটা করতে পারলাম, কতটা দিতে পারলাম। কতটা নিতে পারলাম, তা নয়। কারণ যত তৃপ্তি সব দেয়ার মধ্যেই।

অতএব যে মেয়েটিকে এতদিন লালন করেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এখন আপনি কেন তা করবেন না? এতিমের মাথায় হাত রাখার সুযোগ থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করবেন? সে মায়ের সাথে থাকলেও তার খরচ আপনাদের বহন করা উচিত।

প্রশ্ন : *আমি জীবনে দুটো গুরুতর পাপ করেছি। আমি জানি, শিরকের অপরাধ ব্যতীত যে-কোনো অপরাধের জন্যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আমি তো শিরক করি নি, কিন্তু যে পাপ করেছি তার জন্যে তওবা করব কীভাবে? কীভাবে আমার তওবা কবুল হতে পারে?*

উত্তর : প্রথমত, যে ভুল আপনি করেছেন সেটার পুনরাবৃত্তি না করা। কারণ তওবা মানেই হচ্ছে, আমি এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করব না। এটাই হচ্ছে আসলে তওবা। দ্বিতীয়ত, যে-কোনো পাপ তিনি ক্ষমা করতে পারেন, সেই এখতিয়ার তাঁর রয়েছে।

তাই ভুলের জন্যে অন্তর খুলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কারণ তাঁর দয়া ও ক্ষমা নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ কারো নেই। আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, এটা বলার অধিকারও কারো নেই। আল্লাহ যে-কাউকে ক্ষমা করতে পারেন। অতএব আমরা যে ভুলই করি–তাঁর ক্ষমা সম্পর্কে যেন কখনো নিরাশ না হই।

এ মাসের অটোসাজেশন

সেবার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা থেকে আমি বিরত থাকব। যখন যার প্রয়োজন তার সেবা করব।

আগস্ট মাসব্যাপী স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও সকল শহিদের স্মরণে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের সকল শহিদের স্মরণে আগস্ট মাসব্যাপী রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এসব ব্লাড ক্যাম্পে এবং এর পাশাপাশি কোয়ান্টাম ল্যাবেও রক্তদান করেছেন দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঢাকায় জনতা ব্যাংক ভবন চত্বরে রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ. টি. ইমাম। আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জামালউদ্দিন আহমেদ এফসিএ। রক্তদান করেন ২৬ জন। ২৭ আগস্ট

নরসিংদীর স্যামসাং ফ্যাক্টরিতে রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ও নরসিংদীর জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন। এ ক্যাম্পে রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানটির ৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। ৩ আগস্ট

ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত সেনাকল্যাণ ভবনে বেসিক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম। এদিন শহিদদের স্মরণে রক্তদান করেন ১৩০ জন। ৭ আগস্ট

এ-ছাড়াও ২১ আগস্ট রূপালী ব্যাংকের দিলকুশা শাখায়, ২২ আগস্ট যুব অধিদপ্তরে, ২৪ আগস্ট উত্তরা কল্যাণ সমিতিতে, ২৫ আগস্ট সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে সহযোগিতা করেছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

আপনার এলাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬
blood.quantummethod.org.bd

সুপ্রীম কোর্টে সুস্বাস্থ্য-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার

বৈজ্ঞানিক সেমিনারে অংশ নেয়া আইনজীবীদের একাংশ

২২ আগস্ট সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে *বিনা ওষুধে ডায়াবেটিস নিরাময় ও প্রতিরোধের কার্যকর উপায়* শীর্ষক সেমিনার আয়োজিত হয়। এতে মোট ২৫০ জন আইনজীবী অংশ নেন। আলোচনা করেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান।

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার

চট্টগ্রাম :

- ☐ ২৪ জুলাই ও ২ আগস্ট পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে চারটি সেশনে মোট ৩১২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ৩১ জুলাই আব্দুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে দুটি সেশনে মোট ১৩৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

বগুড়া :

- ☐ ২৫ জুলাই ভবানীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণির ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ১ আগস্ট শিবগঞ্জ সরকারি এম এইচ কলেজের সেমিনারে ৩০০ জন এবং চৌধুরী আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজে ২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ৩ আগস্ট শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ নেয় ৬০ জন শিক্ষার্থী।

দানের বরকতে সমৃদ্ধ হোক আপনার পরিবার

ভ্রান্ত ধারণাই দানে অনীহার কারণ

ভোগবাদ ও পুঁজিবাদ নানান আঙ্গিকে মানুষকে মানবিকতা ও সত্যের পথ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। পুঁজিপতিদের মূল লক্ষ্য–একজন মানুষের মধ্যে সম্পদ-আসক্তি সৃষ্টি করা, যাতে আমৃত্যু সে ধনসম্পদ কীভাবে বাড়ানো যায় সেই প্রচেষ্টায় মোহাচ্ছন্ন থাকে।

একটি শিশু জন্মগ্রহণ করার পর থেকে স্বাভাবিকভাবে সে ভালো কিছুই চিন্তা করে বা করতে চায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মনে করে, ভালো কাজ করতে হলে তার প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকতে হবে। সে ভাবে, যেদিন আমার অনেক অর্থ হবে সেদিন আমি ভালো কাজগুলো করতে পারব–স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম, মানুষের সেবা ইত্যাদি। জীবনের শুরুতে একজন কিশোর বা তরুণের শুভচিন্তাটিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু যত দিন যায়, বেশি ধনসম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা তার কখনো পূরণ হয় না। সে তৃপ্ত হতে পারে না।

যে তরুণটি বিপথে যায় নি বা সমাজের চোখে যে খুব ভালোভাবেই বেড়ে উঠছে, এমন একজন তরুণের কথাই ধরা যাক। সে পড়াশোনা শেষে উপার্জন শুরু করে। একসময় সংসার হয়, তাদের ঘরে সন্তানসন্ততি আসে এবং ধনসম্পত্তির প্রতি তাদের মোহ আরো বাড়াতে থাকে। আজীবন এর মধ্যেই তার চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। একবার যদি এই সম্পত্তির নেশা কাউকে পেয়ে বসে, যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে সে তখন এর পেছনেই ছুটতে থাকে।

যুগে যুগে বিলাসিতা ও অর্থের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষগুলো ধনসম্পত্তিকেই তাদের নিরাপত্তার ধারক মনে করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, *(দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে) যে (কৃপণের মতো) অর্থ জমায় আর বার বার তা গণনা করে এবং একে নিজের রক্ষাকবচ মনে করে। [সূরা হুমাজাহ : ২]*

অর্থাৎ শুধু নিজের চিন্তা করতে করতে সে আর অন্যের জন্যে খরচ করতে পারে না। যখন হয়তো খরচ করার সময় পেল, দেখা যায়, তার সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই বয়স যা-ই হোক, একজন মানুষকে দানের অভ্যাসটা শুরু করতে হবে তার যা আছে তা থেকে সাধ্যমতো দান করে। তাহলেই ভালো কিছু করার চিন্তাটি বাস্তবায়ন হবে।

আর এই দানের অভ্যাসে দাতার জীবনেও আসবে প্রশান্তি ও সাফল্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, *...(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না। [সূরা বাকারা : ২৭২]*

কোয়ান্টামে দানের অর্থে পরিচালিত হয় সৃষ্টির সেবামূলক কার্যক্রম

দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার লক্ষ্যে দু-যুগ আগে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করে সৃষ্টির সেবামূলক কার্যক্রম। পরবর্তীতে তা বিস্তৃত হয়েছে দেশের দুর্গম অঞ্চল বান্দরবান লামায়, যেখানে বেড়ে উঠেছে দুই সহস্রাধিক শিশুর আবাসিক শিক্ষালয়–কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। পরিচালিত হচ্ছে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, মাতৃমঙ্গল কার্যক্রম, অসহায় প্রবীণদের জন্যে আশ্রয়মম, খতনা কার্যক্রম, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, জাতীয় দুর্যোগে ত্রাণ ও বস্ত্রবিতরণ, দুর্যোগ পরবর্তী গৃহনির্মাণ, বেওয়ারিশ লাশের জন্যে মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানাতে দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

সেবামূলক এ কাজগুলোর প্রতিটিই পরিচালিত হয় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে। তারা দিন শুরু করেন দান করে। প্রত্যেকে সাধ্যমতো দানের অর্থ রাখেন কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে। মাস শেষে বা ব্যাংকটি পূর্ণ হলে তারা ফাউন্ডেশনে জমা দিয়ে পুনরায় একটি ব্যাংক সংগ্রহ করেন। ব্যাংকগুলো বিতরণ ও সংগ্রহের কাজ করেন একদল নিবেদিতপ্রাণ কোয়ান্টিয়ার (কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবক)। সারাবছর সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলতে থাকে এ কাজটি।

দান করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, আপনার দানের অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে তা জানুন

একজন দাতা যদি মনে করেন, দান করা পর্যন্তই তার দায়িত্ব, এই অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে এটা বিবেচ্য নয়, তাহলে তিনি ভুল করবেন। কারণ দান করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। গ্রহীতা সেটা দিয়ে ভালো কাজ করলে দাতার জন্যেও তা কল্যাণকর, এটা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। আর গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে মন্দ কাজ করলে সেটার দায়িত্বও দাতার ওপর বর্তায়।

কেউ হয়তো ভিক্ষুককে নিয়মিত ভিক্ষা দেন। কিন্তু আমাদের সমাজে অধিকাংশ ভিক্ষুক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষা করছে। এসব খবর প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়। তাদের অভিনয়ের ধোঁকায় পড়ে সহজেই মানুষ ভিক্ষা দেন। কিন্তু পেশাদার এই ভিক্ষুকেরা দানের অর্থে মাদক-জুয়াসহ বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত থাকে।

একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া মানে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তিকেই উৎসাহিত করা। আজীবন সে ভিক্ষুকই থেকে যায়। অথচ নবীজী (স) ভিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন।

কোয়ান্টামে দানের রয়েছে হিসাবের স্বচ্ছতা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে যখনই কোনো মাটির ব্যাংক জমা হয়, ব্যাংকটির অর্থ হিসাব করে দাতাকে দেয়া হয় মানি রিসিট এবং দাতার মোবাইল নম্বরে দানের পরিমাণটা এসএমএস করা হয়। তাই ফাউন্ডেশনের

আপনার চারপাশের ৪০ ঘরে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকসহ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত এ ব্রোশিওরটি বিতরণ করুন। সঙ্ঘবদ্ধ দানে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিজেও আন্তরিকভাবে দান করুন নিয়মিত, সাধ্যমতো।

রয়েছে জমাকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংকের হিসাব। সারাবছর ফাউন্ডেশনের কোন সেবাখাতে কত ব্যয় হলো এর স্বচ্ছতাও বজায় রাখা হয়। এসব কারণেই দানের ক্ষেত্রে একজন সচেতন মানুষের প্রথম পছন্দ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

সঙ্ঘবদ্ধ দানেই ঘটবে সমাজের পরিবর্তন অবহেলিতরা পাবে মর্যাদা

দেশ ও সমাজের উপকার তখনই সম্ভব হবে যখন সাধারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতা বাদ দিয়ে অন্যের জন্যে চিন্তা করবে। এই চিন্তাটা যে-কোনো দানের মাধ্যমে শুরু হতে পারে এবং অবশ্যই তা সঙ্ঘবদ্ধভাবে করতে হবে। কারণ একজন গ্রহীতাকে কিছু অর্থ দিয়ে সাময়িক উপকার করা যেতে পারে, কিন্তু এতে তার সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই এটি করতে হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

পৃথিবীতে যখনই কোনো সভ্যতায় মানবিক উত্থান ঘটেছে, এর নেপথ্যে ছিলেন সমাজের কিছু মানুষ, যারা কল্যাণচিন্তায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে কাজ করেছেন। বর্তমান সময়ে ঠিক তেমনি একটি উদ্যোগ হলো কোয়ান্টামের সঙ্ঘবদ্ধ দান। আমাদের সমাজে সকল মানুষের কল্যাণ এবং অবহেলিতদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে এ দানের বিকল্প নেই।

তাই আপনিও এগিয়ে আসুন। সাধ্যমতো দান করুন। আর পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্যে আলাদা মাটির ব্যাংক রাখুন। এতে আপনার শিশুর মধ্যেও দাতা হওয়ার মনোভাব তৈরি হবে। সঙ্ঘবদ্ধ দানের শুভ বার্তাটি ছড়িয়ে দিন আপনার চারপাশে। অনুভব করুন স্রষ্টার রহমত, দানের বরকত।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : সেপ্টেম্বর ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

অক্টোবর ২০১৯

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চালু হোক এ কোর্স

অধ্যাপক ড. মো. বজলুর রহমান মোল্যা

আজকের তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু তাদের অনেকেই আজ ফেসবুক ও নানা কারণে দিকভ্রান্ত, উদ্যমহীন। শিক্ষকরাও নানা মতাদর্শে বিভক্ত বলে ছাত্ররা তাদের আদর্শ মনে করছে না। তাই আমার অনুরোধ–কোয়ান্টামের এ কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চালু করা হোক। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।

আমি আমার মেয়েকে সাথে নিয়ে এ কোর্সে এসেছি। যদিও কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয় বহু আগে। ১৯৯৬ সালে রাজশাহীর একটি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে খুব অল্প টাকায় আমি *সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড* বইটি কিনেছিলাম। বইটি এখনো আছে আমার কাছে। সে-সময় আমি কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। বই পড়ে আমি শিথিলায়নের অনুশীলন শুরু করি। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি–শিথিলায়ন যত ভালো হবে, একজন মানুষ জীবনে তত সফল হবেন।

পরের বছরই আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ক্লাস শুরুর দুমাস পরে গিয়ে ভর্তি হলেও পরবর্তী সবগুলো পরীক্ষায় আমি রেকর্ড পরিমাণ নম্বর নিয়ে প্রথম হই। অথচ এর আগে আমি কখনো পরীক্ষায় প্রথম হই নি। এরপর বৃত্তি নিয়ে বিদেশে পিএইচডি করেছি। গবেষক হতে চেয়েছিলাম, হয়েছি। আমার গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত জার্নালগুলোতে। আমি যা চেয়েছিলাম, সবই পেয়েছি। এসব অর্জনের নেপথ্যে কোয়ান্টাম চর্চার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তাই কোর্সের এ চার দিন গুরুজীর প্রতিটা কথার সাথে আমি একাত্মতা অনুভব করেছি।

[বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং ইলিশ ও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের পূর্ণাঙ্গ জিনোম উন্মোচনকারী দলের অন্যতম গবেষক ড. মো. বজলুর রহমান মোল্যা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৬২ ব্যাচের প্রত্যয়নে একথা বলেন।]

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ডের অভিশাপ থেকে বাঁচুন

ঋণ একটি অভিশাপ–হোক তা ব্যক্তির জীবনে বা জাতির জীবনে। হাজার বছর ধরে মানুষকে দাসে পরিণত করে রাখার জন্যে শোষকদের অব্যর্থ হাতিয়ার ছিল এই ঋণ। কারণ ঋণ ও কিস্তির চাপ মানুষকে হয় দাসে পরিণত করে, নয়তো সে হয়ে ওঠে দুর্বৃত্ত। এজন্যেই নবীজী (স) সবসময় ঋণ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছেন। এর পাশাপাশি এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের আরেকটি সুচতুর ফাঁদ হলো ক্রেডিট কার্ড। যা বাকিতে কেনার অভ্যাস করিয়ে একজন মানুষকে দীর্ঘমেয়াদে ঋণগ্রস্ত করে তোলারই একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। তাই সচেতন হোন। ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ডের গজব থেকে নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার পরিবারকে।

> ঋণগ্রস্ত জীবন দাসের জীবন। বলা যায়, আজ দেশের একশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে সর্বগ্রাসী নৈতিক অধঃপতন– তার অন্যতম মূল কারণ হলো এই ঋণ, বিশেষত ক্ষুদ্রঋণ।

গত ২৮ আগস্ট কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টারদের নিয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। ঋণ ও এর বহুমুখী অপপ্রভাব নিয়ে তথ্যপ্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

গুরুজী বলেন, নবীজীর (স) একটি প্রার্থনা ছিল–আউযুবিল্লাহি মিনাল কুফরি ওয়াদ্দাইন। যার মর্মার্থ হলো, 'আমি কুফর (সত্য অস্বীকার) ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি' (*আবু সাঈদ খুদরী, নিসাঈ শরীফ*)। অর্থাৎ সত্য অস্বীকার করে কাফের হওয়া আর ঋণগ্রস্ত হওয়াকে নবীজী (স) একইরকম পাপ বলে গণ্য করেছেন।

সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মেও ঋণকে একটি জঘন্য পাপাচার রূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং ঋণ যে মানুষের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে, সেটা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

গুরুজী আরো বলেন, ঋণ সর্বযুগেই ব্যবহৃত হয়েছে একজন মানুষ কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়ে রাখার ফাঁদ হিসেবে। ঋণ মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। ধ্বংস করে তার নৈতিক চরিত্র ও দৃঢ়তাকে। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে দেখা যায়–প্রতিটি জাতি পতনের আগে ঋণ জর্জরিত ছিল। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে পরিবারে একবার ঋণ ঢোকে, সে পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

অতিসম্প্রতি আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে এই ঋণ আগ্রাসন। পশ্চিমা ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে এখন নেমেছে আমাদেরকে ঋণদাসে পরিণত করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত নিয়ে–যার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ক্রেডিট কার্ড। অর্থাৎ আপনি যেন উপার্জন করার আগেই ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং একসময় নিজের শান্তি, সম্মান, নৈতিকতা ও মনোদৈহিক সুস্থতা হারিয়ে বসেন। কারণ ঋণগ্রস্ত জীবন দাসের জীবন। বলা যায়, আজ দেশের একশ্রেণির মানুষের মধ্যে যে সর্বগ্রাসী নৈতিক অধঃপতন–তার অন্যতম মূল কারণ হলো ঋণ, বিশেষত ক্ষুদ্রঋণ। এ কথাই আমরা বলে আসছি গত দুযুগ ধরে।

অতএব সুদযুক্ত সব ধরনের ঋণ নেয়া এবং সেইসাথে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার, ক্রেডিট কার্ডের কো-হোল্ডার ও গ্যারান্টার হওয়া থেকে পুরোপুরি বিরত থাকুন।

সচেতন হোন

চিনি স্বাদে মিষ্টি কিন্তু বিষ

চিনির আরেক নাম হোয়াইট পয়জন বা সাদা বিষ। অতিরিক্ত চিনি গ্রহণের ফলে বিশ্বজুড়ে বাড়ছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি। শুরু থেকেই কোয়ান্টাম পরিবার এ ব্যাপারে সচেতন। চিনি বর্জনের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেলে চা পানে এখন আর চিনির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না।

আপনিও সচেতন হোন। চিনি পরিহার করুন। যে-কোনো সাফল্য উদযাপন ও অতিথি আপ্যায়নে মিষ্টির পরিবর্তে পরিবেশন করুন খেজুর ও দেশি ফল।

জানুন স্বাস্থ্যঘাতী চিনির কুফল :

- ভাত রুটি ফলমূল সবজি–এসবে রয়েছে শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় চিনি। এ খাবারগুলো হজম প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত হয়, যা থেকে আমরা শক্তি পাই। কিন্তু সাদা চিনি হলো সুক্রোজ, যা গ্লুকোজে পরিণত না হয়ে সরাসরি রক্তে মিশে যায়। মানবদেহের মেটাবলিক সিস্টেম প্রক্রিয়াজাত চিনি (রিফাইন্ড সুগার) গ্রহণের অনুকূল নয়, বরং চর্বি (ট্রাইগ্লিসারাইড) হিসেবে শরীরে জমতে থাকে এই চিনি।
- যত চিনি খাবেন তত বাড়বে হৃদরোগের ঝুঁকি–একথা বলেছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ফ্রাঙ্ক হো। অতিরিক্ত চিনি গ্রহণে ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ে। বিশেষ করে ব্রেস্ট ও কোলন ক্যান্সার।
- বয়সের তুলনায় বুড়ো দেখায়। ত্বকে ভাঁজ পড়ে, ব্রণ হয়।
- ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, দাঁত-ক্ষয় ও শরীরে ইউরিক এসিড বৃদ্ধির অন্যতম কারণ চিনি।
- নিকোটিনের মতোই আসক্তিকর। চিনি গ্রহণে ব্রেনে ডোপামিন ও ওপিএম হ্রাস পায়, ফলে অবসাদ ও বিষণ্নতা এসে ভর করে।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং, দ্য ডায়াবেটিস কাউন্সিল ডটকম

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৩ তম কোর্স

১১, ১২, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

৪৬৪ তম কোর্স

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

কর্মই মানুষকে উজ্জীবিত রাখে

বাবু সুকুমার চক্রবর্তী

ব্যাংকিং এন্ড ট্রেনিং কনসালটেন্ট বাবু সুকুমার চক্রবর্তী। ১৯৯৭ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেন। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ছিল তার ৮৫ তম জন্মদিন। সেদিন কোয়ান্টাম পরিবারের বর্ষীয়ান এই সদস্য প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন মুক্ত আলোচনার ৯২ তম আয়োজনে। 'কর্মব্যস্ত সুখী জীবন' বিষয়ে সেখানে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

২৫ বছর আগের কথা। তখন আমি বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রজেক্টে ন্যাশনাল ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি। সে-সময় একদিন আমার হার্ট অ্যাটাক হলো। কলকাতার বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে ডা. দেবী শেঠী আমার বাইপাস অপারেশন করলেন। কিন্তু সুস্থ হলাম না, বরং দিন দিন স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছিল। ৭১ থেকে আমার ওজন কমে হলো ৬০ কেজি।

আবার গেলাম ফলো-আপের জন্যে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'আপনার হার্ট তো ঠিক আছে। কিন্তু অসুখটা আপনার মনে গেঁথে গেছে। তাই শুধু ওষুধে কাজ হবে না। আপনি মেডিটেশন করুন।'

নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের কার্যকারিতা তখনো আমার জানা ছিল না। আর মেডিটেশন শিখবই-বা কোথায়? ডাক্তার বললেন, 'ঢাকায় শান্তিনগরে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে মেডিটেশন শিখতে পারেন।' আমি অবাক! শান্তিনগরের সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে আমি ১০ বছর অধ্যক্ষ ছিলাম, কিন্তু ওখানে মেডিটেশন কোথায় শেখানো হয়? ডাক্তার বললেন, 'সেখানে মহাজাতক নামে একজন আছেন, তিনিই মেডিটেশন প্রশিক্ষণ দেন।' কিন্তু গুরুজী মহাজাতককে তখনো আমি এস্ট্রলজার হিসেবেই চিনতাম।

দেশে ফিরে প্রথমেই গুরুজীর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। বললেন, 'সুকুমার বাবু! কী হয়েছে আপনার? রাজপুত্রের মতো চেহারার এ কী হাল?' তাকে সব খুলে বললাম। পরের মাসেই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে বললেন তিনি আমাকে। আমি বললাম, 'দিনে ১০ ঘণ্টা করে এই কোর্স, আমি তো এতক্ষণ বসতে পারব না! দুঘণ্টার বেশি কোথাও বসার মতো শারীরিক অবস্থা আমার নেই। খুব অস্থির লাগে। মনে হয় এখনই মারা যাব।'

গুরুজী আমাকে আশ্বস্ত করলেন, 'কোনো অসুবিধা নেই। বসতে না পারলে আপনার জন্যে শোয়ার ব্যবস্থা রাখব। তবুও আপনি আসুন। মেডিটেশন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন।' তার সেদিনের আন্তরিক কথাগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছিল, যা এখনো মনে পড়ে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৬৯ তম ব্যাচে অংশ নিলাম। মেডিটেশন করলাম। মনে সাহস পেলাম। আমি বসেই কোর্স করেছিলাম, শুতে হয় নি। আর বাইপাস অপারেশনের পর থেকেই আমার ভেতরে সবসময় এক ধরনের ভীতি কাজ করত। মনে হতো, আর সুস্থ হবো না। কিন্তু মেডিটেশন চর্চার পর থেকে এখন পর্যন্ত রোগ-শোক নিয়ে আমি আর ভয় পাই না।

কোর্স করার ২৩ বছর হলো। এখনো আমি মেডিটেশন চর্চা করি। নিয়মিত বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করি। তৈলাক্ত খাবার একদম বর্জন করেছি, নিমন্ত্রণে গেলেও আমি ওসব খাবার খাই না। এই বয়সে এসে দেখি–আমার বন্ধুদের অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, আর যারা আছেন তারা মনের দিক থেকে একদম বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু স্রষ্টার কৃপায় আমি প্রাণবন্ত আছি। এর অন্যতম কারণ আমার সুস্থ জীবনাচার।

আমি সবসময় আনন্দে থাকার চেষ্টা করি। তাই তো আমি সুযোগ পেলেই সত্যজিৎ রায়ের গানটি গাই–*আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...*। কখনো মন খারাপ হলে বলি–আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ! এই শব্দটির একটি ইতিবাচক শক্তি আছে। দুঃখকে সে নিমেষেই ভুলিয়ে দেয়।

আমার অপারেশনের পর ডা. দেবী শেঠী সুস্থতার জন্যে আমাকে আনন্দে থাকার কথা বলেছিলেন। সনাতন ধর্মে বলা হয়, *ওম শান্তি*! এই 'শান্তি' শব্দটিরও আলাদা একটি শক্তি রয়েছে। এর উচ্চারণেও দুঃখ-বেদনা চলে যায়। আনন্দ আর শান্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই আনন্দের গান আমার বরাবরই খুব প্রিয়। শুদ্ধ সঙ্গীতের মাঝে আমি প্রভুকে খুঁজে পাই। তাঁর করুণাকে অনুভব করি। বিশেষত এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি যখন শুনি–*আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ॥/ মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে...*।

এ ধরনের গানগুলো মানুষকে প্রশান্ত করে। এখানে সত্যসুন্দর বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। তিনি পরমানন্দময়। তাঁর বন্দনা করলে আমরা শান্তিতে থাকি, নির্ভয়ে থাকি। বর্তমানে মিউজিক থেরাপি নামে বেশ কিছু চিকিৎসা বের হয়েছে। শুদ্ধ সঙ্গীতের মূর্ছনায় রোগীরা আরোগ্য লাভ করছে, সংবাদপত্রে এরকম অনেক প্রতিবেদন আমরা দেখতে পাই।

সঙ্গীত মানুষকে কতটা প্রশান্ত করতে পারে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন তার প্রমাণ। সম্রাটের যখন মন খারাপ থাকত বা অস্থির থাকতেন তখন তানসেন তার সুরের শক্তিতে সম্রাটকে প্রশান্ত করে তুলতেন। কথিত আছে, তানসেনের রাগ মেঘমল্লারের ঝংকারে বৃষ্টি নামত।

বই পড়ার মাঝেও আমি আনন্দ খুঁজে পাই। জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ তার 'অমরত্ব' নিবন্ধে বলেছেন, জীবন আমাদের কাছে কতটা প্রিয়। দীর্ঘ আয়ু লাভের পরও মানুষ আরো বহুদিন বেঁচে থাকতে চায়। মরতে চায় না। পৃথিবীর বড় বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও মরতে চায় নি। অমৃতের সন্ধানে তারা অনেক অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেছে। কিন্তু মৃত্যুর কোনো ওষুধ কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি। তাই বেঁচে থাকাটা আনন্দময় হওয়া প্রয়োজন।

এই বাংলায় দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তিনি ১৬০ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি প্রায়ই গোমুখাসনে বসে থাকতেন। এটি এমন একটি যোগাসন যেখানে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয়। আর মেরুদণ্ড সোজা মানে তারুণ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করা। আমিও আসনটি নিয়মিত চর্চা করি। যোগচর্চা এবং মেডিটেশনই পারে তারুণ্যকে ধরে রাখতে।

আর কেউ যদি সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে চায়, অবশ্যই তার ঘুম ভালো হতে হবে। আমি এখন পর্যন্ত কোনো ঘুমের ওষুধ খাই না। রাতে ঘুমানোর আগে আমি একটি অটোসাজেশন চর্চা করি–Live Long, Happy Strong, Grow Young. কোয়ান্টাম মেথড বই থেকে এটি শিখেছিলাম। আর সারাদিনে 'আমি ভালো আছি' অটোসাজেশনটি বলি ২০/২৫ বার।

বর্তমানে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রজেক্টের ন্যাশনাল ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এখনো টানা দুঘণ্টা ক্লাস নিই। সবমিলিয়ে আমি যাপন করছি কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।

আমাদের তরুণদের উদ্দেশ্যে বলি–তোমরা সময়কে শ্রদ্ধা করতে শেখো। সময়কে কখনো বৃথা যেতে দেবে না। ধরা যাক, একজন তরুণ ২৭ বছর বয়সে পেশাজীবনে প্রবেশ করে ৫৯ বছর বয়সে অবসরে গেল। মাঝখানের এই ৩২ বছরে তার লক্ষ্য হওয়া উচিত–পেশায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাওয়া। কিন্তু সে যদি তার সময়কে ভালো কাজে ব্যয় না করে তাহলে পেশা কিংবা ব্যক্তিজীবনের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সে কখনো পৌঁছতে পারবে না।

তাই আমার কথা হলো, তোমাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড ঠিকমতো পর্যালোচনা করলে দেখবে–দিনের অনেকটা সময় কিন্তু অপচয় হয়ে যায়। বিশেষ করে কেউ যদি ইডিয়ট বক্স অর্থাৎ টেলিভিশন বা স্ক্রিনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। এ সময়টা তুমি জ্ঞানচর্চা করো, কাজ করো। মনে রেখো–কর্মই মানুষকে উজ্জীবিত করে আর অকর্ম করে সর্বনাশ।

সাবধান! ঋণদাস হবেন না

দৃশ্যপট ১ : কয়েকজন তরুণ মিলে মুরগির খামার করল। ব্যবসা ভালোই চলছিল। পরিচিত একজন উদ্বুদ্ধ করল ব্যাংক থেকে ব্যবসা খাতে ঋণ (সিসি লোন) নিতে। ঋণের টাকায় খামার আরো বড় হলো। কিন্তু আকস্মিক বার্ড ফ্লুর আক্রমণে ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলো ভীষণভাবে। অন্যদিকে কিস্তি পরিশোধের চাপ। সময়মতো কিস্তি শোধ করতে না পারায় আসতে থাকল ব্যাংকের চিঠি, উকিল নোটিশ। এ বিপদ থেকে মুক্তি পেতে তারা খামারের জমি সস্তা দামে বিক্রি করে দিল। এখানেই শেষ নয়, ঋণের বাকি অংশ শোধ করতে প্রত্যেকে দেউলিয়া হয়ে গেল।

দৃশ্যপট ২ : বিয়ে উপলক্ষে মোটা অঙ্কের ঋণ নেয় এক ব্যাংকার। দ্রুত ঋণশোধের আশায় বিয়ের খরচের পর বাকি টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। কিন্তু শেয়ার ব্যবসায় ধস নামার পর আরো ঋণের জন্যে দ্বারস্থ হয় অন্য ব্যাংকের। সেই ঋণের কিস্তি চালাতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের কাছে একের পর এক দেনায় জড়িয়ে পড়ল। এদিকে সংসারের খরচ সামলাতে না পারায় পরিবারে প্রতিদিন অশান্তি।

দৃশ্যপট ৩ : বিত্তবান এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রায়ই হতো ভোজ অনুষ্ঠান। আত্মীয়স্বজন খোশমেজাজে এতে শরিক হতো। বিলাসবহুল জীবন ও উচ্চপদস্থদের সাথে ওঠাবসার জন্যে তার পরিবার-পরিজন গর্ব করত। এই রাজসিক জীবনের পেছনে ছিল কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ। ঋণশোধ করতে না পারায় তার যাবতীয় সম্পত্তি একসময় জব্দ করা হলো। পাওনাদারদের তাগাদায় লজ্জাকর জীবন কাটছিল তার। হঠাৎ তার মৃত্যু হলো, কারণ ঋণের চাপ ও অপদস্থ হওয়ার ভয়। কুলখানিতে গ্রামের কয়েকজন ছাড়া কোনো আত্মীয়কে দেখা যায় নি। আত্মীয়রা তার পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে।

উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনাই সমাজের বাস্তব চিত্র, দেশে-বিদেশে এমন উদাহরণ অগণিত। ঋণ, কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ড বর্তমানে এভাবেই পরিণত হয়েছে মরণফাঁদে। বিশ্বজুড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

ঋণগ্রস্ত মানুষের পরিণতি : ঋণদাস বা দুর্বৃত্ত

ব্রিটেনের বৃহত্তম সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চের সমীক্ষা অনুযায়ী, ইংল্যান্ডে প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি মানুষ ঋণের ধকল সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

আমেরিকায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ ঋণ। ঋণকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীরা তাই বলছেন, সম্পর্কের ঘাতক। পাশ্চাত্যে ক্রেডিট কার্ডধারী প্রত্যেকের পরিচয়–সে একজন ঋণদাস।

জাতীয় জীবনে নতুন আগ্রাসন : ঋণ

আমাদের দেশে নতুন আগ্রাসনের নাম ঋণ। ২০১৫ সালে বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন হচ্ছে, The surging consumer market nobody saw coming. যার মূল বিষয় ছিল, বাংলাদেশে কীভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার অর্থাৎ বাকিতে কেনার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করা যায়।

বোস্টন গ্রুপের ভাষ্য, ২০২৫ সালে ঢাকার মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান জনগোষ্ঠীর আকার হবে বর্তমানের দ্বিগুণ। রাজশাহী ও বরিশালে তিন গুণ এবং খুলনায় হবে বর্তমানের ছয় গুণ। কেননা ভারত চীন ইন্দোনেশিয়ার মতো উদীয়মান ধনী দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে আশাবাদী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। সেইসাথে অধিকাংশ বাংলাদেশি খরচ ও ঋণশোধের ব্যাপারেও সচেতন। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাত্র ৬% আর এদের মধ্যে গৃহঋণ নিয়েছে মাত্র ৩%। ২০১৬ সালে বোস্টন গ্রুপের একটি রিপোর্ট হচ্ছে, This is how consumers turn into debt slaves অর্থাৎ কীভাবে ভোক্তারা ঋণদাসে পরিণত হয়।

আমাদের দেশে এই দাসত্বের প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ক্ষুদ্রঋণ প্রচলনকারীরা। এরই ফলাফল–আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ধরনের নৈতিক অবক্ষয়। সমীকরণটা খুব সহজ, একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ মিথ্যা বলে আর যে মিথ্যা বলে সে যে-কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে খুব সহজে। ঋণের চাপে সে আর সৎ থাকতে পারে না।

ক্রেডিট কার্ড : শুভঙ্করের ফাঁকি

ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বিলাসী পণ্যসামগ্রী বাকিতে কিনতে অভ্যস্ত করা। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলোর জন্যে কাউকে ঋণের দ্বারস্থ হতে হয় না। বিলাসী ভোগ্যপণ্য (স্মার্ট টিভি, হোম থিয়েটার, এসি, ওয়াশিং মেশিন, স্মার্ট ডোর সিকিউরিটি সিস্টেম, গেমিং ল্যাপটপ) কেনার সামর্থ্য না থাকলেও ক্রেডিট কার্ডে তা কিনে ফেলা কয়েক মুহূর্তের বিষয়।

একটি ওয়াশিং মেশিনের দাম যদি হয় ৫০ হাজার টাকা, আপনার উপার্জন যা-ই হোক, মিনিমাম এমাউন্ট পে-এবল পলিসিতে ৫% সুদে আপনি তা কিনে ফেললেন। এ ঋণ শোধ হতে সময় লাগবে প্রায় ১৮ বছর এবং এই সময়ে আপনাকে শোধ করতে হবে দুই লক্ষাধিক টাকা।

বর্তমানে ক্রেডিট কার্ডের প্রতি তরুণদের তীব্র আকর্ষণ লক্ষণীয়। পকেটে একাধিক ক্রেডিট কার্ড থাকাকে তারা স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করে। অথচ এর সাথে দাসত্বের কোনো পার্থক্য নেই।

ক্রেডিট কার্ডে ভোগ্যপণ্য কেনা ডিসক্রেডিট

বিভিন্ন উৎসব-পার্বণকে কেন্দ্র করে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর থাকে নানা আয়োজন। কোরবানির ঈদে আকর্ষণীয় মূল্যে আর কিস্তিতে অর্থাৎ বাকিতে ফ্রিজ কিনতে প্রলুব্ধ করা হয় ক্রেতাদের। কিন্তু এসবের ফলে কোরবানির পবিত্রতা ও রহমত-বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আপনি নিজেই।

আপনি কোরবানি করছেন আল্লাহর নামে। কিন্তু মাংস রাখার জন্যে যখন কিস্তিতে ফ্রিজ কিনছেন, আপনার জীবনে সুদ প্রবেশ করছে। আবার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে কোরবানি করার মানসিকতাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। সুদের হার কম বা বেশি যা-ই হোক, সুদসহ আসল শোধ করতে হবে–এটাই নিয়ম। তাই ধর্মীয় এই নির্দেশ পালনে সুদ জড়িত থাকায় সহজেই তারা পাপের অংশীদার হচ্ছে। সচেতন হোন–আপনার স্বপ্নের বাড়ি, স্বপ্নের গাড়ির চাবি দেখিয়ে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোর অন্তহীন প্রচেষ্টার পেছনে কী স্বার্থ লুকিয়ে আছে?

শুধু তা-ই নয়, কিস্তিতে ভোগ্যপণ্য কেনার অসুস্থ প্রতিযোগিতা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে না; বরং এটা নগদে নিজের উপার্জিত টাকায় কিনতে পারার অযোগ্যতাই প্রকাশ করে। উপার্জন না করে ব্যয় করা যেমন অসম্মানের, বাকিতে কিনে ফুটানি করাও একইরকম হীন কাজ।

ধর্ম কী বলছে?

ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন)-এর ২০০০ সালের ফতোয়া হলো–যদি ক্রেডিট কার্ডে সুদ আরোপ করার ব্যবস্থা থাকে, সুদ আরোপ হওয়ার আগেই আসল শোধ করে দিলেও এটা অনুমোদনযোগ্য নয়।

সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে–ইহলোকে উত্তমর্ণের কাছে সকল ঋণশোধ করার শক্তি দাও। তোমার প্রাসাদে আমায় সকল ঋণ থেকে মুক্ত করো। ঋণ নিমিত্ত নরকপাত থেকে আমায় মুক্ত করো।... *[অথর্ববেদ : শ্লোক ১১৭-১৮-১৯]*

বাইবেলে ঋণ নিষিদ্ধ ছিল। সেইন্ট অ্যামব্রোস ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে বলেছেন, সুদি ব্যবসা হলো ঋণী ব্যবসা, যা ডাকাতি–এমনকি খুনের সাথে তুলনীয়।

ঋণমুক্ত জীবন ॥ সচ্ছল ও সম্মানের জীবন

২৭ বছর ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষকে সচেতন করে আসছে ঋণ নামক অবিদ্যা সম্পর্কে, ঋণ করার দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করতে। ফাউন্ডেশনের বহুমুখী সেবা কার্যক্রমের নেপথ্যেও রয়েছে এর ঋণমুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো। ফলে প্রতিটি কাজে সমৃদ্ধি ও বরকতের ছোঁয়া দৃশ্যমান।

আসুন, ঋণ কিস্তি ও ক্রেডিট কার্ডের অভিশাপ থেকে বাঁচতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। গড়ে তুলি সচ্ছল ও সম্মানের জীবন, যা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

তথ্যসূত্র : ইউএসএ টুডে, ১৫ আগস্ট ২০১৮
দ্য গার্ডিয়ান, ৩ ডিসেম্বর ২০১৮
ওলফ স্ট্রিট, ৮ নভেম্বর ২০১৬

রিয়াসাত আরেফিন শোভন

সততা, দক্ষতা ও বিনয়ের এক আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। লামার কোয়ান্টামম থেকে দিন কয়েকের জন্যে বাড়ি যাচ্ছেন ৩২ বছরের এক তরুণ। তার যাওয়ার কথা শুনে দৌড়ে এলো ১৪-১৫ বছরের এক কিশোর। বলল, 'স্যার, আপনি যখন থাকেন না, আমার খুব একা লাগে। মনে হয়, এখানে আমার কোনো অভিভাবক নেই।' সস্নেহে সেই কিশোরের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন–'সবসময় আল্লাহকে অভিভাবক মনে করবে। তাহলে আর নিজেকে কখনো একা লাগবে না।'

এই ছিল তাদের কথোপকথন আর কোয়ান্টামম থেকে তার শেষবারের মতো যাত্রা। এই তরুণের নাম রিয়াসাত আরেফিন শোভন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের হিকমান ক্যাম্পাসের আবাসিক সুপারিনটেন্ডেন্ট। হাই স্কুল আর কলেজ পড়ুয়া কোয়ান্টাদের সাথে তার বয়সের ব্যবধান খুব বেশি না হলেও এ কিশোররা শোভনকে বসিয়েছিল পিতার আসনে।

(৪ আগস্ট ১৯৮৭ - ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯) কো-অর্গানিয়ার, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। আবাসিক সুপারিনটেন্ডেন্ট, কোয়ান্টাম কসমো হাই স্কুল ও কলেজ

স্নেহ-মমতায় জয় করেছিলেন কোয়ান্টাদের হৃদয়

শোভনের অফিস কক্ষে টেবিলের ওপর একটা বক্সে থাকত বেশ কয়েকটা নেইল কাটার। ছোট-বড় নানান সাইজের। শুধু টেবিলেই নয়, তার পকেটেও থাকত অন্তত দুটো নেইল কাটার। পাহাড় ঘেরা সুবিশাল ক্যাম্পাসে টেবিল-চেয়ারে বসে কাজের সুযোগ খুব কমই মিলত। প্রতিদিনের কর্মমুখর সময়ে হাঁটতে-চলতে তিনি শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের যারই হাত-পায়ের নখ বড় দেখতেন, কাছে বসিয়ে নিজেই নখ কেটে দিতেন। এই আপাত ছোট্ট বিষয়টিও তার নজর এড়াত না। কয়েক শ কোয়ান্টার সার্বিক যত্নে তিনি ছিলেন এতটাই সচেতন।

হাই স্কুল আর কলেজের শিশুদের দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি কাজ করতেন প্রাইমারি সেকশনের শিশুদের ক্যাম্পাসে। তাদের দেখভালের কাজও করেছেন একইরকম মমতা আর নিষ্ঠায়। ভোরবেলা শিশুদের ঘুম ভাঙলে যখন হাত-মুখ ধুইয়ে তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হতো, শোভনও যোগ দিতেন সে-কাজে। সূচনা আর শিশুশ্রেণির কোয়ান্টাদের জন্যে রাতে বিছানা ভিজিয়ে ফেলাটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবুও অবলীলায় এ শিশুদের কাছে টেনে নিতেন শোভন। নিজে হাতে পরিষ্কার করে দিতেন শিশুদের চোখে জমে থাকা ময়লা।

প্রতিদিন ক্ষুদে কোয়ান্টাদের গোসলের সময়টা যেন একটা উৎসব। লাইন ধরে শিশুরা দাঁড়িয়ে আছে আর কয়েকজন মিলে তাদের গোসল করাচ্ছে। একজন টিউবওয়েল চেপে পানি তুলছে, একজন সাবান মাখাচ্ছে, কেউ পানি ঢালছে, কেউ গা মুছিয়ে দিচ্ছে, কেউ চুলে তেল দিয়ে দিচ্ছে, পোশাক পরাচ্ছে। এখানেও হাসিমুখে কাজ করেছেন শোভন।

কোয়ান্টাদের প্রতি ছিল শোভনের সার্বক্ষণিক মনোযোগ। শিশুরাও খুব ভালবাসত ওদের প্রিয় শোভন স্যারকে।

হিকমান ক্যাম্পাসে শুরুর দিকটায় কাজ করত স্বল্পসংখ্যক কর্মীর একটি টিম। অনেকটা শূন্য থেকেই সবকিছু গড়ে নিতে হয়েছে তাদের। এতগুলো শিশুর জন্যে তিন বেলা রান্নার আগে শাকসবজি কাটা-ধোয়ার কাজটা করতে হতো সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। সকালের নাশতার জন্যে কাজ শুরু করতে হতো ভোরের আলো ফোটার আগেই। শোভন সবার আগে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন এবং হাসিমুখে ডেকে দিতেন সহকর্মীদের। সবজি কাটার কাজে সবাই হাত না লাগালে কোয়ান্টারা খাবে কীভাবে?

এমনই ছিলেন শোভন। দায়িত্বটা অন্য কর্মীদের জেনেও কাজের সুযোগ কখনো হাতছাড়া করেন নি তিনি। শুধু তত্ত্বাবধান বা নির্দেশ দেয়া নয়, প্রতিটি কাজে তিনি অংশ নিতেন সবার সাথে।

অন্তর্মুখী কিশোর হয়ে উঠল হাজারো মানুষের আশ্রয়স্থল

শোভন তখন রাজশাহী গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের ছাত্র। প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াতের জন্যে মা-বাবা একটি রিকশা ঠিক করে দিলেন। বাবার সহকর্মীর ছেলেও সাথে যাবে, কারণ সে-ও একই স্কুলে পড়ে। এভাবে তিন বছর ধরে যাওয়া-আসা অথচ কোনোদিন সমবয়সী ছেলেটার সাথে কথা বলে নি শোভন। এতটাই চুপচাপ ছিল সে।

এই অন্তর্মুখী কিশোর নানা বয়সী মানুষের সাথে সহজ হতে শুরু করল কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর। মায়ের উৎসাহে ২০০৩ সালে রাজশাহীতে অংশ নিল কোর্সের ১৬১ তম ব্যাচে। তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ছে। এরপর সাদাকায়নে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং ২০০৬ সাল থেকে সে রাজশাহী সেন্টারের সক্রিয় কোয়ান্টিয়ার।

মাটির ব্যাংক করসেবায় বোঝা যেত–কোমল স্বভাবের মৃদুভাষী এই ছেলেটি সংকল্পে কতটা দৃঢ়! রোদ-বৃষ্টিতে নগরের অলি-গলি ঘুরেও যখন কোনো মাটির ব্যাংক গ্রহীতার বাসা খুঁজে পাওয়া যেত না, অন্যরা হয়তো হাল ছেড়ে দিতেন কিন্তু কোয়ান্টিয়ার শোভন খুঁজে বের করতেনই।

কোয়ান্টাম ইয়োগা টিমে কাজ করেছেন নিয়মিত। খতনা কার্যক্রমের কোয়ান্টিয়ার হিসেবে তার পারদর্শিতা ছিল অপারেশন থিয়েটারে সার্জনকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল শোভনের, ব্লিডিং পয়েন্ট খুঁজে বের করতে পারতেন চোখের নিমেষেই। ফলে অপারেশন-পরবর্তী রক্তক্ষরণ বন্ধ করা সম্ভব হতো দ্রুততার সাথে।

কোয়ান্টামের উদ্যোগে ২০০৫ সালে রাজশাহীতে শুরু হয় বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও সৎকারের কাজ। অন্যান্য কাজের মতো এখানেও শোভন ছিলেন নির্ভরযোগ্য এক স্বেচ্ছাসেবী।

কোনো অভিযোগ ছিল না, চাওয়া ছিল না, ছিল শুধু কাজ

পড়ালেখায় বরাবরই মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন শোভন। রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন রুয়েট (রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে। প্রথাগত ক্যারিয়ার-ভাবনার বাইরে এসে পেশা হিসেবে বেছে নেন সেবাধর্মী কাজ।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকায় এলেন ২০১১ সালে। সে-সময় ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্যরা চারপাশে সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন বিদায় হজের মর্মবাণী সম্বলিত 'হে মানুষ শোনো' সিডি ও কণিকা। হজ ক্যাম্পে ও বিমানবন্দরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হজযাত্রীদের মাঝে এ ক্যাম্পেইনের মধ্য দিয়েই শুরু হলো শোভনের নতুন পথচলা। একটার পর একটা ফ্লাইট, মধ্যবর্তী সময় যত সামান্যই হোক, কণিকা হাতে শোভন ছুটে যেতেন অপেক্ষমাণ যাত্রীদের কাছে। বিরতি বা বিশ্রাম বলে কোনো শব্দই যেন তার অভিধানে নেই।

কোয়ান্টামে পূর্ণ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন আট বছর এবং কোয়ান্টিয়ার হিসেবে এর আগে আরো পাঁচ বছর। বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, সঙ্ঘবদ্ধ কাজে কখনো নেতৃত্ব দিয়েছেন, কখনো অনুসরণ করেছেন নেতৃত্বকে। অনুসরণে ছিলেন অতুলনীয় আর সুদক্ষ ছিলেন টিম পরিচালনায়। শোভন কখনো দুর্ব্যবহার করেছেন বা কাউকে কষ্ট দিয়েছেন–এমন একটি ঘটনারও উল্লেখ কেউ করতে পারেন না।

সবার জন্যেই তিনি ছিলেন নিঃসংকোচে নির্ভর করার মতো একজন মানুষ। কাজের পরিবেশে ভুল ধরিয়ে দেয়া নয়; বরং সহকর্মীর প্রতি সার্বক্ষণিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া ছিল তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। যে-কোনো সমস্যায় খুঁজে নিতে পারতেন সহজ সমাধানের পথ।

কারো প্রতিই তার কোনো অভিযোগ ছিল না, চাওয়া ছিল না, স্রষ্টায় সমর্পিত এ জীবনে ছিল শুধু কাজ। কাজের পেছনে লেগে থাকার স্বতঃস্ফূর্ত গুণ ছিল শোভনের। শ্রমসাধ্য কায়িক পরিশ্রমে কখনো পিছিয়ে থাকেন নি। লামায় খেদমতায়নের দিনগুলোতে বৈচিত্র্যময় ও চ্যালেঞ্জিং সব কাজে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তীদের একজন।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে বর্ণাঢ্য কর্মমুখর সময়

ছয় শতাধিক কোয়ান্টার আবাসিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব শোভন পালন করেছেন দক্ষ সেনাপতির মতো। প্রত্যেকের নাম, আইডি নম্বর এবং কে কোন ক্লাসে পড়ে–সব ছিল তার নখদর্পণে। এমনকি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে যখন দুরন্ত কিশোরের দল পাহাড়-অরণ্যে ছুটে বেড়াচ্ছে, কারো খোঁজ পড়লে শোভন ঠিক বলে দিতে পারতেন কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। এমনভাবেই তিনি মিশে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাদের সাথে।

দেয়াই যে প্রকৃত অর্থে পাওয়া–এই মন্ত্রেই বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই-তো হৃদয় উজাড় করে ভালবেসেছেন কোয়ান্টাদের। ওরাও সবচেয়ে বেশি নিরাপদ বোধ করত শোভন স্যারের কাছে। ওদের প্রতি কঠোর না হয়ে তিনি শুধরে দিতে চেষ্টা করতেন সবসময়। প্রতিকূল সময়েও সহকর্মীদের বলতেন–'সন্তান যত দুরন্তই হোক, মা-বাবা কি কখনো তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে? আমরাই তো এদের মা-বাবা-অভিভাবক। আমাদের ধৈর্য হারালে চলবে না।'

বিশিষ্ট অতিথিরা লামায় এলে পাশে থেকে নীরবে সেবা দিতেন শোভন। এমনই একটি সফরে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামানের সাথে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের এক ভর্তি উৎসবে (সর্বডানে)

একবার সহকর্মীরা পরিকল্পনা করলেন–ইলিশ মাছ কিনে নিজেরা রান্না করে খাবেন। শোভন শুনে বললেন, 'এখন পর্যন্ত আমরা কোয়ান্টাদের ইলিশ মাছ খাওয়াতে পারি না। যা বাচ্চাদের দিতে পারি না, লামায় তা আমি খেতে পারব না।' অতএব পরিকল্পনার ওখানেই ইতি।

ক্লাসের পড়া আর ব্যস্ত রুটিনের ফাঁকে কখনো দেখা যেত, একঝাঁক কোয়ান্টা ঘিরে রেখেছে শোভনকে আর তিনি জিজ্ঞেস করছেন–বড় হয়ে কে কী হতে চাও? কেউ হবে ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক, কেউ হবে প্রধানমন্ত্রী, কেউ-বা বলে উঠত–'আমি বড় হয়ে শোভন স্যার হবো।' একথা শুনে হেসে উঠতেন শোভন।

গণিতে তুখোড় ছিলেন তিনি। চাইতেন এ বিষয়ে কোয়ান্টাদেরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে। মজার ছলেই গণিতের নানা প্রশ্ন করতেন ওদের। নবম-দশম শ্রেণির গণিত বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে মুখে মুখেই সমাধান বলে দিতেন।

কোয়ান্টাদের পড়ালেখা, প্যারেড, খেলাধুলা, শারীরিক-মানসিক যত্নায়ন–সব ক্ষেত্রেই সমন্বয় সাধনের কাজটি করতেন নিখুঁতভাবে। সর্বস্তরের কর্মী আর কোয়ান্টারা–সব মিলেই যেন একটা টিম, যারা কাজ করে যাচ্ছে মানবিক মহাসমাজ নির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। মেধার কোনো জাত নেই ধর্ম নেই বর্ণ নেই–পৃথিবীতে এ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকে। আর এ টিমের অন্যতম ছিলেন শোভন।

কষ্টসহিষ্ণু কাজেও হাস্যোজ্জ্বল শোভন

সঙ্ঘই যার একমাত্র প্রেম

কর্মপ্রাণ রিয়াসাত আরেফিনের জীবনে সঙ্ঘই ছিল একমাত্র প্রেম। সঙ্ঘে যোগদানের প্রাক্কালে গুরুজী শহীদ আল বোখারী তাকে বলেছিলেন, 'ফাউন্ডেশন তো অনেক পরিশ্রমের জায়গা। এখানে আপনার কষ্ট হবে।' জবাবে শোভন বলেছিলেন–'আপনি যদি লামায় এত কষ্ট করতে পারেন, আমিও পারব।'

তিনি ছিলেন এমনই দ্বিধাহীন, লক্ষ্যাভিসারী এক তরুণ। সততা, দক্ষতা আর বিনয়ের এক বিরল মেলবন্ধন ঘটেছিল তার দীপ্যমান ব্যক্তিত্বে। তাকে আলাদা করা যেত অগণিত মানুষের ভীড়ে।

লামার আবাসনে সবসময় একটা ব্যাগ গোছানো থাকত শোভনের। কিছু পোশাক আর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন?–জিজ্ঞেস করলে সহাস্যে বলতেন, 'সঙ্ঘের প্রয়োজনে যে-কোনো জায়গায় যেন তৎক্ষণাৎ রওনা হতে পারি। আল্লাহ ডাকলেও যেন সাথে সাথে চলে যেতে পারি।'

স্রষ্টার ইচ্ছায় জীবন নামের অধ্যায়ে ইতি টেনে চলে যেতে হয়েছে শোভনকে। কিন্তু সঙ্ঘের মানুষগুলোর জন্যে তিনি দিয়ে গেছেন পূর্ণপ্রাণে বাঁচার মন্ত্র। বিশ্বাসে-কর্মে-দায়িত্বে উজ্জ্বল এ মানুষটি রেখে গেছেন তার আদর্শের আলো, যে আলোয় বহুদূরের পথ পাড়ি দেবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *যাতায়াতের সুবিধার জন্যে কোয়ান্টামের নতুন একটি শাখায় আমাকে যেতে হচ্ছে। আগে যেখানে যেতাম, সেখানে আমি কোর্সের দায়িত্ব পালনসহ নানা কাজের সুযোগ পেতাম। এখন যেখানে সাদাকায়নে যাই, সেখানে আগের মতো ভালো লাগে না। ফাউন্ডেশনের কাজের প্রতি আমার আগ্রহ কমে গেছে। মেহমানের মতো আসি আর যাই। মনে হচ্ছে, আমি অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি।*

উত্তর : আপনি কোনো সেন্টার শাখা সেল বা প্রি-সেলের নন, আপনি কোয়ান্টামের। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি সেল শাখা সেন্টার আপনার। যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন, সেখানে নিঃসংকোচে যাবেন। শুধু আগের শাখা-সেলকে জানাবেন–অমুক জায়গায় গেলে আমার জন্যে সুবিধা হয়।

মনে রাখবেন, ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যই হলো আপনাকে গড়ে তোলা। তাই নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নিয়মিত হওয়া এবং সেখানে সঙ্ঘের কাজে অংশ নেয়াটা আপনার এগিয়ে যাওয়ার পথে সহায়ক।

আর কেন আপনি মেহমানের মতো থাকবেন? তিন দিনের বেশি কোথাও মেহমান হিসেবে থাকার সুযোগই নেই! নবীজী (স) অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি বলেছেন, মেহমানদারি হচ্ছে তিন দিন। চতুর্থ দিন থেকে কেউ মেহমান বলে গণ্য হবে না।

অতএব আপনি সাদাকায়নে প্রথম তিন শুক্রবার মেহমান হতে পারেন। চতুর্থ শুক্রবার থেকে আপনি মেজবান। নতুন জায়গার মোমেন্টিয়ার-আর্ডেন্টিয়ারকে বলবেন, আমাকে কাজ দিন। তারা দিতে না পারলে প্রয়োজনে আমাকে লিখবেন। সবসময় কাজের মধ্যে থাকবেন। কারণ ভালো কাজগুলোই সাথে যাবে, আর কিছু নয়। সঙ্ঘবদ্ধ সৎকাজটুকুই পরকালীন সঞ্চয়। আর কাজের মধ্যে থাকলেই আপনি সব দিক থেকে ভালো থাকবেন।

প্রশ্ন : *আমার স্বামী একটি মামলায় জেল খেটেছেন নয় মাস। এখন আরেকটা মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা এবং পরের মাসে ব্যাংকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণশোধ করতে হবে। এমতাবস্থায় আমার একটি ফ্ল্যাট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু ফ্ল্যাটটি যেহেতু আমার ভাইয়ের নামে কেনা, সে দাবি করছে ফ্ল্যাট বিক্রি করলে তাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এখন আমরা এমনিতেই মৃত, সে আমাদের আরো মেরে ফেলতে চাচ্ছে। গুরুজী, আমাদের করণীয় কী? দোয়া করবেন।*

উত্তর : আমরা আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি সমব্যথী, কিন্তু আদতে তো এটাই হওয়ার ছিল। কারণ আপনি যখন ভাইয়ের নামে ফ্ল্যাট কিনেছেন, তখন বাস্তবতা হয়তো এই–আপনার অর্থটা বৈধ কোনো পথে অর্জিত ছিল না। তাই আপনি নিজের নামে ফ্ল্যাটটি কিনতে পারেন নি। ভাইকে আপনি নিরাপদ মনে করেছেন। ভেবেছেন, ভাইয়ের নামে রাখলে কেউ কিছু বুঝবে না। এখন ভাই মনে করছে, 'যো আপসে আপ আতা হ্যায় সাব হালাল হ্যায়'।

সেই গল্পটা তো জানেন নিশ্চয়ই। এক মওলানা সাহেব ওয়াজ করছেন যে, তিনি গোশত খান না। কিন্তু খেতে বসে দেখলেন, গোশত ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন বললেন, ঠিক আছে একটু ঝোল দাও। ঝোল দিতে গিয়ে গোশতের একটি টুকরো পাতে পড়ে গেছে। মেজবান খুব শঙ্কিত হয়ে উঠিয়ে নিতে যাবেন, তখন মওলানা সাহেব তাকে থামিয়ে বললেন, 'ছোড় দো ছোড় দো, যো আপসে আপ আতা হ্যায় সাব হালাল হ্যায়'। অর্থাৎ আপনা-আপনি যেহেতু এসে পড়েছে, অতএব এটা হালাল।

এখন আপনার ভাইও সেটাই মনে করছে–নিশ্চয়ই দুলাভাই নয়-ছয় করেছে। তা না হলে আমার নামে কেন ফ্ল্যাট রাখবে? অতএব আমি এর সুযোগ তো নিতেই পারি।

একথা বলার উদ্দেশ্য হলো বাস্তবতা তুলে ধরা, কাউকে ছোট করা নয়। এখন আপনার কাজ হবে, যা হয়ে গেছে সেজন্যে তওবা করা। তওবার অর্থ হলো অনুশোচনা ও আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। সেইসাথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যে, এ অন্যায় আমার দ্বারা আর হবে না। ঋণ করে আর ঘি খাব না! আমরা দোয়া করি, যেন আপনারা দ্রুত এ জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন।

প্রশ্ন : *পোস্ট অফিসে আমার দুই লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র আছে। সেখান থেকে প্রতি মাসে আমি দুই হাজার টাকা করে সুদ পাই। কিন্তু মুনাফা হয় বলে আমি পোস্ট অফিসে টাকা রাখতে ইচ্ছুক নই এবং আগামী মাসে আমি টাকাটা তুলে নেয়ার নিয়ত করেছি। কিন্তু এই টাকাটাই আমার সম্বল। এতদিন ধরে মুনাফার এই টাকায় আমার প্রয়োজনীয় হাতখরচ চলছিল। আমার স্বামী আমাকে কোনো হাতখরচ দেয় না। এমনকি আমার জামা, জুতা, ব্যাগ, মোবাইলের খরচ, মাটির ব্যাংকে দান এবং ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামে যাওয়া-আসাসহ সব ধরনের খরচ আমাকেই বহন করতে হয়। গুরুজী, স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করছি না। তবে টাকাটা যেহেতু আমার একমাত্র সম্বল, তাই কোনো সৎ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে আমি বিনিয়োগ করতে চাই, যেন দুই লক্ষ টাকা থেকে আমি এটা দুই কোটিতে নিয়ে যেতে পারি। এজন্যে আমার কী করা উচিত?*

উত্তর : স্বামী যদি হাতখরচ না দেন, তবে স্বামীর পকেটকে নিজের পার্স মনে করবেন সবসময়। এটা নিয়ে মজার ঘটনা আছে।

মক্কা মুক্ত হওয়ার পর নবীজীর (স) কাছে সবাই বায়াত হতে এসেছে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা দেখল–এটাই সুযোগ! সবাই যাচ্ছে, যদি আমিও গিয়ে তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণ করি তাহলে মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যেতে পারি।

কারণ হিন্দা নবীজীর (স) চাচা হামজার (রা) কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল, যা ছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মহিলাদের ভীড়ে সে চাদরে মুখ ঢেকে সেখানে উপস্থিত হলো। নবীজী (স) তাকেও বায়াত করছেন এবং বলছেন যে, কখনো মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না ইত্যাদি।

চুরির প্রসঙ্গ আসতেই হিন্দা বলল, আমার স্বামী আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ। সে যে টাকা দেয় তা আমার ও সন্তানের ভরণপোষণের জন্যে যথেষ্ট নয়। তাকে না জানিয়ে তার পকেট থেকে যদি আমি টাকাপয়সা নিই, তা কি চুরি হবে? এটা কি পাপ হবে? নবীজী (স) বললেন, 'তোমার প্রয়োজন পূরণের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ স্বামীর পকেট থেকে নিতে পারো।'

অতএব স্বামীর টাকাই আপনার টাকা। তিনি টাকা দেন না বলে কেন আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগবেন? এটা তো স্বামীর অন্যায়। কারণ তিনি বিয়ে করেছেন স্ত্রীকে সম্মানজনক ভরণপোষণ দেয়ার শর্তে। তার সামর্থ্যের মধ্যে স্ত্রীকে হাতখরচ দিতে হবে, সেটা যত অল্পই হোক।

আর আপনি নিজের টাকা কোনো সৎ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে চান। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। কখন যে এটা অন্যের টাকা হয়ে যাবে আপনি টেরই পাবেন না!

এখন দেশের কিছু মানুষের অবস্থা এমন যে, টাকা যারই হোক নিজের পকেটে এলে সে ভাবে এটা তারই টাকা। গত ৩০ বছরে ক্ষুদ্রঋণ আমাদের এ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। মানুষের নৈতিকতা যা অবশিষ্ট ছিল, তা-ও প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। এদেশে যিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্রঋণ দিয়েছেন, আমেরিকানরা তাকে কত সম্মান আর পুরস্কার দিচ্ছে! কেন? তাদের ভাষ্য, আমরা যা করতে পারি নি, তুমি সেই কাজটা করেছ–বাঙালির নৈতিকতার বারোটা বাজিয়েছ।

অতএব সবসময় বাস্তববাদী হবেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে আপনাকে এগোতে হবে। ঘরে টাকা রাখা নিরাপদ নয়, কিন্তু টাকাটা তো কোথাও রাখতে হবে–ব্যাংকে অথবা পোস্ট অফিসে। আবার টাকা রাখবেন কিন্তু মুনাফা নেবেন না, সেটাও বোকামি। কারণ আপনার লাভের টাকা কোনো খারাপ কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাই টাকা যেখানে আছে সেখানেই থাকুক। মাসে দুহাজার টাকা পাচ্ছেন, খুব ভালো।

আরেকটি বিষয়–আপনি দুই লক্ষ টাকাকে উন্নীত করতে চান দুই কোটিতে। বিনাশ্রমে কম সময়ে অনেক লাভ করার এই মানসিকতাই মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। তাই অভাববোধ ও প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখুন।

এ মাসের অটোসাজেশন

দুর্দশাগ্রস্তরা জ্ঞানীর কথা
শোনে না, প্রভাবিত হয়
প্রতারকের অলীক কথায়,
চালবাজের চালবাজিতে আর
শোষকের ভয়ে। দুর্দশা-বঞ্চনার
বৃত্তেই ঘুরপাক খায় তারা।
আমি জ্ঞানীর কথা শুনব। উড়ে
বেড়াব মুক্তির আনন্দলোকে।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এ ‘শুদ্ধাচার ও মানসিক চাপ উপশম’ কর্মশালা

১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাসহ ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডনের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন

১৫ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ সাদাকায়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন শাখার নতুন অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে। লন্ডন শাখার সকল কার্যক্রম এখন থেকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে :

33 Princelet Street, London E1 5LP
Tel : +442034322672

পেনসিলভেনিয়াতে কোয়ান্টামের যাত্রা শুরু

৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার আপার ডার্বিতে শুরু হলো কোয়ান্টামের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম। এখন থেকে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে সাপ্তাহিক সাদাকায়ন :

211, Barrington Rd,
Upper Darby, PA 19082,
Tel : +17186665998

প্রথম সাদাকায়নে ৪০ জন প্রবাসী বাঙালি অংশ নেন

জার্মানিতে কোয়ান্টাম সভা ও মেডিটেশন সেমিনার

৭ সেপ্টেম্বর জার্মানির মুনস্টার শহরে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সভায় ১১ জন প্রবাসী বাঙালি অংশ নিয়েছেন। সেমিনার শেষে অংশগ্রহণকারীদের *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* উপহার দেয়া হয়।

এ-ছাড়া কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি হাইডেলবার্গ শাখা ২৬ মে জার্মানির নর্থ সি সাগরের লাঙ্গেওগ (Langeoog) দ্বীপে মেডিটেশন-বিষয়ক একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার আয়োজন করে। হাউস মিডল্যান্ড কনফারেন্স সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মোট ১৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্যারিসে বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ হাসপাতালে রক্তদান কর্মসূচি

১ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিসের উদ্যোগে পঞ্চম বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি। রক্তদানের এ কার্যক্রমটি অনুষ্ঠিত হয় প্যারিসের বিখ্যাত বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ (Bichat-Claude Bernard) হাসপাতালে। এবারের আয়োজনে রক্তদান করেন ২৫ জন রক্তদাতা।

উল্লেখ্য, নিয়মিত রক্তদান কার্যক্রম আয়োজনের প্রেক্ষিতে বিশা-ক্লোদ বার্নার্দ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি প্যারিসকে স্বেচ্ছা রক্তদাতা সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেন।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এবং ময়মনসিংহ পুলিশ লাইনসে মেডিটেশন সেমিনার

৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) মেডিটেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১৬০ জন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার অংশ নিয়েছেন।

১২ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ পুলিশ লাইনসে মেডিটেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মো. শাহ আবিদ হোসেন, বিপিএম (বার) পুলিশ সুপারসহ ৩২০ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার

নেত্রকোণার দুর্গাপুরে সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়

- ☐ মুন্সীগঞ্জে ২৪ আগস্ট পি.টি.আই কলেজে ২০০ জন শিক্ষক ও ২৫ আগস্ট গজারিয়া উপজেলা পরিষদে ৯২ জন প্রধান শিক্ষক অংশ নেন।
- ☐ ৩১ আগস্ট বগুড়ার শেরপুরে আনোয়ারা সিরাজ স্কুল এন্ড কলেজে ২২৫ জন শিক্ষার্থী ও ২৭ জন শিক্ষক অংশ নেন।
- ☐ ১ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজে আনসার ভিডিপি ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।
- ☐ ৪ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণায় সরকারি মহিলা কলেজ ও আবু আব্বাস কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যথাক্রমে ২৫৯ জন ও ৩৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার আজিমপুরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ২৪৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ☐ ৫ সেপ্টেম্বর কুমিল্লায় চান্দিনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৯২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ৫ সেপ্টেম্বর সাভারে শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।
- ☐ ৭ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাও উপজেলায় হোসেনপুর এস.পি ইউনিয়ন কলেজে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ৮ সেপ্টেম্বর ফরিদা বিদ্যায়তন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৭৫ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ৩ ও ১২ সেপ্টেম্বর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস স্কুল ও কলেজে যথাক্রমে চার শতাধিক ও দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
- ☐ ১৭ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণার দুর্গাপুরে সুসং সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৩১৫ জন শিক্ষার্থী এবং ২৯ জন শিক্ষক অংশ নিয়েছেন।

সভ্যতা যাদের কাছে ঋণী

ইবনে সিনা
মন সুস্থ তো দেহ সুস্থ

গল্প নয়, সত্যি। পারস্যের এক রাজকুমার। তার এক অদ্ভুত রোগ হলো। নিজেকে মানুষ নয়, মনে করত সে একটি গরু! গরুর মতো হাম্বা হাম্বা স্বরে ডাকাডাকিও করত। একপর্যায়ে খাওয়াদাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। কেঁদে কেঁদে সে আর্জি জানাত, 'আমাকে মারো, আমাকে জবাই করো, তোমরা আমার গোশত রান্না করে খাও।' রাজকুমারের এই অবস্থা দেখে রাজা পড়লেন মহাবিপদে। কোন ডাক্তার-হেকিম করবে এ অদ্ভুত রোগের চিকিৎসা?

রাজা সে-সময় পারস্যের প্রখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সিনার শরণাপন্ন হলেন এবং পুত্রের জীবন রক্ষার অনুরোধ জানালেন। ইবনে সিনা চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। বুঝতে পারলেন, এটি মনস্তাত্ত্বিক কোনো জটিলতা। তিনি রোগীর কাছে এক লোক পাঠিয়ে বললেন, 'রাজকুমারকে গিয়ে আশ্বস্ত করো–তোমাকে জবাই করার জন্যে শিগগিরই কসাই আসবে। তুমি প্রস্তুত থেকো।'

একথা শোনার পর রাজকুমার মহাখুশি। ভাবখানা এমন যে, তার গরু হয়ে জন্মানোটা এবার সার্থক হতে যাচ্ছে! একসময় ইবনে সিনা একটি বড় ধারালো ছুরি হাতে হাজির হলেন। রাজপ্রাসাদে গিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন–'আমার গরুটা কোথায়? আমি এখন তাকে জবাই করব।' রাজকুমার গরুর মতো হাম্বা শব্দ করে জানান দিল–এই যে, গরু এখানে!

ইবনে সিনার নির্দেশে সবাই তাকে ধরে শোয়াল। রোগীও আনন্দে শুয়ে পড়ল। ইবনে সিনা রাজকুমারের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে বললেন যে, 'নাহ! এই গরুটা খুব হ্যাংলাপাতলা, এর গায়ে তো তেমন গোশতই নেই। জবাই করব না। একে খাওয়াদাওয়া করাও। একটু মোটাতাজা হোক, তাহলে এর গোশত সুস্বাদু হবে।'

রোগীও ভাবল, তা-ই তো! এরপর রোগীকে যে খাবারই দেয়া হয়, তৃপ্তির সাথে সে খেতে শুরু করল। মোটাতাজা তাকে হতেই হবে। নিয়মিত খাবারের পাশাপাশি রোগীর সাথে কাউন্সেলিং শুরু করলেন ইবনে সিনা। ধীরে ধীরে রোগী তার স্বাস্থ্য ফিরে পেল। মানসিক অবস্থার উন্নতি হলো তার। একসময় সুস্থ হয়ে উঠল রাজকুমার। দূর হলো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা।

মনোদৈহিক চিকিৎসার অগ্রপথিক

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ও প্রমাণ দুটোই প্রথম করেছিলেন ইবনে সিনা। এখন থেকে হাজার বছর আগে চিকিৎসাজগতে তার অমর গ্রন্থ *কিতাবুশ শেফা*-য় তিনি বলেছেন, 'মন দেহকে প্রভাবিত করে সবচেয়ে বেশি। মন সুস্থ হলে অর্থাৎ মনের আবর্জনা-ক্ষত-ব্যাধির নিরাময় হলে একজন মানুষ সহজেই সুস্থ হয়ে ওঠে।'

অথচ একশ বছর আগে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকেরা ওষুধ বা রাসায়নিক উপাদান ছাড়া কোনোকিছুকেই নিরাময়-সহায়ক হিসেবে গণ্য করতেন না। বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে ইবনে সিনার এই তত্ত্বই সত্য বলে প্রমাণিত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের যত ধরনের রোগ হয়, তার ৭০-৭৫ ভাগই মনোদৈহিক অর্থাৎ মন থেকে সৃষ্ট।

ইবনে সিনা তার অভিজ্ঞতা থেকে আরো বলেছেন, 'সুস্থ মানুষও অসুস্থ হতে পারে, যদি সে মনের দিক থেকে আতঙ্কিত থাকে। আবার অসুস্থ একজন মানুষ শুধু ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই পুরোপুরি সুস্থ হতে পারে।' দেহের ওপর মনের প্রভাব কত বেশি–এ বিষয়ে তার একটি যুগান্তকারী উদাহরণ আছে।

রাস্তার ওপর একটি সরু কাঠের তক্তা বিছিয়ে দিয়ে কাউকে যদি বলা হয়, এর ওপর দিয়ে হেঁটে যাও। অনায়াসে তক্তার ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাবে। একই তক্তা যদি খালের ওপর পুল হিসেবে বিছিয়ে দেয়া হয় এবং সেই ব্যক্তিকে তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলা হয়, তাহলে ঘটবে উল্টো ঘটনা। শক্ত-সমর্থ পা দুটি দিয়ে সে আর পুল পার হতে পারবে না। কয়েক কদম চলার পর ধপাস করে পড়ে যাবে। কিন্তু কেন?

কারণ পুলের ওপর দিয়ে পার হওয়ার সময় সে ভাবে, 'যদি পড়ে যাই'! আর নিউরোসায়েন্সের মতে, মানুষ যা কল্পনা করে, মস্তিষ্ক সেই বাস্তবতাই তৈরি করে। ঠিক তেমনি পুল থেকে পড়ে যাওয়ার ছবিটা ব্যক্তির মস্তিষ্কে গভীরভাবে গেঁথে যায় এবং তার মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পা দুটিও স্বাভাবিক শক্তি ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং সে পড়ে যায়।

ইবনে সিনার এ উদাহরণটি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় মন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলোতে যুগ যুগ ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও এই উদাহরণটি উল্লেখ করা হচ্ছে ২৭ বছর ধরে।

ইবনে সিনা শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না। তিনি একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, কবি, ধর্মতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষবিজ্ঞানী ছিলেন। তখনকার দিনে জ্ঞানের এমন কোনো শাখা ছিল না, যেখানে তার বিচরণ ছিল না। মেধা ও যোগ্যতার জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অল্প বয়সেই। অর্থ-প্রতিপত্তির ঊর্ধ্বে জ্ঞান অর্জনকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তিনি।

জ্ঞানের জন্যে উৎসর্গীকৃত জীবন

তখন তার বয়স মাত্র ১৮ বছর। বোখারার আমিরের গুরুতর এক ব্যাধি হলো। তখনকার অভিজ্ঞ ডাক্তার-হেকিম যারা ছিলেন, সবাই চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হলেন। ইবনে সিনা বললেন, 'আমি চেষ্টা করে দেখি।' তার চিকিৎসা পেয়ে আমির সুস্থ হলেন এবং খুশি হয়ে বললেন, 'কী পুরস্কার চাই তোমার?' এই বলে আমির তার গলার রত্নখচিত মালাটি খুলতে শুরু করলেন ইবনে সিনাকে দেয়ার জন্যে। ইবনে সিনা বলে উঠলেন, 'আমার একটি চাওয়া আছে। আপনার যে বিশাল লাইব্রেরি আছে, সেখানে আমি পড়াশোনা করার অনুমতি চাই।' সাথে সাথেই আমির বললেন, 'আমার লাইব্রেরিতে এখন থেকে তুমি ইচ্ছেমতো প্রবেশ করবে এবং পড়াশোনা করবে।'

জ্ঞানচর্চায় তিনি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, একবার সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে একশ পৃষ্ঠার গবেষণা নিবন্ধ লিখে ফেললেন। ঘোড়ার পিঠে বসেও লিখতে পারতেন। একসময় তার জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়, হয়ে উঠলেন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক। সভ্যতাকে করলেন চিরঋণী।

ইবনে সিনা
৯৮০-১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

'আমি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন চাই,
তা যতই সংক্ষিপ্ত হোক'

'যত আরাম তত ব্যারাম'

'হঠাৎ জ্বলে ওঠা আলো
দ্রুত নিভে যায়'

- ইবনে সিনার জন্ম উজবেকিস্তানের বোখারায় এবং মৃত্যুবরণ করেন ইরানের হামাদানে।
- মাত্র ১০ বছর বয়সে কোরআনে হাফেজ হন।
- ১৬ বছর বয়সে আত্মস্থ করেছিলেন এরিস্টটলের মেটাফিজিক্স। পরবর্তী দুবছরে চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষ হয়ে ওঠেন।
- দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী, এই পাঁচশ বছর তার বই *ক্যানন অব মেডিসিন* বা *আল কানুন ফিত-তিব* চিকিৎসাশাস্ত্রে পাঠ্যবই হিসেবে ইউরোপে পড়ানো হয়।
- তিনিই প্রথম এনাটমি, পেডিয়াট্রিক্স এবং গাইনোকোলজির কিছু মৌলিক তত্ত্ব তুলে ধরেন। ব্যাখ্যা করেন চোখের এনাটমি।
- যক্ষ্মারোগ প্রথম শনাক্ত করেন ইবনে সিনা এবং প্রমাণ করেন যে, এটি ছোঁয়াচে। রোগ যে পানি ও মাটি দ্বারা বাহিত হতে পারে, এই ধারণাও তার দেয়া।
- শরীর, মন ও আত্মার যোগসূত্রে যে চিকিৎসাপদ্ধতি অর্থাৎ হলিস্টিক মেডিসিন, এর প্রণেতাও তিনি।
- জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রায়ই ধ্যানে নিমগ্ন হতেন অধিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের মৌলিক বিষয় নিয়ে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

নভেম্বর ২০১৯

কোয়ান্টাম মেথড একটি লাইফ জ্যাকেট

ড. এ কে এম শহীদুল্লাহ্

কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয় ১০ বছর আগে, *সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড* বইটি পড়ে। পরবর্তীতে আমার রোল মডেল প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদের একটি লেখাও আমাকে কোয়ান্টাম সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু পড়াশোনা ও বিদেশে চাকরি ইত্যাদি নানা ব্যস্ততায় এতদিন কোর্সটি করা হয়ে ওঠে নি।

সম্প্রতি আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, যে কারণে আমি দেশে এসেছি। আমি মায়ের বড় ছেলে, মায়ের মৃত্যুতে মনটা খুব খারাপ ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট দেখে কোর্সের তারিখ জানতে পারলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম–এবারই করব।

এ কোর্সটি আমার জন্যে একটি আশীর্বাদ। আমার মায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ সবসময় আমার জন্যে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে। ঠিক তেমনি এবারও যেন মা আমাকে দেশে ডেকে এনে বললেন–'কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটা করো'। মা আমাকে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদটা দিয়ে গেলেন।

বাস্তব জীবন সত্যিই কঠিন। একে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে হলে কিছু কৌশল জানতে হবে। কোয়ান্টাম মেথড আমাদের সেই কৌশলগুলোই আয়ত্ত করতে শেখায়। চার দিন পর আজ মনে হচ্ছে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন নদীতে যদি ঝড় ওঠে তবু আমাকে ডুবে যেতে হবে না, কারণ কোয়ান্টাম আমাকে লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দিয়েছে। এ কোর্স সত্যিই একটি লাইফ জ্যাকেট।

[অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব তাসমানিয়ার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. এ কে এম শহীদুল্লাহ্ কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৪৬৩ ব্যাচের প্রত্যয়নে একথা বলেন।]

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৪ তম কোর্স

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : আইডিইবি, কাকরাইল, ঢাকা

মুক্ত আলোচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া

নৈতিকতার চর্চাই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার

বাংলাদেশ আজ অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বর্তমানে এশিয়াতে সর্বোচ্চ, প্রায় আট শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, আমাদের জাতীয় আয় ও জাতীয় বাজেটের পরিমাণও প্রতিবছরই বাড়ছে। অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটছে, এখন এ অবস্থায় আমাদের সবচেয়ে বেশি যা দরকার সেটা হলো শান্তি, বিনয়, পরমতসহিষ্ণুতা, সেবা ও নীতি-নৈতিকতার চর্চা। এটা শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে, নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে। আর বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বহুদিন ধরে এর চর্চা করে আসছে। বলা যেতে পারে, সেবা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম।

গত ৭ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৯৩ তম পর্বে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শ্রোতা-দর্শক হিসেবে অংশ নেন শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীসহ কোয়ান্টাম পরিবারের তিন শতাধিক সদস্য।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া আরো বলেন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের আমি দেখেছি–তারা নিজেরা যেমন সুস্থ ও ভালো থাকতে চান, তেমনি অন্যদেরও ভালো রাখার জন্যে কাজ করে যান। বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনকালে আমি লক্ষ করেছি–কীভাবে ছোটবেলা থেকেই আধুনিক শিক্ষায় ও সুস্থ সুন্দর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই শিশুরা বা তাদের পরিবারের কাছ থেকে কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশায় নয়, বরং এ-কাজটি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। এই নিরেট সমাজসেবা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। আমি মনে করি, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে কোয়ান্টামের পাশে থেকে তাদের ভালো কাজগুলো এগিয়ে নেয়া আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব।

লামার কোয়ান্টামমে নতুন সেবা উদ্যোগ

প্রবীণ সেবা ও দাফন কার্যক্রম

তৃষিত পথিকের জন্যে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ফাউন্ডেশনের সৃষ্টির সেবা কার্যক্রম। এরপর থেকে গত দুই যুগে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দেশজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরায়ন খাতে ফাউন্ডেশনের একাধিক সেবাপ্রকল্প–যার মধ্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, মাতৃমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবানের লামায় শুরু হচ্ছে ফাউন্ডেশনের নতুন দুটি সেবা উদ্যোগ–প্রবীণ সেবা ও দাফন কার্যক্রম।

প্রবীণ সেবা কার্যক্রম

আজ যারা প্রবীণ, কর্মক্ষমতা হারিয়ে বয়সের ভারে ন্যুব্জ কিংবা চলৎশক্তিহীন, তাদের শ্রমে-ঘামে গড়ে উঠেছে আজকের সমাজ ও রাষ্ট্র। স্বভাবতই তাদের কাছে আমরা ঋণী। কিন্তু এদের অনেকেই নানা কারণে পার করছেন একাকী জীবন। অবহেলা আর প্রয়োজনীয় যত্ন ও মনোযোগের অভাবে কাটাচ্ছেন দুর্বিষহ সময়।

এ প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নিয়েছে লামার কোয়ান্টামমের চারপাশে যেসব প্রবীণ নারী-পুরুষ স্বাভাবিক যত্ন ও পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সেবাটুকু পৌঁছে দেয়ার।

দাফন কার্যক্রম

এ-ছাড়াও কোয়ান্টাম পরিবারের সক্রিয় সদস্যদের অনেকেই এখন ইচ্ছা প্রকাশ করছেন কোয়ান্টামমের জাবলে রাজিউন-এ সমাহিত হওয়ার। ফাউন্ডেশনও অন্তিম এ চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে সে সুযোগ করে দিতে চায় আগ্রহীদের।

আর উল্লিখিত দুটি সেবা উদ্যোগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন দক্ষ ও উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবক। তাই যারা কোয়ান্টিয়ার হিসেবে এ দুটো সেবা কার্যক্রমে অংশ নিতে চান, তারা সংশ্লিষ্ট সেন্টার-শাখা-সেলে নাম জমা দিন। সেবা ও পরার্থপরতায় বরকতময় হয়ে উঠুক আপনার জীবন।

পানিসম্পদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৭৩ তম পর্বে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। 'বাংলাদেশের পানিসম্পদ ॥ আমাদের করণীয়' বিষয়ে যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তারই নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে হবে

অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত

যেখানেই যাই না কেন আমাকে পানি নিয়ে কথা বলতে হয়। অবশ্য এতে আমারও আগ্রহের কমতি নেই। অন্য প্রসঙ্গ শুনতে চাইলেও কথা শেষ করি পানি দিয়ে। আজও আমি পানিসম্পদ বিষয়ে কথা বলব।

অনেকের প্রশ্ন–পানির অপচয় করা ঠিক নয়, তবুও কেন আমরা সচেতন হই না? কারণ আমরা ভুল ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকি। ধারণা পরিষ্কার হলে আমরা সচেতন হতে পারব। শুধু পানিই নয়, জলবায়ু, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ইকোসিস্টেম–সবকিছু সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বাড়বে।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে পানির পরিমাণ কিন্তু নির্দিষ্ট; অফুরন্ত নয়। এবার কল্পনা করি, পৃথিবীর সব পানি একটি বোতলে নেয়া হলো, যেখানে ১০০ চা-চামচ পরিমাণ পানি আছে। এখন পৃথিবীতে পানি বণ্টন করতে হলে ৯৭ ভাগ চলে যাবে সমুদ্রে। লবণাক্ততার কারণে যা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। বাকি রইল তিন চামচ পানি। এর অর্ধেক ভূগর্ভস্থ পানি। বাকি অর্ধেক ভূপৃষ্ঠের ওপরের পানি–প্রবহমান নদী ও স্থির ঝিল-পুকুর। হিসাব করলে দেখা যাবে, আমরা ব্যবহার করতে পারি মোট পানির মাত্র এক থেকে দেড় শতাংশ।

একজন অতি দরিদ্র মানুষের গল্প বলি। সে একসময় গ্রামে থাকত। তার গোসল করার প্রয়োজন হলে পুকুরে ডুব দিত। এতে কোনো পানি খরচ হতো না। পুকুরের পানি পুকুরেই থাকত। তার যেহেতু অভাব, সে শহরে এলো চাকরির সন্ধানে। নর্দমার পাড়ে একটি বস্তিতে উঠল। সেখানে পানির খুব অভাব, তাই তিন দিনে একবার সে গোসল করত। তারপর তার আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। বস্তির বাইরে টিনশেডের একটি ঘর ভাড়া নিল। গোসল করতে তার প্রয়োজন হতো এক থেকে দুই বালতি পানি। অবস্থা আরো ভালো হলো। তার বাথরুমে এখন শাওয়ার আছে। গোসল করতে যদি দুই বালতি পানি লাগে, অতিরিক্ত তিন বালতি পানি শাওয়ার দিয়ে ঝরঝর করে পড়ে যায়।

এ উদাহরণটি শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যে-কোনো শহর বা দেশের অবস্থাও একইরকম। একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত ভালো হবে সেখানে পানির চাহিদাও তত বাড়তে থাকবে।

সকালে বা রাতে দাঁত মাজার সময় কি আমরা খেয়াল করেছি–কল ছেড়ে কতটা পানি অপচয় করি? পুরুষেরা শেভ করার সময় প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই পানি বেশি খরচ করে। সারাদিনে একজন মানুষ হয়তো তিন লিটার পানি পান করছে, কিন্তু সে প্রতিবার টয়লেটে গিয়ে যখন ফ্লাশ করে, পাঁচ থেকে ছয় লিটারের মতো পানি একসাথে চলে যাচ্ছে। তাই প্রতিদিনের কাজকর্মে আমাদের সচেতন হতে হবে। এমনকি গ্লাসে পানি ঢালার সময়ও এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে–অপচয় যেন না হয়। পানি এতটাই মূল্যবান সম্পদ।

ভূগর্ভস্থ পানি আমাদের ব্যবহার্য পানির অন্যতম একটি উৎস। এটাকে আমরা নিরাপদ মনে করি। কারণ ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি চুঁইয়ে নিচে যায়, তখন ফিল্টার হয়। কিন্তু যতটা পানি নিচে যাচ্ছে তার চেয়ে যদি আমরা বেশি পাম্প করে ওপরে তুলি, তাহলে পানির স্তর আরো নেমে যাবে। ঢাকা শহরে তা-ই হয়েছে। পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। কাজেই ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করতে হলে দেখতে হবে, পানি তোলার জন্যে কতটা পুনর্ভরন হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত পুনর্ভরন কখনোই করা যাবে না।

গ্রাম-গঞ্জে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বসানো হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল। ফলে পানির স্তর সেখানেও নামতে শুরু করেছে। দিন দিন কমে যাচ্ছে পানির গুণগত মানও। বরেন্দ্র অঞ্চলে তো ভয়াবহ অবস্থা! বর্তমানে সেখানে আইন করে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে যেন নতুন কোনো ডিপ টিউবওয়েল বসানো না হয়।

এবার আসি নদী প্রসঙ্গে। নদীর পানির উৎস পাহাড়-পর্বত। পাহাড় থেকে বরফগলা পানি বা পাহাড়ি অঞ্চলে যে বৃষ্টি, সেটা নেমে নদী সৃষ্টি করে। পথে চলতে চলতে একটি নদী আরেকটির সাথে মিলে যায় এবং আকার বড় হতে থাকে। যেমন, মাওয়াতে যে পদ্মা নদীকে আমরা দেখি এটা লক্ষ নদীর সমাবেশের একটি রূপ। তাই প্রতিটি নদীর কিছু বিশেষত্ব আছে, তার গতিবিধিও অন্যদের চেয়ে আলাদা। একটির সাথে অন্যটি মেলে না। আমি বলি, নদী তার সত্তা নিয়ে আপন গতিতে বহমান। নিউজিল্যান্ড সরকার তাদের নদীগুলোকে মানুষের সম্মান দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মতোই নদীর আচরণকে কোনো সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলা যায় না।

৪০-৫০ বছর আগে এ দেশে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আমাদের বলা হতো মাছে-ভাতে বাঙালি। চুলায় চাল ফুটতে দিয়ে বাড়ির আশেপাশে ছোট খাল বা নালা থেকে কই, পুঁটি, বাইম এনে রান্না করা হতো। মাছ এতটাই সহজলভ্য ছিল তখন। এখন চিত্র পাল্টে গেছে। নদী তার নাব্যতা হারাচ্ছে। খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে মাছ তার বিচরণভূমি খুঁজে পাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হলো, যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা তখন হয় না কিন্তু অসময়ে প্রচুর বৃষ্টি।

কালবৈশাখী ঝড়ের নির্দিষ্ট সময় আছে, তখন মাছের প্রজননের উৎকৃষ্ট সময়। ডিম থেকে পোনা বের হওয়ার জন্যেও বৃষ্টি প্রয়োজন। ইকোসিস্টেম অনেকাংশেই বৃষ্টির ওপরে নির্ভরশীল। এমনকি ফুল ফোটাও নির্ভর করে বৃষ্টির ওপর।

আমাদের দেশ জোয়ার-ভাটার দেশ। এ নিয়ে তো ঐতিহাসিক ঘটনা আছে–মোঘলরা বাংলাদেশ কখনো দখল করতে পারে নি। সম্রাট আকবর তার ছেলেকে একবার পাঠালেন বাংলা দখল করতে। সেনাপতিসহ সম্রাটপুত্র বজরা নিয়ে রওনা হলেন। বাংলায় এসে পৌঁছলেন। বিকেলবেলা তিনি বজরায় বসে আছেন। বাতাস বইছে। চারদিকের সবুজ প্রকৃতি দেখে তার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনে মনে ভাবছেন, এই দেশ দখল করতে হবে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই লক্ষ করলেন, পানির প্রবাহ উল্টো দিকে! সেনাপতিকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সেনাপতি বলল, এখানকার নিয়মই এরকম–রাতে যেদিকে স্রোত থাকে সকালে তার বিপরীতে চলে যায়। সম্রাটের পুত্র নির্দেশ দিলেন, এখানে আর একমুহূর্তও না!

এই জোয়ার-ভাটা সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে। অন্য দেশের বিশেষজ্ঞ এখানে এসে ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না। তাই আমাদের উন্নয়ন আমাদের দেশের মানুষকেই করতে হবে। ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানি এবং বৃষ্টি–এই উৎস তিনটি সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে যেন এগুলো আমরা রক্ষা করতে পারি। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি নিয়ে কাজ করলে হবে না।

আমাদের দেশে এক টন মালামাল সড়ক পথে এক কিলোমিটার পরিবহন করতে খরচ হয় ছয় থেকে সাত টাকা। ট্রেনে হয় তিন টাকার মতো আর নৌপথে ৯০ থেকে ৯৫ পয়সা মাত্র। তাই অন্য দেশের সাথে আমাদের নদীর অববাহিকাভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে হবে। তাহলে নদীতে সারাবছর পানির পরিমাণ ঠিক থাকবে। নদীভাঙন হবে না। নদীপথে জাহাজ চলাচল বাড়বে।

প্রকৃতি চলে তার নিজস্ব নিয়মে। আমরা প্রকৃতির নিয়মের ব্যাঘাত ঘটাই। এজন্যেই সমস্যা দেখা দেয়। তবে আমরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং সমাধানগুলোও জেনেছি। তাই তরুণদের বলব, সচেতন হও। প্রকৃতিকে ভালবাসো। আর তোমাদের জ্ঞানের ভিত্তিটা শক্ত করো, এর বিকল্প কিছু নেই।

বিয়েতে অপচয় ও ঋণ যত বেশি সুখ ও স্থায়িত্ব তত কম

বিয়ে। জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সামাজিক বুননকে ভারসাম্যপূর্ণ আর সুসংহত করে রাখতেই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি মেনে চিরায়ত এক চুক্তি, এক বন্ধন। যুগ যুগ ধরে যা ছিল পরিবারের আপনজনদের নিয়ে ঘরোয়া এক আয়োজন, তা-ই এখন পরিণত হয়েছে অপচয় ও জৌলুসের রমরমা প্রদর্শনীতে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে পৃথক শিল্প পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। মানুষকে বিলাসবহুল বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনে উৎসাহিত করাই এর লক্ষ্য। চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপন এবং বিয়ের ম্যাগাজিনগুলো যতই বলুক–বিয়ের অনুষ্ঠান হতে হবে রূপকথার মতো শানশওকতে পূর্ণ ও আলো ঝলমলে, সমাজবিজ্ঞানী ও গবেষকরা কিন্তু বলছেন ভিন্ন কথা।

অপচয় ও ঋণ থেকে বাঁচুন কমবে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা

তিন হাজার দম্পতির ওপর পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল হলো, যে বিয়ের অনুষ্ঠানের বাজেট যত বড়, সেই দম্পতির সংসার জীবন তত সংক্ষিপ্ত। কল্পনাকে হার মানায় যেসব জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের উৎসব, তার অধিকাংশেরই করুণ পরিণতি ঘটে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

গবেষণাটি করেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসি-বিষয়ক অধ্যাপক এন্ড্রু ফ্র্যান্সিস-ট্যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হুগো এম মিঅ্যালন।

অনেকের সাধ–ঋণের অর্থে হলেও বিয়েতে করা চাই সব আয়োজন। এরপর সৃষ্টি হয় ঋণ পরিশোধের মাত্রাতিরিক্ত চাপ ও দুশ্চিন্তা, যা দাম্পত্য অশান্তি–এমনকি বিচ্ছেদের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।

অধ্যাপক এন্ড্রু ফ্র্যান্সিস-ট্যান ও অধ্যাপক হুগো এম মিঅ্যালন-এর মতে, গত ৫০ বছরে বিশ্বজুড়ে বিয়ে-কেন্দ্রিক যে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে তার মূল কথাই হলো 'ব্যয় করো আর ব্যয় করো'।

১৯৫৯ সালে আমেরিকান ম্যাগাজিন *ব্রাইডস*-এর মতে, বিয়ের আগে দুমাসের প্রস্তুতিই ছিল যথেষ্ট। ৯০-এর দশকে এই বাস্তবতা বদলে গেল–১২ মাসের একটানা প্রস্তুতিও যেন মনের মতো অনুষ্ঠানের জন্যে আর যথেষ্ট নয়।

হীরার আংটি = চিরদিনের অশান্তি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পাশ্চাত্যে মাত্র ১০% বিয়েতে হীরার আংটির দেখা মিলত। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে *ডি বিয়ার্স* নামক হীরা কোম্পানি স্লোগান চালু করে 'ডায়মন্ড ইজ ফরএভার' বা 'হীরা চিরদিনের'। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় বিয়েতে হীরার আংটি দেয়ার চল।

২০১২ সালে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে উপলক্ষে হীরার আংটি বিক্রি হয়েছে সাত বিলিয়ন ডলার বা ৫৯ হাজার পাঁচশ কোটি টাকা মূল্যমানের। সময় যত গড়িয়েছে, সারা বিশ্বে বহুজাতিক কোম্পানির বাহারি বিজ্ঞাপনগুলো মানুষের মনে এ ধারণাই পোক্ত করেছে–হীরা ছাড়া বিয়ে পরিপূর্ণ হয় না বা হীরা বিয়ের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করে।

অথচ এস্ট্রলজি গবেষণার ফলাফল হলো, ৯৫% বিয়েতে হীরকের প্রভাব অশুভ। প্রতিটি পাথরের কিছু দ্রব্যগুণ থাকে যা ব্যক্তির মানসিকতা ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে। হীরকের মনোদৈহিক প্রভাব হলো, তা অহম বৃদ্ধি করে এবং পারস্পরিক সমমর্মিতা ও সমঝোতার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এর প্রমাণ–পাশ্চাত্যে বিয়েতে হীরার আংটি অপরিহার্য এবং সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি।

বিয়ে ॥ সামাজিকতার নামে যত অবিদ্যা

আমাদের দেশেও বিয়ের সামাজিকতা এতটাই অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে উঠেছে যে, শুধু একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে পান-চিনি/ এনগেজমেন্ট, আক্দ, মেহেদী ও সংগীত, দুটো গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌ-ভাত ইত্যাদি নামে কমপক্ষে সাত-আটটি অনুষ্ঠানের আয়োজন যেন বাধ্যতামূলক। যার সামর্থ্য নেই, তাকেও ধারকর্জ করে জোগাতে হয় এসব অনুষ্ঠানের অর্থ।

পোশাক, অলংকার, কমিউনিটি সেন্টার, খাবার, প্রি-ওয়েডিং পোস্ট ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, অন্দরসজ্জা–সবকিছুরই মূল্য ঊর্ধ্বমুখী। কারণ মানুষের চাহিদা বাড়ছে, যুক্ত হচ্ছে নানারকম ফরমায়েশ। সমাজে মুখ রক্ষার জন্যে ব্যাংক ঋণ নিতেও কারো আপত্তি নেই।

হালে যোগ হয়েছে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। অতিথিদের নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে মনোরম কোনো স্থানে গিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। এজন্যে কোটি টাকাও খরচ করতে পিছপা হচ্ছে না উৎসাহীরা। চারপাশে দেখা যে-কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে যেতে পরিবারগুলো যেন আজ উঠে পড়ে লেগেছে। ফলে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে শুভ একটি কাজের সূচনা হচ্ছে অপচয় অথবা ঋণ ও কিস্তির মতো অভিশাপের মধ্য দিয়ে।

নায়ক-নায়িকা ও ধনকুবেরদের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখে সবাই প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না, সেলিব্রিটিদের এসব উৎসব-আয়োজন এক ধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, যার আড়ালে থাকে পণ্যের প্রচার।

বিয়ের খরচ সীমিত হলো উজবেকিস্তানে

২০১৮ সালে উজবেকিস্তান সরকার সে-দেশে আইন করে বিয়েতে অতিরিক্ত খরচে নিষেধাজ্ঞা এনেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ১৫০ জনের বেশি অতিথিকে দাওয়াত দেয়া যাবে না। বিয়ের বহরে তিনটির বেশি দামি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

রয়টার্স-এর মতে, সেখানে বিয়ের সময় মধ্যবিত্ত একটি পরিবার প্রায় ২০ হাজার ডলারের মতো খরচ করে, যেখানে দেশটির গড় আয় ১০০-৩০০ ডলার মাত্র। বিয়ের অতিরিক্ত খরচ সাধারণত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের থেকে ধার হিসেবে নেয়া হয়। এই ঋণের টাকা পুরো পরিবার বছর জুড়ে পরিশোধ করে।

দেশটির প্রেসিডেন্ট শাভাকত মিরজোয়েভ উচ্চাভিলাসী বিয়েকে তিরস্কার করে বলেন, 'বিয়ে-সংক্রান্ত ঋণের এ অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে পরিবারের পঞ্চাশোর্ধ অনেকেরই মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের কারণে।'

প্রয়োজন ও প্রদর্শনীর মধ্যে পার্থক্য করতে শিখুন

পরিবার গঠন ও পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারের আনুষ্ঠানিক রূপই হলো বিয়ে। তাই বিয়েতে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবার-পরিজনের উপস্থিতি, শুভ কামনা ও দোয়া বন্ধনকে দৃঢ় করে।

যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী চার্লস কেসলার-এর মতে, সেই অঙ্গীকারই সুদৃঢ় যা মানুষ জনসমক্ষে উচ্চারণ করতে পারে। আমরা যখন অনেকের মাঝে কোনো প্রতিজ্ঞা করি বা সিদ্ধান্তের কথা জানাই, তা আমাদের দায়িত্ববোধ বাড়ায় এবং লেগে থাকার সামর্থ্য জোগায়।

তবে প্রয়োজন ও প্রদর্শনীর মধ্যে পার্থক্য করতে জানতে হবে। সামাজিকতা ও ঐতিহ্যের নামে ভোগবাদী পণ্যদাসত্বের স্রোতে গা ভাসালে তা শুধু দুর্দশাই বয়ে আনবে।

করণীয়

- উভয়পক্ষ মিলে বিয়েতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন।
- বিয়ের অনুষ্ঠানকে ফটোগ্রাফারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখুন। একে ফটোগ্রাফি, ভিডিও ও সেলফিসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত করবেন না।
- আত্মীয়স্বজন ও অতিথিদের সাথে কুশল বিনিময়ে আন্তরিক হোন। সব শ্রেণির অতিথিকে একই ব্যবস্থাপনায় খাবার পরিবেশন করুন।
- খাবারসহ সবরকম অপচয় সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিয়ে ও এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে গিফট দেবেন না, নেবেনও না। আনন্দিতচিত্তে যাবেন, তৃপ্তি নিয়ে খাবেন এবং প্রাণভরে দোয়া করবেন।

সচেতন হোন

মিডিয়া ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিকতাকে তুলে ধরে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে। বিয়েকে চিত্রিত করে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, বিয়ের আরেক নাম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পরিবারের প্রতি, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি এবং সমাজের প্রতি।

মনে রাখবেন, বিয়ের অনুষ্ঠান হলো দায়িত্বপূর্ণ দীর্ঘ যাত্রার প্রথমদিন। তাই অহেতুক ঠাটবাট দেখিয়ে একে অপরের সম্পর্কে অযৌক্তিক প্রত্যাশা তৈরি করবেন না। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে থাকুক সততা ও দায়িত্ব-সচেতনতার ছাপ। ঋণ ও অপচয়ের ফাঁদ থেকে বাঁচুক প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি পরিবার।

তথ্যসূত্র : বিবিসি নিউজ ১৬ মার্চ ২০১৮
হাফিংটন পোস্ট ২১ ডিসেম্বর ২০১৪
সাইকোলজি টুডে ১ ডিসেম্বর ২০১৪
হাজারো প্রশ্নের জবাব পর্ব ৩ ॥ প্রেম-বিয়ে-পরিবার

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

এ কোর্সের শিক্ষা জীবনের অনন্য অর্জন

শায়লা রহমান তিথি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাকে যা দিয়েছে তা আমার জীবনের এক অনন্য অর্জন। কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম। আমার ছোট ভাই কয়েক বছর আগে এ কোর্স করেছিল। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে সে তার পেশা ও ব্যক্তিজীবনে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছে। কোয়ান্টামের প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস দেখে খুব অবাক হতাম।

১৩ বছর ধরে আমি মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছি। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে কোনো ওষুধে কাজ হতো না। একবার ব্যথা শুরু হলে টানা কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হতো। এর সাথে ছিল ঘুমের সমস্যা। উচ্চমাত্রার ওষুধ খেয়েও ঘুম হতো না। ঘুম হতো না বলে আবার মাথাব্যথা। এর ফলে হতাশা, বিষাদ আর নানা দৈহিক জটিলতায় ভুগছিলাম।

কলকাতার ডাক্তার বললেন, আপনি একজীবনে অনেক ওষুধ খেয়ে ফেলেছেন। এখন ওষুধ বাদ দিন, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনযাপন বদলান। সে-দেশে দেখেছি খোলা মাঠে বহু মানুষ একসাথে বসে মেডিটেশন করছে। আমার এত ভালো লাগল দেখে!

এরপর এ কোর্সে এলাম। প্রথমদিন বাসায় ফিরেই ঘুমের ওষুধ ফেলে দিলাম। গত তিন রাত আমার খুব ভালো ঘুম হয়েছে। গুরুজীর আলোচনা শুনে বিশ্বাস হচ্ছিল যে, আমার ঘুম হবেই। তাছাড়া আমার মাথাব্যথাও নেই।

[সাংবাদিক ও শিশু সাময়িকী 'ঝুমঝুমি'-র সম্পাদক। ৪৬৩ ব্যাচ]

মনে হচ্ছে জীবন অপ্রতিরোধ্য

সৈয়দ দারুল ইসলাম

১০ বছর ধরে আমার কোমর ও মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা। পাইলসের সমস্যা ও ব্যথার কারণে আমার দুবার অপারেশন করতে হয়েছে। একবার চেয়ারে বসলে সহজে উঠতে পারতাম না। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোনো ওষুধ আমাকে সুস্থ করতে পারে নি। আমার জীবন থেকে সকল আনন্দ হারিয়ে গিয়েছিল।

কোর্সে এসে মেডিটেশন করে দ্বিতীয় দিন থেকে আমার কোমরে কোনো ব্যথা নেই। এখানে এসে আমার মনে হয়েছে–জীবন অপ্রতিরোধ্য। জীবন মানে সফলতা আর আনন্দ। গুরুজী আমাদের সফল হওয়ার পথটিই দেখিয়ে দিয়েছেন। কোয়ান্টামের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

[ব্যবসায়ী। ৪৬২ ব্যাচ]

শিখেছি কীভাবে ইতিবাচক কথা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করা যায়

ডা. রুকসানা কবির

চিকিৎসক হিসেবে কোন বিষয়ে আমি ক্যারিয়ার গড়ব, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। আমার বড় কোনো লক্ষ্যও ছিল না। কোর্সের আলোচনা শুনে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি। মেডিটেশন করে আমার মনছবি সুস্পষ্ট হয়েছে।

মেডিকেল কলেজে আমরা রোগ সম্পর্কে পড়ি, রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে জানি। কিন্তু রোগীর ওপর ডাক্তারের নেতিবাচক কথার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কীভাবে ইতিবাচক কথা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলা যায়, এ নিয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদের নেই। এই শিক্ষাই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে পেয়েছি।

[মেডিকেল অফিসার, সার্জিস্কোপ ফার্টিলিটি সেন্টার, চট্টগ্রাম। ৪৬৩ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছি

মাহমুদা আক্তার

এবছর আমার আট জন আত্মীয় মারা গেছেন। একেকটা মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার মনে হতো, খুব তাড়াতাড়ি আমিও মারা যাব। অন্যের অসুখ হলে আমি ভয় পেতাম এবং মনে হতো, সেই রোগের সব লক্ষণই যেন আমার মাঝে আছে। সবকিছু নিয়েই আমার ভয় কাজ করত।

এ-ছাড়াও আমার সর্দি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল। পানি ধরলেই ঠান্ডা লাগত। আমার তিন বছরের সন্তানের যত্ন ঠিকভাবে নিতে পারতাম না। সংসারের কাজ করতে পারতাম না। ওষুধনির্ভর জীবন ছিল আমার। মনে হতো, আমার মতো অকেজো মানুষ পরিবারের জন্যে বোঝা। অসুস্থতার জন্যে বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় সময় কাটছিল।

কোর্সে এসে আমি মৃত্যুভয়কে জয় করতে পেরেছি। এখানে দমচর্চা ও মেডিটেশন করে আমি ভালো আছি। এখন মনে হচ্ছে, নতুন জীবন পেয়েছি। ছোটবেলায় মায়ের কাছে যেরকম নিরাপদ বোধ করতাম, কোর্সে এসে আমি একইরকম নিরাপত্তা অনুভব করছি। এ চার দিনে আমি বেঁচে থাকার প্রেরণা পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে আমি আরো ভালো থাকব।

[গৃহিণী। ৪৬২ ব্যাচ]

অশান্তির বিপরীতে শান্তির বিপ্লব ঘটিয়েছে কোয়ান্টাম

মো. জহিরুল ইসলাম

কোয়ান্টাম মেথড বইটি আমি পড়ি ১৯৯৩ সালে। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। সে-সময় আমি কোর্সটি করতে পারি নি। পরবর্তীতে ক্যাসেট সংগ্রহ করে আমি মেডিটেশন চর্চা শুরু করি। আমার আজকের যে অর্জন, তার প্রস্তুতি নিতে মেডিটেশন আমাকে সাহায্য করেছে। কাজের সাথে মিশে যাওয়ার জন্যে প্রতিটি মানুষের মেডিটেশন চর্চা করা প্রয়োজন।

২০০৬ সালে আমি জাতিসংঘে কাজ করার সুযোগ পাই। কিন্তু সে-বছরই একটি দুর্ঘটনায় আমার পায়ের লিগামেন্টে সমস্যা দেখা দেয়। কর্মসূত্রে আমাকে বিদেশ চলে যেতে হয় এবং সেখানে ডাক্তার আমার রিপোর্ট দেখে বললেন, ব্যথা ভালো হলেও আমার পা কখনোই আগের মতো ভাঁজ করতে পারব না। কিন্তু আমি মেডিটেশনে সুস্থতার মনছবি দেখতে থাকি। সুস্থ হবো–এই বিশ্বাস আমার ছিল। মাস ছয়েক পর আমার পা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়।

আমার স্ত্রী আগেই এ কোর্সে অংশ নিয়েছেন। এরপর থেকে আমাদের দুজনের বোঝাপড়া বেশ ভালো। চার দিন ক্লাস করে আমার উপলব্ধি–প্রশান্তি এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ হলো মেডিটেশন বা ধ্যান। বাংলাদেশে তরুণদের মাঝে অশান্তির বিপরীতে শান্তির বিপ্লব ঘটিয়েছে কোয়ান্টাম। তরুণরাই ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবে এবং আমাদের দেশ এ ধ্যানচর্চার সুফল একদিন অবশ্যই পাবে।

[মানবাধিকার কর্মকর্তা, জাতিসংঘ। ৪৬২ ব্যাচ]

আমার দেশকে নিয়ে আমি এখন গর্ববোধ করছি

আফফান মাহবুব

আমি স্মার্টফোনে গেম খেলতাম। ইউটিউব ও নেটফ্লিক্স দেখতাম। এগুলো কীভাবে আমার ক্ষতি করবে তা আমি বুঝতে পারতাম না। টিভি দেখতে না পারলে আমার ভালো লাগত না। কিন্তু এখন আমি জানি, জীবনে বড় হতে হলে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট থেকে আমাকে দূরে থাকতে হবে। কোয়ান্টামে এসে আমি ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

আগে মনে হতো, আমি রোজগার করি না। তাহলে কীভাবে দান করব? কিন্তু কোয়ান্টামে এসে জানলাম, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, অন্যকে সাহায্য করাটাও দান। গুরুজীর আলোচনা শুনে নিজের দেশকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। আমি মনছবি তৈরি করেছি এবং আমার বিশ্বাস, আমি তা অর্জন করতে পারব।

[শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিল্লি পাবলিক স্কুল, ঢাকা। ৪৬৩ ব্যাচ]

কোরআন ও হাদীসের সাথে কোর্সের বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক

মওলানা মো. সাকিব আল হাসান

আমার পরিচিত যারাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে আমি ইতিবাচক অনেক পরিবর্তন দেখেছি। এ কারণে আমি নিজেও কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এখানে এসে আমার উপলব্ধি হলো– গুরুজীর প্রতিটি আলোচনা কোরআন ও হাদীসের সাথে প্রাসঙ্গিক। আমি দীর্ঘদিন ধর্ম-বিষয়ক বয়ান করেছি, ওয়াজ করেছি, জুমার নামাজ পড়িয়েছি। কিন্তু নামাজে মনোযোগ ধরে রাখার বাস্তবসম্মত কৌশল আমি জানতে পেরেছি কোর্সে এসে। মেডিটেশন করে এখন আমার নামাজের অনুভূতি অন্য সময়ের চেয়ে আলাদা।

কোর্সের আলোচনা শুনে আমি সোশ্যাল মিডিয়া ও স্মার্টফোনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। এ চার দিন আমি মোবাইল ফোন বন্ধ করে ক্লাস করেছি। স্মার্টফোনের প্রতি এখন আমার অনীহা কাজ করছে। মনে হচ্ছে, কেন আরো আগে আমি কোর্স করতে এলাম না!

[ইমাম, কাশিমপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, রাজশাহী। ৪৬২ ব্যাচ]

শিক্ষার্থীদের মাঝে কোয়ান্টামের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে চাই

মাধবী দাস

একমাত্র সন্তানকে নিয়ে আমি সবসময় টেনশন করতাম। ক্ষতিকর সঙ্গ এবং অসহিষ্ণু অস্থির পরিবেশের কারণে এক ধরনের শঙ্কা কাজ করত আমার ভেতর। এ-ছাড়াও কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লে আমি দিশেহারা বোধ করতাম। জীবনে সিদ্ধান্তহীনতার কারণে আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এ সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ছোট ভাইয়ের পরামর্শে কোয়ান্টামে কাউন্সেলিং সেবা নিয়েছিলাম আমি। তখনই কোর্স করার সিদ্ধান্ত নিই। কোর্সে এসে আমার অস্থিরতা কমেছে। আমি আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছি। মনে হচ্ছে, যে-কোনো পরিস্থিতিতে আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

১৭ বছর আগে আমি পায়ে আঘাত পেয়েছিলাম। পায়ের ব্যথার জন্যে এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারতাম না। কিন্তু এ চার দিন একটানা বসে থেকেও আমি কোনো ব্যথা অনুভব করি নি।

একজন শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি, ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করতে হবে। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে কোয়ান্টামের ইতিবাচক কথাগুলো আমি ছড়িয়ে দিতে চাই। তাহলে তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে।

[সিনিয়র শিক্ষক, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। ৪৬৩ ব্যাচ]

যা শিখলাম তা সারাজীবনের জন্যে অনুসরণীয়

নির্ঝর চৌধুরী

২০১৫ সালে আমার বাবার ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ে। পরবর্তীতে তার মস্তিষ্কে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে। বাবাকে ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখাটা খুবই কষ্টদায়ক ছিল আমার জন্যে। তিনি চলে গেলে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়ি। কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা গেল, আমি কাজের মাঝপথে হাল ছেড়ে দিচ্ছি। অথচ আমি বরাবরই জীবনের প্রতি ইতিবাচক ছিলাম, কাজ ভালবাসতাম।

কোয়ান্টামে এসে আমি বিস্মিত হয়েছি। শুধু ইতিবাচক কথা দিয়ে মন নিয়ন্ত্রণ করা যায়, মস্তিষ্ককে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায়–তা চার দিনের ক্লাস করে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমার এসিডিটির সমস্যা ছিল। কিন্তু মেডিটেশন করে এ সমস্যা আর অনুভব করছি না। এ কোর্সে আমরা যা শিখলাম, তা সারাজীবনের জন্যে অনুসরণীয়। আমি বিশ্বাস করি, আমরা প্রত্যেকে যদি ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি লালন করতে পারি, তাহলে পুরো পৃথিবী বদলে দেয়া সম্ভব।

[সঙ্গীতশিল্পী, হেড অব প্রোগ্রাম, রেডিও ৭১। ৪৬৩ ব্যাচ]

রাগ নিয়ন্ত্রণের মন্ত্র পেয়েছি কোর্সে এসে

জাবির হোসেন

অল্পতেই আমি রেগে যেতাম। রেগে গেলে আমার মাথার তালু জ্বলত, ঘাড় ব্যথা করত। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতাম না। একপর্যায়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমার উচ্চ রক্তচাপ হয়েছে এবং সারাজীবন ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে।

আমার সমস্যার কথা শুনে আমার বড় ভাই আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করতে বললেন। তিনি ২০০৭ থেকে আমাকে কোর্স করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন। এবার কিছুটা বিরক্ত হয়েই আমি ঢাকায় এলাম। কোর্সে এসে সুস্থ হওয়ার আশা পেলাম। প্রথমদিন মেডিটেশনে জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক কল্পনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। রাতে লক্ষ করলাম, সারাদিনে আমার ঘাড় ব্যথা করে নি। মাথার তালুতেও কোনো যন্ত্রণা নেই।

রাগের আলোচনায় গুরুজী বললেন–রাগ পুরুষ বা স্ত্রীর ভূষণ নয়, রাগ হচ্ছে পশুর ভূষণ। একথা শুনে নিজের আচরণের জন্যে অনুশোচনা হলো। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আর রাগ করব না। কোর্সে এসে আমি রাগ নিয়ন্ত্রণের মন্ত্র পেয়েছি।

[প্রধান শিক্ষক, অক্সফোর্ড মডেল স্কুল, চাঁদপুর। ৪৬২ ব্যাচ]

সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস পেয়েছি

ফারহানা আক্তার

২০১৭ সালে আমার এলার্জির সমস্যা ধরা পড়ে। ডাক্তার আমাকে হাত পরিষ্কার রাখার পরামর্শ দিলেন। বার বার হাত ধোয়ার অভ্যাস তখন থেকেই। লক্ষ করলাম, আমি অনেক সময় নিয়ে হাত ধুচ্ছি। ২০১৮ সালে বুঝতে পারলাম, আমি শুচিবায়ু রোগে ভুগছি। খেতে পারতাম না, মনে হতো খাবারে ময়লা। টয়লেট যাওয়ার ভয়ে পানি পান করতাম না। জিনিসপত্র কাউকে ধরতে দিতাম না। অন্যের কোনোকিছুও স্পর্শ করতাম না। সবার প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল।

একবার রিকশা থেকে আমার ছোট ভাই পড়ে গেল। আমি পাশেই বসে ছিলাম, কিন্তু স্পর্শ করার ভয়ে তাকে ধরি নি। অথচ ভাইকে আমি খুব স্নেহ করি।

কোর্সে আসার আগে আমি চার দিন চার রাত বাথরুমে ছিলাম। নিজের সব জিনিসপত্র ধুয়েছি কিন্তু মনে হচ্ছিল ভালোভাবে পরিষ্কার হচ্ছে না। ভাবতাম, আমি পাগল হয়ে গেছি। আর কোনোদিন ভালো হবো না। মরে যেতে ইচ্ছা করত। আমাকে দেখে আমার পরিবারের মানুষগুলোও কষ্ট পেত।

কোর্সে প্রথমদিন জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলাম যাতে কারো স্পর্শ না লাগে। গুরুজী আলোচনায় বললেন– সবসময় বলুন, আমি পারি আমি করব! একথা শুনে এবং মেডিটেশন করে আমি ইতিবাচক চিন্তা করতে পারছি। এখন কোনোকিছু স্পর্শ করতে সমস্যা হচ্ছে না। খেতেও পারছি। বিশ্বাস এসেছে, আমার পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব। এটা আমার জন্যে বিশাল প্রাপ্তি।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। ৪৬২ ব্যাচ]

শরতের আকাশের মতো ঝকঝকে মনে হচ্ছে নিজেকে

রোকসানা পারভীন

এসএসসি পরীক্ষার পর পারিবারিকভাবে আমার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সংসার, দুই সন্তান নিয়ে আমি পড়াশোনা চালিয়ে গেছি। সম্প্রতি বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ায় মানসিকভাবে দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছিলাম আমি। সংসার, অফিস কোনোকিছুই ভালো লাগত না। সবসময় আমার অস্থির লাগত। যত সময় গড়াচ্ছিল, জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছিলাম।

মনের ক্যানভাসে নতুন করে মনছবি আঁকব বলে কোর্সে অংশ নিয়েছি। কোর্স শেষে উপলব্ধি করলাম, মনের সব কালো মেঘ ধুয়ে গেছে। শরতের আকাশের মতো ঝকঝকে মনে হচ্ছে নিজেকে। আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। লক্ষ্যের জন্যে নিরলস কাজ করার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছি।

[ক্যাশ অফিসার, ডাচ বাংলা ব্যাংক লি., নরসিংদী। ৪৬২ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *মাটির ব্যাংকে টাকা জমা করে আমরা এতিমদের সাহায্য করছি। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা এই সাহায্য পাচ্ছে, তাদের মধ্যে মুসলমান কয়জন? আমরা কি মুসলমান এতিমদের সাহায্যে দানের পুরো অর্থটা ব্যয় করতে পারি না?*

উত্তর : নবীজী (স) এবং পরবর্তীতে ইসলামের মনীষী যারা এসেছেন, তাদের জীবন ও কর্মে এমন সংকীর্ণতার পরিচয় কোথাও নেই। কোরআনে এতিম মিসকিনদের সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। কোথাও মুসলিম এতিম, মুসলিম মিসকিনের কথা বলা হয় নি। যাকাত, সদকা, দান–সবক্ষেত্রেই তা-ই।

মনে রাখবেন, আল্লাহর রসুল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার শিক্ষা হলো মানুষের কল্যাণ করো, সেটা ধর্মশ্রেণিগোত্র নির্বিশেষে। খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ওমর (রা) বলেছেন, 'ফোরাত নদীর কূলে একটি বিড়ালও যদি না খেয়ে মারা যায় আমি ওমরকে এজন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

আর নবীজীর (স) জীবনে আমরা দেখি–যার যখন অভাব, যার যা প্রয়োজন তাকে তিনি সেভাবে সাহায্য করেছেন। ধর্মের পার্থক্য কখনোই দান ও সেবার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। অতএব সবসময় মনটাকে বড় করবেন। কোরআন এবং হাদীসের শিক্ষাকে অনুসরণ করবেন। সংকীর্ণ চিন্তাচেতনার প্রশ্রয় দেবেন না। তাহলেই আপনি সত্যিকারের মুসলমান হতে পারবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, আমরা জানার চেষ্টা করি না। কোনোকিছুর গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি না।

একজন মুসলমান হিসেবে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কোরআনে নবীজীকে (স) অভিহিত করা হয়েছে রহমাতুল্লিল আলামিন অর্থাৎ তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্যে করুণাস্বরূপ। তাঁকে রহমাতুল্লিল মুসলিমিন বলা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আমরাও যখন আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসতে পারব, তখনই নবীজীর (স) সত্যিকার অনুসারী হতে পারব।

নবীজীর (স) পরবর্তীকালে ইসলামের ইমামদের জীবনেও আমরা একই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ ও চর্চা দেখতে পাই। ইমাম আবু হানিফার কথাই ধরি। তিনি তখন বসরায় থাকতেন এবং তার এক প্রতিবেশী ছিল খ্রিষ্টান মুচি। প্রায় রাতেই সে মদ খেয়ে বউ পেটাত। বউয়ের চিৎকার কান্নাকাটি সব মিলে রীতিমতো হৈ-হল্লা। বিরক্ত হয়ে প্রতিবেশীরা ভাবল, ইমাম সাহেব যখন আছেন এই মহল্লাতে, তার কাছে গিয়েই আমরা নালিশ করি। প্রতিবেশীদের নালিশ শুনে ইমাম আবু হানিফা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তাকে বলে দেবো।

ইমাম সাহেব মুচিকে ডেকে বললেন, দেখ, মদ খেয়ে মাতলামি করা, বউ-পেটানো, এগুলো ঠিক নয়। এটা করবে না কখনো। মুচিও বলল, হুজুর, আর কোনোদিন করব না। কিন্তু দেখা গেল রাতে আবার সেই একই অবস্থা। কারণ মাতাল ও মাদকাসক্তরা নেশার ঘোরে কতটা অমানুষ হয়ে ওঠে, সেটা তারা বোঝে নেশা কেটে যাওয়ার পর।

এদিকে প্রতিবেশীরা দেখল, ইমাম সাহেবকে বলে তো কোনো লাভ হলো না। তারা বসরার গভর্নরের কাছে গিয়ে নালিশ করল। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ এসে মুচিকে ধরে নিয়ে গেল।

ইমাম সাহেব এর কিছুই জানেন না। পরদিন ভোরবেলা যখন তিনি ফজরের নামাজ পড়তে যাচ্ছেন, শুনলেন মুচির বাড়ি থেকে মহিলার কান্নার শব্দ আসছে। ইমাম সাহেব থামলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

ইমাম সাহেবের গলা শুনে মুচির বউ ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। একেবারে পায়ে পড়ে বলল, হুজুর, আমার স্বামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ঘরে খাবার কিছু নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি এখন কী করি? ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে তুমি ঘরে যাও, আমি দেখছি কী করা যায়।

ইমাম আবু হানিফা যাচ্ছিলেন মসজিদে। মসজিদে না গিয়ে তিনি তখন বাসায় ফিরে এলেন। তার সহধর্মিণীকে বললেন, আমাদের প্রতিবেশী যে মুচি, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তার ঘরে কোনো খাবার নেই। ওদের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করো। এই বলে তিনি মসজিদে চলে গেলেন। নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরে খাবার পাঠিয়ে দিলেন মুচির ঘরে। তারপর যখন সকাল হলো, তিনি গেলেন বসরার গভর্নরের দরবারে।

ইতঃপূর্বে বাগদাদের খলিফা তাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কাজিউল কুজ্জাত বা প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা যেহেতু খলিফার অধীনে ন্যায়বিচার করতে পারবেন না, তাই তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি এবং এজন্যে তাকে পরবর্তীকালে অনেক ভোগান্তি সহ্য করার পর জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। যিনি প্রধান বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই তিনিই এবার নিজে থেকে বসরার গভর্নরের দরবারে গেলেন। কেন? কারণ তার প্রতিবেশী মুচির পরিবার অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে!

গভর্নর তো তাকে দেখেই আসন ছেড়ে পড়ি-মরি করে ছুটে এলেন–'হুজুর! আপনি এসেছেন আমার দরবারে, আমাকে তো ডাকলে পারতেন।' কারণ এর আগে কয়েকবার তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি আসেন নি।

ইমাম সাহেব বললেন, দেখ, আমি নিজের জন্যে আসি নি। আমার এক প্রতিবেশী মুচি, তাকে তোমার পুলিশ ধরে নিয়ে এসেছে। সে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে মারপিট হট্টগোল করে ঠিক, কিন্তু এখন তার বাড়িতে খাবার নেই। তার স্ত্রী-সন্তানেরা না খেয়ে আছে। এখন হয় তাকে ছেড়ে দাও, না হয় তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।

বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন! এত বড় একজন ইমাম। যাকে এর আগে আমন্ত্রণ জানানোর পরও তিনি কখনো গভর্নরের দরবারে যান নি, সেই তিনিই ওখানে গেছেন এক খ্রিষ্টান মাতাল মুচির ব্যাপারে সুপারিশ করতে!

আর সেই ইমামের অনুসারী হয়ে এই একবিংশ শতাব্দীতে বসে আমরা যদি চিন্তা করি–এতিম কি হিন্দু, বৌদ্ধ নাকি মুসলমান–তাহলে এটা আমাদের সংকীর্ণতা ছাড়া আর কী? এই সংকীর্ণতাই নানারকম হানাহানির জন্ম দেয়।

অতএব দান করবেন সবসময় মুক্তমনে। এটাই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের শিক্ষা। আর শুকরিয়া আদায় করবেন যে, ধর্মগোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রশ্ন : *মাত্র গ্রাজুয়েশন শেষ করলাম। একজন সফল ব্যবসায়ী হতে চাই। কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই। কীসের বা কীভাবে ব্যবসা করব, বুঝে উঠতে পারছি না। পরামর্শ দেবেন।*

উত্তর : ব্যবসা নিয়ে রোমান্টিসিজমে ভুগবেন না। ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকুন। কীভাবে লোকজন ব্যবসা করে সেটা দেখুন তিন মাস। তারপর চিন্তা করুন, বাস্তবে ফুটপাত থেকে অর্থাৎ ছোট থেকে কীভাবে শুরু করতে পারেন। তাহলে আপনি পারবেন। আর বাবার টাকা নিয়ে যদি ব্যবসা শুরু করেন, কিছুদিন পরে আপনার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ প্রতিটি ব্যবসার কিছু গোমর আছে, আগে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। তবেই আপনি ব্যবসায় সফল হবেন।

আর বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সবসময় ছোট ছোট উদ্যোগ দিয়ে শুরু করতে হয়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আমরা শুরু করেছিলাম সাড়ে ১০ ফিট বাই সাড়ে ১২ ফিটের ছোট্ট একটা রুম থেকে। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমাদের সব কার্যক্রমের পরিসর বেড়েছে। আসলে তা-ই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, শূন্য থেকে শুরু করে যে কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন : *আমার মা আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমার ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলেন। আমাকে বলেন–'ফেল করবি'। তাই আমি সবসময় ফেল করি। এ থেকে বাঁচার উপায় কী?*

উত্তর : মা-বাবা সম্পর্কে কোনো রাগ অভিমান ক্ষোভ পুষে রাখবেন না। আর মা হয়তো রাগের মাথায় বলছেন 'ফেল করবি', কিন্তু সেজন্যেই যে আপনি ফেল করেন, তা নয়; বরং ভেবে দেখুন–পরীক্ষার আগে যথাযথ প্রস্তুতি আপনার হয় নি বলে আপনি ফেল করেন কিনা।

তাই এখন থেকে আপনার কাজ হচ্ছে এরকম পরিস্থিতিতে ইতিবাচক থাকা এবং পড়াশোনায় আরো বেশি মনোযোগী হওয়া। আপনি আপনার মাকে পরিবর্তন করতে পারবেন না, কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেন। কারণ অন্যকে বদলানো যায় না, বদলাতে হয় নিজেকে।

অতএব যখনই আপনার মা কোনো নেতিবাচক কথা বলবেন, আপনি মনে মনে তওবা তওবা বলুন। একে মায়ের দোয়া বলে মনে করুন। মিষ্টি হেসে মাকে বলুন, মা! তুমি দোয়া করো, যাতে আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি।

এ মাসের অটোসাজেশন

সেবার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা থেকে আমি বিরত থাকব। যখন যার প্রয়োজন তার সেবা করব।

শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

রক্তদানের মতো মানবিক উদ্যোগ আমাদের আশাবাদী করে

১৪৯ তম শত আজীবন রক্তদাতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব কবির বিন আনোয়ার

বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সামাজিকতা এবং ভালবাসার বন্ধন হারিয়ে যাচ্ছে। এটাকে পুনর্জাগরণের চেষ্টাও তারা শুরু করেছে। এজন্যে তারা বিলিয়ন ডলার খরচ করছে। অথচ আমাদের দেশের মানুষের সেবা করার মানসিকতা বরাবরই ছিল, এখনো আছে। স্বেচ্ছা রক্তদাতারা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষ করে যখন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের মতো মানবিক উদ্যোগ দেখি তখন খুব আশা জাগে। এ কার্যক্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই।

২০ অক্টোবর ফাউন্ডেশন আয়োজিত শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৪৯ তম আয়োজনে রক্তাদাতাদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার। এ আয়োজনে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ সেপ্টেম্বর শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৪৮ তম আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জনাব মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলাম। তিনি বলেন, অন্যের উপকার করতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। অথচ নিজের স্বার্থচিন্তাকে জীবনের উপভোগ্য বিষয় মনে করে অনেকে। বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। কীভাবে অন্যের উপকার করতে পারি–এই ভাবনাটি যখন একজন মানুষের মধ্যে থাকে, তার সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক না কেন, সে তার জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতে পারে। কারণ আমরা আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা জীব।

মুমূর্ষের সেবায় যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, তারা নিঃস্বার্থভাবেই এ-কাজ করছেন। এ কারণেই তারা জীবনকে উপভোগ করতে পারছেন। আমি মনে করি, অন্যদের তুলনায় তাদের মানসিক শান্তিটা অনেক বেশি।

প্রোগ্রাম দুটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে। ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ১৭০ জনকে সম্মাননা সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এতে। দুটি আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।

১৪৮ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শামস্-উল ইসলামের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

হ্যান্ডবলে বালক ও বালিকা উভয় গ্রুপে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হলো ৪৮ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৯। এবছর জাতীয় পর্যায়ের ম্যাচগুলোর ভেন্যু ছিল সিলেটের আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স। আঞ্চলিক পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলোকে পরাজিত করে এ প্রতিযোগিতায় বালিকা ও বালক উভয় গ্রুপে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।

উল্লেখ্য, বালক হ্যান্ডবল দল টানা চতুর্থ বারের মতো ও সর্বমোট ষষ্ঠ বারের মতো জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ঢাকায় আইনজীবীদের অংশগ্রহণে সুস্বাস্থ্য-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার

২৩ অক্টোবর ঢাকায় আইনজীবী সমিতির জিল্লুর রহমান অডিটোরিয়ামে সুস্বাস্থ্য-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আইনজীবী সমিতির ৩৫০ জন আইনজীবী অংশ নিয়েছেন।

এ সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল *ডায়াবেটিস নিরাময় ও প্রতিরোধে আমাদের করণীয়*। এতে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান। আলোচনায় ডায়াবেটিস প্রতিরোধে নিয়মিত মেডিটেশন, সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ ও পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

১ নভেম্বর থেকে কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্ত ও রক্ত উপাদানের প্রসেসিং খরচ

রক্তের মান নিয়ন্ত্রণে কোয়ান্টাম ল্যাব সবসময় আপসহীন। রক্তের শুদ্ধতা পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান, প্রযুক্তি ও ব্লাডব্যাগের খরচ গত ১০ বছরে ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। তাই বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহের জন্যে রক্ত ও রক্ত উপাদানগুলোর ১ নভেম্বর থেকে প্রসেসিং খরচ হালনাগাদ করা হয়েছে–

উপাদান	প্রসেসিং খরচ
হোল ব্লাড	১,০৫০/-
রেড সেল কনসেনট্রেট	৯৫০/-
ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা	১,০৫০/-
প্লাটিলেট কনসেনট্রেট	১,১৫০/-
ফ্রেশ প্লাজমা	১,১৫০/-
প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা	১,১৫০/-
প্লাটিলেট পুওর প্লাজমা	১,১৫০/-
ক্রায়োপ্রিসিপিটেট	১,১৫০/-
প্রোটিন সলিউশন	৯৫০/-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মানুষকে দেখেছেন মানুষ হিসেবে

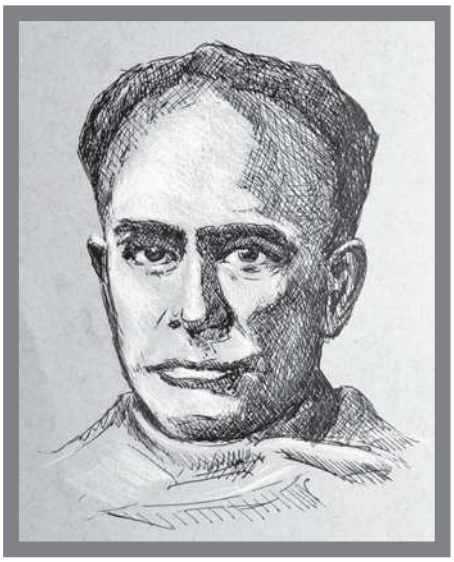

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ – ২৯ জুলাই ১৮৯১

‘গুণমাণ হইলেই মানে সব ঠাঁই
গুণহীনে সমাদর কোনোখানে নাই’

‘অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে
সমাজের অমঙ্গল’

কলকাতার রাস্তা কুয়াশায় ঢেকে গেছে। দুহাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। সুকিয়া স্ট্রিটের একটি বাড়িতে বিয়ের আয়োজন চলছে। বিয়ে দেখতে উৎসুক মানুষের ভিড় জমেছে। বাইরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। বিয়ে নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তারা সতর্ক। যে-কোনো সময় শুরু হতে পারে গণ্ডগোল।

কুয়াশা এবং লোকের ভিড় ঠেলে অতিথিরা আসছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার আমন্ত্রণেই অতিথিদের আগমন। বিয়ের যাবতীয় আয়োজন করেছেন তিনি। ঐতিহাসিক এই বিয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার হিন্দু বিধবা নারীর ভাগ্য বদলাতে যাচ্ছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো মধ্যরাতে। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঈশ্বরচন্দ্র।

দিনটি ছিল ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর। সেদিন প্রথম হিন্দু বিধবা বিবাহ হয়। বিয়ের বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কনে কালীমতি দেবী। চার বছর বয়সে কালীমতির একবার বিয়ে হয়েছিল। ছয় বছর বয়সেই সে বিধবা হয়।

নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে পরবর্তী ১২ বছরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬০ জন বিধবা কন্যার বিয়ে দেন। এসব বিয়ের অধিকাংশের ব্যয়ভার বহন করেন তিনি নিজেই। বিধবা বিবাহের প্রচলন সমাজকে শোষণ নিপীড়ন ও অনাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।’

নীতির প্রশ্নে তিনি আপসহীন

একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তার ছেলে নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে বিধবার সাথে বিয়ে দেবেন। তাতে ছেলেরও আপত্তি নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ঈশ্বরচন্দ্রের মা।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা সর্বজনবিদিত। কথিত আছে, মা ডেকেছিলেন বলে একবার তিনি দামোদর নদীতে কোনো নৌকা না পেয়ে সাঁতরে পার হলেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস করতে রাজি নন ঈশ্বরচন্দ্র। বললেন, ‘তুমি আমার মা। তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু নীতি লঙ্ঘন করতে পারি না, সত্যকে লঙ্ঘন করতে পারি না। সত্যই হচ্ছে আমার কর্ম।’ মায়ের সমস্ত দিব্যি লঙ্ঘন করে ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেকে বিধবার সাথে বিয়ে দিলেন।

তিনি কখনো তোষামোদ পছন্দ করতেন না। একবার তার মেয়ে-জামাই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন। অধ্যক্ষ হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সবরকম গুণ তার ছিল। কলেজের কাজকর্ম সবই ঠিক চলছিল। কিন্তু বছর শেষে একটি খরচের হিসাব মিলল না এবং অধ্যক্ষ কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, ‘তোমার টাকার প্রয়োজন ছিল, আমাকে বলতে। তুমি ভেবেছ যে, কলেজ যেহেতু শ্বশুর মশায়ের, যা ইচ্ছে তা-ই হবে।’ এই বলে তাকে অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করলেন। এমনই দৃঢ় সংকল্পের মানুষ ছিলেন তিনি।

মানুষের সেবায় সদা তৎপর

১৮৬৬ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্ট এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মারা যাচ্ছিল। কিন্তু সেবা-যত্নের জন্যে কেউ এগিয়ে আসছিল না।

বিদ্যাসাগর চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আনলেন। লোকজনকে খাওয়ানোর জন্যে সাধ্য অনুযায়ী তার গ্রামে লঙ্গরখানা খুললেন। সেখানে ১২ জন মানুষ দিনরাত রান্না করত। আর এই খাবার পরিবেশনে থাকত আরো ২০ জন।

একবার এক কিশোরী এসেছে এই লঙ্গরখানায়। রুক্ষ শুষ্ক তার চুল। মলিন চেহারা। খাবারই জোটে না, চুলে দেয়ার তেল পাবে কোথায়? ক্ষুধার যন্ত্রণায় সে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে কিছু বলতে পারছে না। ভয় পাচ্ছে। নিচু জাতের বলে তাকে যদি কেউ তাড়িয়ে দেয়!

ঈশ্বরচন্দ্র মেয়েটির কাছে গেলেন। তাকে পেটপুরে খাওয়ালেন। তারপর মেয়েটির রুক্ষ চুলে নিজ হাতে তেল দিয়ে দিলেন। এই দৃশ্য চারপাশের মানুষ অবাক হয়ে দেখল। অনেকেই ভাবল, ঈশ্বরচন্দ্রের জাত চলে গেছে! তিনি অপবিত্র হয়ে গেছেন। কিন্তু এসবে তার কোনো পরোয়া ছিল না।

তখনকার দিনে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ খুব বেশি ছিল। একই হাড়ির খাবার খেতে উঁচুবর্ণের হিন্দুদের ঘোর আপত্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বলেছিলেন, ‘যিনি ক্ষুধার্ত তিনি লঙ্গরখানায় খেতে পারবেন, এখানে কোনো জাতপাত চলবে না।’ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন তিনি। শুধু বিদ্যার সাগর নন, ছিলেন মানবতার সাগর।

আমরা পারব, বাঙালি পারবে

তখনকার দিনে ভারতবর্ষে শীর্ষস্থানীয় কলেজ ছিল সংস্কৃত কলেজ। সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়ার সুযোগ পেত। এই কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র অন্য বর্ণের ছাত্রদের লেখাপড়ার অধিকার নিশ্চিত করেন।

তার আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রবল। সংস্কৃত কলেজে সেক্রেটারির সাথে মতপার্থক্য দেখা দিলে তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। এর আরেকটি অন্যতম কারণ–ইংরেজরা মনে করত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর মতো সামর্থ্য বা জ্ঞান কোনোটিই বাঙালির নেই। তাই তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে সকল শিক্ষক ছিলেন বাঙালি। ১৮৭৯ সালে এটি পরিণত হলো কলকাতার প্রথম সারির কলেজে।

লোকাচার নয়, সৎকর্মেই যার বিশ্বাস

সমাজে অনেক সংস্কার আছে যার পেছনে কোনো ধর্ম নেই, আছে লৌকিকতা। এই লোকাচারকে তিনি সবসময় অগ্রাহ্য করেছেন। তার মতে–সৎকর্মই হচ্ছে ধর্ম, সেবাই হচ্ছে ধর্ম।

বিদ্যাসাগর শুধু কৃতী বাঙালিই ছিলেন না, ছিলেন যথার্থ ও আলোকিত মানুষ। তার সততা, দৃঢ়তা ও নীতিনিষ্ঠার আলো হাজার বছর পরও উত্তর প্রজন্মকে জোগাবে সাহস। দেবে অনুপ্রেরণা। সব যুগে সব কালে তিনি একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তার জন্ম। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা ভগবতী দেবী।
- ব্যাকরণ, কাব্য, বেদান্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্যে ১৮৩৯ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে তাকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেয়া হয়।
- বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে যতি চিহ্নের প্রবর্তক তিনি।
- নারীশিক্ষা বিস্তারে তার অবদান অনস্বীকার্য। কলকাতার বেথুন কলেজ তার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলেও তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন বিদ্যাসাগর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে বলেন, ‘দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।’
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেন, He has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman, and heart of a Bengali mother.

কোয়ান্টাম বুলেটিন : নভেম্বর ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd

কোয়ান্টাম বুলেটিন

ডিসেম্বর ২০১৯

১ জানুয়ারি প্রজ্ঞা জালালিতে অংশ নিন

প্রজ্ঞাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জ্ঞানের সাথে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির মেলবন্ধন ঘটাতে পারলেই পরিণত হওয়া সম্ভব প্রজ্ঞাবান মানুষে। এজন্যে চাই প্রস্তুতি এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস।

গুরুজীর পরিচালনায় ১ জানুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বছরের প্রথম প্রজ্ঞা জালালি। ঢাকার কাকরাইলে আইডিইবি ভবনে দিনব্যাপী এ আয়োজনে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার সকলেই আমন্ত্রিত।

বর্ষায়ন ২০২০

৩ জানুয়ারি শুক্রবার

সপরিবারে আসুন

কোয়ান্টাম মেথড ২০২০-এ শুরু করতে যাচ্ছে ২৮ তম বছরের শুভযাত্রা। এ উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি শুক্রবার সকল সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে উদযাপন করা হবে কোয়ান্টাম বর্ষায়ন।

বছরের প্রথম শুক্রবার দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা সপরিবারে একত্রিত হবেন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে।

নতুন সংস্করণে কোয়ান্টাম কণিকা বই

প্রকাশিত হয়েছে 'আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র ॥ কোয়ান্টাম কণিকা' বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ। সাধকদের চিরায়ত জ্ঞানের নির্যাসের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে কোয়ান্টাম কণিকাগুলো। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ছোট ছোট সাফল্যসূত্র স্থান পেয়েছে বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে। সময়কাল অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে পবিত্র ধর্মবাণীগুলোকে। প্রতিটি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে এ বইটি হতে পারে অন্যতম সহায়ক পাঠ্য।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রসহ আপনার নিকটস্থ সেন্টার শাখা সেল থেকে বইটি আজই সংগ্রহ করুন।

নতুন শুরুর বছর ২০২০

২০২০-এ যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের নতুন ক্যাম্পাস–সবুজায়ন। বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে সহস্রাধিক দুস্থ-বঞ্চিত শিশুর শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাসস্থল হয়ে উঠতে যাচ্ছে সদ্যনির্মিত এই সুপরিসর ক্যাম্পাসটি। ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতার বরকতে আপনার জীবনেও আগামী বছরটিতে আসতে পারে নতুন সুযোগ। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে সূচিত হতে পারে সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। ২০২০ হয়ে উঠুক আপনার নতুন শুরুর বছর।

২০০১ সালে লামার কোয়ান্টামমে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল সাত জন! গত দেড় যুগে ধাপে ধাপে বিস্তৃত ও বিকশিত হয়ে ইতোমধ্যে তা রূপ নিয়েছে দেশসেরা একটি অনন্য বিদ্যায়তনে। আধুনিক শিক্ষা, নানা ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রম ও বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তির চর্চা এবং একটি অনন্য নৈতিক আবহে এখানে বেড়ে উঠছে ২২ শতাধিক ছেলে ও মেয়ে শিশু।

> কোয়ান্টামের সাথে একাত্মতার বরকতে আপনার জীবনেও আগামী বছরটিতে আসতে পারে নতুন সুযোগ। পরম করুণাময়ের রহমতে সূচিত হতে পারে সাফল্য ও সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।

যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে এই শিশুরাই নিয়মিত ভিত্তিতে অর্জন করছে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুমুখী সাফল্য। প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে সরকারি মেডিকেল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

সূচনালগ্ন থেকেই সৃষ্টির সেবার লক্ষ্য নিয়ে অপ্রচলিত এক পথ বেছে নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, যা এদেশে এক বিরল দৃষ্টান্ত। তা হলো, স্ব-উদ্যোগ স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে প্রতিটি সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই অনিশ্চিত যাত্রায় নানা সময়ে প্রতিকূলতা এসেছে অনেক, কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যরা সবসময় বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে তারা কাজ করে গেছেন নিরলস। সেবাকর্মে অংশ নিয়েছেন অর্থ, সময় ও শ্রম দিয়ে। নিজেরা যেমন দান করেছেন নিয়মিত, তেমনি চারপাশের মানুষকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন নিঃস্বার্থ দানে।

এই ধারাবাহিকতায় বলা যায়, কোয়ান্টাম আজ 'নিজের জীবন নিজে গড়ার' এক সার্থক দৃষ্টান্ত। শূন্য থেকে শুরু করে এই সৎসঙ্ঘ যেমন ক্রমাগত এগিয়ে গেছে, একইভাবে এর সহযাত্রীদের জীবনেও এসেছে নানা ইতিবাচক পরিবর্তন ও বহুমুখী অর্জন। সেইসাথে সবাই মিলে সম্ভব হচ্ছে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার দেয়াল ভেঙে সে লক্ষ্যে সক্রিয় অবদান রাখা।

আসন্ন বছরে সঙ্ঘবদ্ধ সেবা উদ্যোগের এমনই এক উদাহরণ হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের এই নতুন ক্যাম্পাস 'সবুজায়ন'-এর উদ্বোধন। যে-কোনো লক্ষ্যাভিসারী মানুষের জন্যেই যা হবে এক অনুপ্রেরণার উৎস।

তাই কোয়ান্টামের সাথে থাকুন। সঙ্গী হোন ইতিবাচকতা, সেবা, মানবিকতা ও সাফল্যের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সূচনা হোক সার্থকতার এক নতুন অভিযাত্রা।

বঞ্চিতের শীত নিবারণে সাধ্যমতো দান করুন

বঞ্চিত মানুষের শীত নিবারণে দান সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। এই আহ্বানে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা। নিজেরা সাধ্যমতো দান করছেন এবং এই আবেদন পৌঁছে দিচ্ছেন আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশী ও পরিচিতদের কাছে।

দেশের পার্বত্য ও উত্তরাঞ্চলে তীব্র শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে সাধারণত প্রয়োজন পুরু কম্বল, সোয়েটার, ভারী জ্যাকেট, কানটুপি, হাত মোজা, পা মোজা ও মাফলার। এজন্যে জনপ্রতি ব্যয় হয় ন্যূনতম ৫০০০ টাকা।

তাই অসহায়-বঞ্চিত শিশুসহ সব বয়সী মানুষের জন্যে আর্থিক দান সংগ্রহ করছে কোয়ান্টাম সদস্যরা। আগামী কয়েক বছর যেন নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যায়, তেমন উন্নত মানের কাপড় কেনার লক্ষ্যেই এ আয়োজন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন করো আর জমিন থেকে যা উৎপাদিত হয়, তা থেকে ভালো অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করো। বেছে বেছে খারাপ জিনিসগুলো দান করতে যেও না। ...' *(সূরা বাকারা : ২৬৭)*

শীতবস্ত্র কেনার সামর্থ্য নেই, দেশের এমন সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে শীত নিবারণের যাবতীয় উপকরণ পৌঁছে দেয়াই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক এ উদ্যোগের লক্ষ্য।

অর্থাৎ দানের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত–শুধু অর্থ নয়, দাতার অন্তরের উষ্ণতা এবং মমতা যেন দানের সাথে থাকে। এটাই আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়। তাই বঞ্চিতের শীত নিবারণে সাধ্যমতো দান করুন। দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিজে দান করার পাশাপাশি দানে উদ্বুদ্ধ করুন পরিচিতদেরও।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৫ তম কোর্স

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

৪৬৬ তম কোর্স

১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ জানুয়ারি

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। ১১ মার্চ ২০১৯ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৮৫ তম পর্বে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন। নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

অনেক দূর যেতে হবে আমাদের

সেলিনা হোসেন

১৯৭০ সাল। সে-বছরই আমার পেশাজীবনের শুরু। আমি যোগ দিলাম বাংলা একাডেমিতে। তারপর যুদ্ধের সেই নয় মাস। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বহু কিছু জানার সুযোগ আমার হয়েছিল।

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হলো ১৯৭০ সালে। বঙ্গবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হলেন। আমাদের সামনে বাঙালি জাতিসত্তার একটি বড় দরজা খুলে গেল। ভেবেছিলাম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নে বাঙালিরা ২৪ বছর যে দুর্বিষহ জীবন কাটিয়েছে, তা থেকে এবার আমাদের পরিত্রাণ হবে। কিন্তু সেটা হয় নি। সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো তা হতে দেয় নি। তাই স্বাধীনতার মতো একটি জাগ্রত স্বপ্ন আমাদের সামনে তখন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

এখনো মনে আছে–১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্সে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনতে। মেয়েদের জন্যে ঘেরাও করা একটি জায়গা ছিল, আমি সেখানে বসেছিলাম। আমার সামনে ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। আরেক পাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটিতে ছিলেন বরেণ্য দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সরদার ফজলুল করিম।

ভাষণ শেষে তার সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে বললেন, 'মনে হচ্ছিল, আমার মাথা আকাশ সমান লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং আমি একজন বিশাল মানুষ হয়ে যাচ্ছি। পাকিস্তানি হেলিকপ্টার যখন মাঠের দিকে উড়ে আসছিল তখন আমার একটুও ভয় হয় নি। একবারও ভাবি নি আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে।'

ভিড় কমার পর আমি বের হলাম। বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একজন বাদামওয়ালার মুখে শুনলাম–'মুইছ্যা গেছে! পূর্ব পাকিস্তান মুইছ্যা গেছে!' বিস্ময় নিয়ে তার মুখের দিকে সেদিন তাকিয়ে ছিলাম।

তারপর ২৫ মার্চ। সংঘটিত হলো ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। মধ্যরাতেও গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি। মানুষের আর্তচিৎকার শুনেছি। ২৭ মার্চ কারফিউ শেষ হলো। আমি বাড়ির বাইরে বের হলাম। লিখতে হলে আমাকে তো বাস্তব চিত্রটা দেখতে হবে। এই অভ্যাস আমার এখনো আছে। কোনো জায়গা না দেখে আমি লিখতে পারি না।

তখন আমি এলিফ্যান্ট রোডে থাকতাম। নিউ মার্কেটের দিকে এগোচ্ছি। রাস্তার দুপাশে লাশ পড়ে আছে। তরকারির ঝুড়িতে উপুড় হয়ে আছে অনেক মানুষের নিথর দেহ। তাদের পিঠে দেখা যাচ্ছে গুলির ক্ষত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে গেলাম, বর্তমানে যেটি শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। ৪০৩ নম্বর রুমের মাঝখানে রক্ত জমাট হয়ে আছে। লাশ টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন। সিঁড়ি আর বারান্দাও রক্তাক্ত। ছাদে গেলাম। দেখি পানির ট্যাংকের পাশে গুলিবিদ্ধ একজনের লাশ। তার দুই হাত দুদিকে প্রসারিত। তার ওপর দুটো ছেলে-মেয়ে পড়ে আছে। সাত-আট বছর হবে শিশু দুটির। প্রত্যেকের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে।

যখন ফিরে আসছি, ইকবাল হলের বাইরে দেখা হলো প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে–যিনি পরবর্তী সময়ে আল বদরের হাতে নিহত হলেন। তিনি তখন বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকার চিত্র বর্ণনা করছিলেন। আমাকে দেখে তার জিপ গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে কেন? শহরের অবস্থা এখন ভয়াবহ। এসময় বাইরে থাকতে নেই।' কিন্তু সেদিন তার কথা আমি মানতে পারি নি। ওখান থেকে চলে গেলাম শহীদ মিনার দেখতে। সেটাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাংলা একাডেমি ও রমনার কালীবাড়িতে গেলাম। সর্বত্রই বিধ্বস্ত অবস্থা। বাড়ি ফিরলাম। বুঝলাম, এই হলো যুদ্ধের সূচনা।

নয় মাস যুদ্ধ চলল। ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বাড়িতে এলেন আমার শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল হালিম। তিনি যশোরের কালিগঞ্জের এক মায়ের ঘটনা বললেন।

সেই মা তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেন, যাতে অন্য দুজন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণে বাঁচে। সেনারা প্রতিবন্ধী ছেলেটিকে উঠানে গুলি করে রেখে যায়। এ ঘটনা শোনার পর বেঁচে যাওয়া ঐ দুজন মুক্তিযোদ্ধা যখন কাঁদছিল তখন সেই মা তাদের ধাক্কা দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাও, আমি স্বাধীনতা চাই।' এই ঘটনাটি নিয়েই আমি *হাঙর নদী গ্রেনেড* উপন্যাসটি লিখি। এর ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে।

পুরুষরা যখন যুদ্ধে গেছে, নারীরা তখন ঘর সামলেছেন। প্রবীণদের সেবাযত্ন করেছেন, শিশুদের রক্ষা করেছেন। নারীরা এসব না করলে আমরা নতুন প্রজন্মই পেতাম না। অনেক নারী রণাঙ্গনেও অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। যেমন তারামন বিবি। তখন তার বয়স ১৩ কি ১৪। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাত রান্না করতেন তিনি। নদীর ওপার থেকে গানবোটের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। তিনি দ্রুত নারকেল গাছের মাথায় উঠে গেলেন। সবাইকে সতর্ক করলেন–'মিলিটারি আসছে!' মুক্তিযোদ্ধারা যে যার মতো নিরাপদ স্থানে সরে পড়লেন।

একজন হাবিলদার তারামন বিবির এই সাহস ও বুদ্ধিমত্তা দেখে তাকে ট্রেনিং দিলেন। তারপর তারামন বিবি অস্ত্র হাতে নিলেন। যোগ দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন অপারেশনে।

আরেকজন মেয়ে–তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র রক্ষা করতেন। একবার হলো, গেরিলাদের খবর পেয়ে মিলিটারিরা গ্রামে চলে এসেছে। গেরিলারাও বুঝতে পেরে আড়ালে চলে গেলেন। এদিকে মেয়েটি তাদের বন্দুকগুলো পুকুরে ডুবিয়ে রাখলেন। মিলিটারিরা এসে জিজ্ঞেস করল, ওরা কোথায়? মেয়েটি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি তো জানি না'। মিলিটারির দল মেয়েটিকে গুলি করে চলে গেল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ কারো অবদান কম নয়। কিন্তু নারীদের স্বীকৃতি আমরা যথাযথভাবে দিতে পারি নি। যে নারীরা যুদ্ধে নির্যাতিত হয়েছে বা যুদ্ধশিশুর জন্ম দিয়েছে তাদের অনেককেই পরিবার থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে তাই সত্যটা জানাতে হবে। সেটা হলো–নারী-পুরুষের সম্মিলিত শক্তিতেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের এই ঘটনাগুলো আমাদের শিল্প-সাহিত্যে আনতে হবে। কারণ শিল্পের কাজ হলো একটি সমাজব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে প্রকাশ করা। বিশ্ব দরবারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনকে অনেকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে। সেই দূর যাত্রায় আমরা যেন পিছিয়ে না পড়ি। আগামী প্রজন্ম যেন গর্বের সাথে বলতে পারে–আমার ঐতিহ্য আমার স্বাধীনতা, আমার ঐতিহ্য আমার মাতৃভাষার মর্যাদা।

তাই মায়েদের বলি, সন্তানদের সবসময় নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন, জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে তুলে ধরবেন।

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম।

শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই আমি একজন ভালো শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত। প্রথম সারির স্কুল ও কলেজে আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসি-তে ভালো ফলাফলসহ বৃত্তিও পেয়েছি। স্কুলে পড়ার সময়ই ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। সে অনুযায়ী ২০১৮ সালে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিই। কিন্তু কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজেই আমি চান্স পেলাম না।

সেই সময় এত গভীর ও তীব্র কষ্ট আমার মনের মধ্যে কাজ করছিল, যা কখনোই আমি প্রকাশ করতে পারব না। চারপাশের পরিচিত মানুষদের নানা কথায় তখন আমার দম বন্ধ অবস্থা। হতাশা, বিষণ্নতার মতো আত্মঘাতী আবেগগুলো আমার মধ্যে কাজ করছিল।

অন্যান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো আমার পরিবারও আমার এই অবস্থা দেখে পরিচিতদের কাছ থেকে ঋণ করে এবং ব্যাংক লোন নিয়ে প্রাইভেট মেডিকেলে আমাকে পড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কারণ প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তি হতে ১৮ লক্ষ টাকা এবং এমবিবিএস শেষ করতে ন্যূনতম ২৮ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

ঋণের এ ধরনের চাপ নিয়ে মেডিকেলে পড়া আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। প্রতিমুহূর্তে এমন মানসিক চাপ নিয়ে একজন ডাক্তার হিসেবে আমার বিকাশ সম্ভব নয় এবং আমার পরিবারের জন্যেও তা ক্ষতিকর। তাই আমি দ্বিতীয় বার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে মনস্থির করলাম।

আবারো চারপাশের সবার নেতিবাচক কথা– দ্বিতীয় বার মেডিকেল পরীক্ষার্থীদের পাঁচ নম্বর কেটে রাখায় চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, এতে অনেক ঝুঁকি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমার মধ্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। আমার একটি বারের জন্যেও মনে হয় নি–আমি পারব না। পাঁচ নম্বর কেন, আরো বেশি নম্বরও যদি কেটে রাখে তবু আমি মেধাতালিকায় অবশ্যই চান্স পাব–এমন একটি চিন্তা আমার মধ্যে কাজ করতে লাগল।

আমি মনে করি, পড়ালেখার সাথে সাথে আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্নায়বিক চাপের মুহূর্তে নিজেকে শান্ত রাখা, মস্তিষ্কের পূর্ণ ব্যবহার ও আত্মপ্রত্যয়ী থাকাটা অনেক জরুরি। নইলে ভালো প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষায় ভালো করা কঠিন হয়ে যায়।

মেডিটেশন চর্চা ছাড়া এগুলো অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নিয়মিত মেডিটেশন আমাকে পরবর্তী একবছর আমার লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছে। আমার একাগ্রতা বৃদ্ধি করেছে এবং আমি দৈনিক দীর্ঘসময় পড়াশোনা করতে পেরেছি, যা অন্যদের রীতিমতো অবাক করত।

খুব ব্যস্ততার মধ্যেও আমি প্রতিটি সাদাকায়ন ও আলোকায়নে অংশগ্রহণ করতাম, যা আমার মধ্যে সবসময় ইতিবাচকতার অনুরণন তৈরি করত। এ-ছাড়াও মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান, সদকা হিলিং ও নিয়ত করে একবার লামা কোয়ান্টায়নে অংশগ্রহণ করি।

যথাসময়ে আমি আমার পরীক্ষার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। ২০১৯-এ আমি আবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেই। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সকল নেতিবাচকতা পেছনে ফেলে আমি মেধাতালিকায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেলে চান্স পাই।

গুরুজী, আপনার ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনার সন্তানতুল্য–
রাকিন হান্না আনান
৪০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম নিবেন।

আমার এক প্রতিবেশী ভদ্রমহিলা কাপড়ের ব্যবসা করেন। পাইকারি মার্কেট থেকে কাপড় কিনে এনে বাড়িতে বাড়িতে খুচরা বিক্রি করেন। ভালোই লাভ হচ্ছিল, এলাকায় বেশ সুনামও ছিল তার।

একসময় তিনি ব্যবসা বড় করতে চাইলেন। এর জন্যে প্রয়োজন আরো মূলধন ও লোকবল। তাই তিনি প্রথমে কিস্তিতে ঋণ নিলেন। একজন মহিলাকে নিয়োগ দিলেন, তাকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতে হবে। লাভ দুই জনেরই হবে, এই ছিল চুক্তি।

একসময় সেই কর্মচারী মহিলা কাপড় বিক্রির সব টাকাপয়সা খরচ করে ফেলল। এদিকে কিস্তির লোকেরা নিয়মিত আসতে শুরু করল। এই কিস্তি শোধের জন্যে আমার প্রতিবেশী আরো একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিলেন। ধীরে ধীরে তিনি কিস্তির চক্রে ঢুকে গেলেন। একপর্যায়ে পরিচিতদের কাছ থেকেও সুদে টাকা নিতে লাগলেন। তার আয় নেই, কিন্তু ব্যয় আছে। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেল তার।

যারা তাকে সুদে ঋণ দিয়েছিল, সেই পাওনাদাররা এসে একবার ঘরের ফ্রিজ থেকে কোরবানির মাংস পর্যন্ত নিয়ে যায়। ঘরের দৈনন্দিন বাজারও তারা উঠিয়ে নিয়ে যায় সুদ আদায় করতে না পেরে।

একবার তিনি স্বর্ণের অলংকার বন্ধক রেখে একজনের কাছ থেকে টাকা নিলেন। পরে জানা গেল, সেই ব্যক্তি ঐ স্বর্ণালংকার হারিয়ে ফেলেছে।

এখন তিনি যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন সেখানেও পাওনাদাররা আসে। আজ না কাল, কাল না পরশু, এভাবে অনর্গল মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন আমার সেই প্রতিবেশী। এখন তিনি প্রায়ই বাবার বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে বলেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন। আসলে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না ঋণের অভিশাপ এমনই ভয়াবহ।

নাম প্রকাশ করা হলো না

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম।

আমার এক আত্মীয়ের ঘটনা বলছি। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। চাকরিরত অবস্থায় দেশের স্বনামধন্য একটি ব্যাংক তাকে পটিয়ে একটি ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেয়। ঐ ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দুইবারে তিনি ৮০ হাজার টাকা উত্তোলন করেন তার একটি বিশেষ প্রয়োজনে।

এরপর সেই ব্যাংকের সাথে বহু বছর ধরে লেনদেন চলতে থাকে। একসময় তিনি মনে করেন, তাকে হয়তো আর টাকা ফেরত দিতে হবে না। কারণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো তাগাদা নেই।

অনেক বছর পরে হঠাৎ করে ব্যাংক নোটিশ– তাকে ব্যাংকের ঋণশোধ করতে হবে। যে সময়ে তার কাছে এই খবর আসে তখন তার কাছে পরিশোধ করার মতো কোনো টাকা নেই।

ইতোমধ্যে তিনি আরেকটি ভুলের বৃত্তে জড়িয়ে গেছেন। অবসর গ্রহণের পর প্রতারকের মিষ্টি কথায় প্রভাবিত হয়ে পেনশনের সমস্ত টাকা তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে। যে মানুষটি সারাজীবন চাকরি করেছেন, তিনি হঠাৎ করে ব্যবসায়ী হতে গিয়ে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হলেন। এ কঠিন সময়ে ব্যাংকের নোটিশ এলো–তাকে ক্রেডিট কার্ডের টাকা শোধ করতে হবে।

প্রথমে তিনি বাসা বদলে ফেললেন এই ভেবে যে, ব্যাংক আর তাকে খুঁজে পাবে না। তাছাড়া শোধ করার মতো কোনো সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি আইনি নোটিশ পেলেন। তার নামে মামলা হয়েছে।

ঋণের চিন্তায় এবং সবকিছু হারানোর ভয়ে একপর্যায়ে তার স্ট্রোক হলো। নিরুপায় হয়ে তাকে শোধ করতে হলো এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা প্রায়। স্ত্রীর জমি বিক্রি করে এবং আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় সেই টাকা শোধ করলেন।

এখানেই শেষ নয়। কিছুদিন পর আবার ওয়ারেন্ট এলো। জানা গেল ব্যাংকের করা এই মামলার সমস্ত খরচ তাকেই শোধ করতে হবে। অনেক কষ্টে এ অর্থ তিনি শোধ করলেন।

গুরুজী, এই হলো ক্রেডিট কার্ডের পরিণতি। তরুণ বয়সে প্রলুব্ধ করে ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দেয় আর জীবনের শেষপ্রান্তে ভাগ্যে জোটে দুশ্চিন্তা, অপমান, স্ট্রোক, সীমাহীন দুর্ভোগ।

নাম প্রকাশ করা হলো না

সংগ্রহ করুন কোয়ান্টাম প্রকাশিত ঋণ সম্পর্কিত স্টিকার। চারপাশে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন। ঋণের অভিশাপ থেকে নিজে বাঁচুন এবং সচেতন করুন অন্যকেও।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

সপরিবারে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসেছি

ডা. মোহা. আব্দুস সালাম

পরিবারের চার জন সদস্যসহ আমি এবার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। প্রথমে আমি একাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাবলাম, পরিবারের সদস্যদের নিয়েই আমার বসবাস। তাহলে একা কেন? সবাই মিলে যখন একটি ভালো বিষয় জানব তখন এটা চর্চা করা আরো সহজ হবে। তা-ই হয়েছে। কোর্স শেষে যখন আমার সন্তানদের সাথে কথা বলেছি, দেখেছি তারাও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি চর্চার প্রয়োজন অনুভব করছে।

চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি আমি অধ্যাপনা করি। টানা দুটো ক্লাস নেয়ার পর প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন মেডিটেশন করে নিজেকে বেশ প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে। আশা করি, আমার ক্লান্তিটা আর থাকবে না।

এখানে বলা হয়েছে, শতকরা ৭৫ ভাগ অসুখই মন থেকে সৃষ্টি হয়। আমার পেশাজীবনেও দেখেছি, যেসব রোগী চিকিৎসকের কাছে আসেন তাদের অধিকাংশেরই সমস্যা আসলে মনোদৈহিক। এ কোর্স করলে রোগীদের তো উপকার হবেই, যে-কোনো পেশা-বয়সের মানুষও পাবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

[সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নিউরো-ট্রমা বিভাগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল। ৪৬৪ ব্যাচ]

রাগ কমেছে, বেড়েছে সাহস

ফাতিমা শারমীন

আমার বড় বোন আমাকে প্রায়ই বলতেন, মেডিটেশন করো। শুনে আমি বিরক্ত হতাম। একপর্যায়ে মেডিটেশন শুরুও করলাম। দেখলাম আমার রাগ কিছুটা কমতে শুরু করেছে। কিন্তু পুরোপুরি যায় নি। আর এখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমার সবসময় রেগে যাওয়ার প্রবণতা আর নেই। আগে আমার হাত ঘামার সমস্যা ছিল, সেটিও কমতে শুরু করেছে।

এ-ছাড়া আগে আমি অনেক রি-একটিভ ছিলাম। এখন আমি একজন ইতিবাচক মানুষ। আর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো, আমি সাহসী হয়েছি। আগে মনে হতো, চাকরি পেতে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। মেডিটেশন শেখার পর এখন বিশ্বাস করি, আমার জীবন আমি নিজে গড়তে পারব। কারণ আমার মনছবি এখন সুস্পষ্ট।

[চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেছেন। ৪৬৩ ব্যাচ]

সন্তান বড় হলে বলব– এই কোর্সটি করো

জেনিফার জাহান

কিছুদিন আগে আমার এক বান্ধবী বেড়াতে এলো বাসায়। তার সাথে অনেক গল্প করলাম। অনেক হাসলাম। সে চলে যাওয়ার পরে আমার ছয় বছর বয়সী মেয়েটি আমাকে বলছে, 'মা তোমার বান্ধবীর সাথে তুমি এত হাসলে কিন্তু আমাদের সাথে তো শুধু রাগারাগিই করো! বান্ধবীর সাথে এই হাসিটা তাহলে তোমার অভিনয় ছিল, তাই না মা?'

মেয়ের প্রশ্ন শুনে মনটা খুব খারাপ হলো। আমার সন্তান মনে করছে আমি শুধুই রেগে থাকি। কিন্তু আমি তো এটা চাই না। এটা আমার মধ্যে এলো কীভাবে? ব্যস্ত জীবন, চাকরি, পারিবারিক চাপ–এগুলোর প্রভাব কি এতটাই যে, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি?

এখানে যখন এলাম, প্রথমদিনই আলোচনা শুনে মনের অনেক নেতিবাচক চিন্তা চলে গেছে। মেডিটেশন করে অনেক প্রশান্ত অনুভব করছি।

আমার সাথে আমার স্বামীও এসেছেন। কারণ স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলেই সংসার পরিচালনা করে। কোয়ান্টামের এই শিক্ষা তাই দুজনেরই জানা দরকার। আমার সন্তান যখন বড় হবে তাকে বলব, যাও কোর্সটা করো। আমি বিশ্বাস করি, সেও যখন কোয়ান্টামের ইতিবাচকতার শিক্ষা গ্রহণ করবে তখন আমার পরিবারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

[সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৬২ ব্যাচ]

ফেসবুক ও সেলফি আসক্তি থেকে আমি এখন মুক্ত

রেহানা হাবিব

আমি ফেসবুকের প্রতি খুব আসক্ত ছিলাম। অনেক সেলফি তুলতাম। সেলফি তোলাটা একসময় নেশায় পরিণত হয়ে গেল। এমনও হয়েছে– ফেসবুকের লাইক কমেন্ট দেখতে গিয়ে সন্তানকে যে পড়াতে হবে, সেটাও ভুলে গেছি। আমার স্বামী প্রায়ই বলতেন, এই কোর্সটি করো। এবার আমি চলে এলাম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি সত্যটা বুঝতে পেরেছি। ভার্চুয়াল ভাইরাস আসলেই ভয়ংকর। অতীতে যা করেছি সেটা ভুল ছিল। এখানে এসে আমি সঠিক জীবনদৃষ্টি পেয়েছি। এজন্যে আমার স্বামীকে ধন্যবাদ জানাই।

[গৃহিণী। ৪৬৩ ব্যাচ]

ইনহেলারের চেয়ে দমচর্চা বেশি সুফল দিয়েছে

মো. জয়নাল আবেদীন

দুই বার আমার ফুসফুসের অপারেশন হয়েছে। তারপরও সুস্থ হই নি। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমতো নিতে পারতাম না। হাঁটতেও কষ্ট হতো। এমন অবস্থা দাঁড়াল, একগ্লাস পানি নিজে খেতে পারতাম না। অন্য লোকের সাহায্য নিয়ে আমাকে চলতে হতো। দুবছর ধরে আমার এই অসুস্থতা।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে উপকার পেয়েছেন এমন একজনের অনুভূতি একদিন ইউটিউবে দেখলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম–আমিও কোর্সটি করব।

চার দিন মেডিটেশন ও দমচর্চা করে মনে হচ্ছে সুন্দরভাবে দম নিতে পারছি। বুকের ব্যথাও নেই। ইনহেলারের চেয়ে এই দমচর্চা আমার ক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে। ঠিকভাবে হাত নাড়াতে পারছি, আগে যেটা পারতাম না। এখন আমি অনেকখানিই সুস্থ।

[ব্যবসায়ী। ৪৬৩ ব্যাচ]

মেডিকেল কলেজে পড়ার মনছবি দেখতাম

ফারদিন রাইয়ান

আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম এবছর নভেম্বরে। তাই বলে আমি কোয়ান্টামের নতুন সদস্য নই। সেই ছোটবেলা থেকে আমি মেডিটেশনের সাথে পরিচিত। আমার বাবা-মা ও ভাইকে দেখতাম মেডিটেশন করতে। আর গুরুজীর বইগুলোও আমাদের বাসায় আছে। বইগুলো পড়ে আমি আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। আমি জানি, মেডিটেশন হলো বিজ্ঞান।

আমি মনছবির কথা প্রথম শুনি বাবা-মায়ের কাছে। তারা আমাকে *মনছবি* মেডিটেশনের অডিও ট্র্যাক দেন। আমি এটি নিয়মিত চর্চা করতাম।

আমার বাড়ি ময়মনসিংহে। তাই মনছবি দেখতাম–আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছি। এপ্রোন পরে রোগী দেখছি।

এদিকে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। আর ভোরে উঠে নামাজের পর আমি মেডিটেশন করতাম। ভর্তি পরীক্ষার সময় এলো। আমি আল্লাহর রহমতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজেই চান্স পেলাম। মনছবির শক্তি এত বেশি আগে জানতাম না।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি আরো উপকার পেয়েছি। মোবাইলের প্রতি আমার এক ধরনের আসক্তি ছিল। কিন্তু এখানে এসে এই আসক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছি।

[শিক্ষার্থী, ১ম বর্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ। ৪৬৪ ব্যাচ]

এই কোর্স তো মহাসমুদ্র!

মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন

আমি দেশের বাইরে বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক কোর্স ও সেমিনারে অংশ নিয়েছি। তিব্বত, ভারত ও জাপানের প্রশিক্ষকের কাছে ইয়োগা শিখেছি। কিন্তু ঐ কোর্সগুলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে ডিজাইন করা হয়। আর ওসব কোর্সে অংশ নিতেও ব্যয় করতে হয় প্রচুর অর্থ।

কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে আমার পরিচিতদের কাছে অনেক শুনেছি। তাই এবার দেশে এসে আমি এই কোর্সে অংশ নিলাম। এখন মনে হচ্ছে, অন্যান্য কোর্সের তুলনায় এটি মহাসমুদ্র!

যদি আরো আগে করতাম তাহলে আমি আরো সুস্থ থাকতাম, আরো স্ট্রেসমুক্ত থাকতাম। আমার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, মেডিটেশন চর্চা করলে সেটা হতো না। বহুবিধ উপকার পেয়েছি আমি এখানে এসে।

আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনেরই চেষ্টা করছে সফলভাবে।

[লন্ডন প্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার। ৪৬৪ ব্যাচ]

বাবাকে বলব–আমি তোমাদের দায়িত্ব নেব

শিমু আক্তার পপি

আমার বাবা একজন কৃষক। আমরা চার বোন। ভাই নেই। বাবা মাঝেমধ্যেই বলতেন, 'মেয়েরা তো জামাইয়ের ঘরে চলে যাবে। এদের অত পড়াশোনা করিয়ে কী লাভ?' আর্থিক অবস্থাও আমাদের ভালো না। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলাম। বাবার ঋণ ছিল অনেক। তাই ১৩ বছর বয়সে আমাকে ঢাকায় একটা বাসায় কাজের জন্যে পাঠিয়ে দেয়।

ঢাকায় আমি যে বাসায় থাকতাম সেখানে কোয়ান্টামের স্টিকার দেখতাম–'আমি পারি আমি করব আমার জীবন আমি গড়ব'। এটা আমি নিয়মিত পড়তাম। তারপর আমি সাদাকায়নে যাই। একটা একাউন্ট করি এ কোর্স করার জন্যে। তারপর ছয় মাস ধরে একটু একটু করে টাকা জমাই। এভাবেই আমার কোর্সে আসা।

আগে আমার অনেক হতাশা ছিল। মনে করতাম, আমি আর বড় মানুষ হতে পারব না। বাবা-মায়ের জন্যেও কিছু করতে পারব না। কারণ আমি মেয়ে। কিন্তু এখন বিশ্বাস করি, আমিও বড় হবো। লেখাপড়াও শিখতে পারব। আর বাবাকে বলতে চাই, ছেলে নেই তো কী হয়েছে? আমি তোমাদের দায়িত্ব নেব।

[গৃহকর্মী। ৪৬৪ ব্যাচ]

আবার হাসি ফিরে এসেছে আমার জীবনে

জামিলা আক্তার

গত ১০ বছর ধরে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। বহু ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করিয়েছি। অনেক ওষুধ খেয়েছি। কোনো উন্নতি হয় নি। আর দুই বছর আগে আমার একটা অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকে ঘাড়, হাত-পা ও হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। এমনকি আমি সিঁড়িতে ওঠা-নামা করতে পারতাম না।

এমন অবস্থা দেখে আমার স্বামী আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে নিয়ে এলেন। প্রথমদিন মেডিটেশন করার পর বাসায় ফিরে আমি কোর্সে শেখানো ঘুমানোর সহজ টেকনিকটি অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে ছয়টায়। ঝটপট বিছানা থেকে উঠলাম। অথচ আগে ঘুম ভাঙলেই চট করে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতাম না। ব্যথার কারণে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হতো।

মেডিটেশন করে এখন আমার শরীরে কোনো ব্যথা নেই। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামাও করছি। আমি হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে আবার হাসি ফিরে এসেছে।

[গৃহিণী। ৪৬৩ ব্যাচ]

এখন আমি আর পণ্যদাস নই

মো. আশেক্কে রাসুল রনি

আমার একজন বন্ধু দুবছর ধরে আমাকে এই কোর্সটি করতে বলছেন। বিভিন্ন কারণে আসা হয় নি। কোর্স করে মনে হচ্ছে, আমি কত নেতিবাচকতার মধ্যে ছিলাম! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন–সবার সম্পর্কে এখন ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারছি। অথচ আগে ওদের সম্পর্কে নেতিচিন্তাটাই বেশি আসত।

আমি ফেসবুক আসক্ত ছিলাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টাই ফেসবুক চালু থাকত আমার ফোনে। আর দুই-তিন মাস পর পর মোবাইল সেট পরিবর্তন করতাম। এটাও ছিল এক ধরনের আসক্তি, যা এখন বুঝতে পারি।

আমি অপ্রয়োজনে প্রচুর পোশাক কিনতাম। আমার ভাইবোন দেশের বাইরে থাকেন। তাদেরকেও বলতাম পোশাক পাঠাতে। কোর্স করে আমি এখন সচেতন হয়েছি, এটা পণ্যদাসত্ব ছাড়া কিছুই না। দানের বরকত সম্পর্কেও জেনেছি। মনে হচ্ছে, এত অপচয় না করে এ অর্থ দান করলেই ভালো হতো। আমি কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক সাথে নিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করব।

[ব্যবসায়ী। ৪৬৪ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে আমার টেনশন কমে গেছে

মো. রুহুল আমিন

চার-পাঁচ মাস আগের ঘটনা। একদিন আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমার হাত-পা কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার বললেন, আপনার তো হার্টের অনেক সমস্যা! এই বলে একমাসের ওষুধ লিখে দিলেন।

আমি একমাস ঠিকমতো ওষুধ সেবন করার পর আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে আরো ওষুধ দিলেন এবং এনজিওগ্রাম করানোর প্রস্তুতি নিতে বললেন। একথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম।

পরিচিত একজনের কাছে জানলাম, টেনশন মুক্ত থাকলে হার্ট অনেক ভালো থাকে। আসলেই আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, যে-কোনো বিষয় নিয়ে খুব টেনশন করতাম। তিনি আমাকে কোয়ান্টামে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এবার সময় করে এ কোর্সে এলাম। মেডিটেশন করলাম।

আগে ১৫-২০ মিনিটও হাঁটতে পারতাম না। কোর্সের দ্বিতীয় দিনে নিরাময়ের মেডিটেশন সম্পর্কে জানলাম। ধ্যানের স্তরে নিরাময়ের প্রক্রিয়াটি অসাধারণ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। এখন আমি টানা ৩০-৪০ মিনিট হাঁটতে পারছি। মেডিটেশন করে আমার টেনশনও কমে গেছে।

[উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা। ৪৬৩ ব্যাচ]

বুলিংয়ের ভয়কে জয় করেছি

ফাইজা আলম

গত তিন মাস ধরে আমি খুব ডিপ্রেশনে ছিলাম। সবসময় নিজেকে একা মনে হতো। এই তিন মাস আমি স্কুলেও যাই নি। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতাম। খেতেও ইচ্ছে করত না। ঘুমও আসত না। শুধুই কাঁদতাম।

তিন মাস আগে আমি স্কুলে বুলিংয়ের শিকার হয়েছিলাম। প্রতিনিয়ত সেই ভয়টি আমার ভেতরে কাজ করত। মনে হতো, চারপাশের কেউ আমাকে পছন্দ করে না। অথচ আমি আগে এরকম ছিলাম না। বেশ প্রাণবন্ত ছিলাম।

এজন্যে আমার মা আমাকে বিশেষজ্ঞ কাউন্সিলর দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার ভালো লাগত না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে গুরুজীর কথাগুলো শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। মনে হচ্ছে, এবার আমি পারব। আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। সবার সাথে এখন আমি হাসিমুখে কথা বলতে পারছি। এখন আমার একটি মনছবিও আছে।

[শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। ৪৬৪ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *গুরুজী, আপনি আমাদেরকে দুঃখের গান শুনতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দেশাত্মবোধক গানগুলো তো সাধারণত দুঃখের হয়। তাহলে আমরা কি আর দেশাত্মবোধক গান শুনব না? উত্তর দিলে উপকৃত হবো।*

উত্তর : দুঃখের গান শুনতে যদিও অনেকেরই ভালো লাগে, কিন্তু এসব গান ক্রমান্বয়ে মানুষকে বিষণ্ন আর হতাশ করে তোলে। অন্যদিকে, দেশাত্মবোধক গান আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। একে মোটেও দুঃখের গান বলা যাবে না; বরং এসব গান আমাদের অনুপ্রাণিত করে, শক্তি দেয় এবং অন্তরে সমমর্মিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।

প্রায় সব দেশাত্মবোধক গানের মূল কথাই হলো সেইসব আত্মত্যাগী বীরদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যারা দেশমাতৃকার সম্মান স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণদান করেছেন, শহিদ হয়েছেন। সেইসাথে দেশ, মাটি ও মানুষের উচ্চতর এবং আলোকিত বৈশিষ্ট্যগুলোও প্রকাশিত হয় এসব গানের বাণী ও সুরে। যার ফলে এসব গান শোনার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তর্গত শক্তি জাগ্রত হয়। ভেতর থেকে ভালো কিছু করার তাড়না অনুভব করি আমরা।

অতএব দেশাত্মবোধক গানের অনুভূতি মূলত ইতিবাচক অনুভূতি। তাই দেশাত্মবোধক গান শুনবেন, আমাদের বীর ও শহিদদের জন্যে দোয়া করবেন। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করবেন। তাহলেই আপনি তাদের জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করবেন। সর্বোপরি উজ্জীবিত হবেন দেশপ্রেম, সমমর্মিতা ও মানবপ্রেমে।

প্রশ্ন : *ঘরে-বাইরে সবার জন্যেই এখন রয়েছে বিনোদনের নানা রকম সুযোগ ও ব্যবস্থা। আমার প্রশ্ন হলো, সঠিক জীবনদৃষ্টি অনুসারে জীবনে বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? থাকলে সঠিক ও সুস্থ বিনোদন কী হতে পারে?*

উত্তর : প্রশ্নটা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি। কারণ ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক, টিভি সিরিয়াল আর স্মার্টফোন কিংবা স্মার্ট টিভির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়াকেই এখন বিনোদন মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। এগুলো কোনোভাবেই সুস্থ বিনোদন হতে পারে না।

কারণ মানুষে মানুষে বাস্তব যোগাযোগবিহীন এসব তথাকথিত বিনোদন আপনাকে কখনোই নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্যমে উজ্জীবিত করে না; বরং আপনাকে অবসন্ন করে। আরো নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ করে তোলে। অথচ সত্যিকার বিনোদন তো সেটাই, যা আপনার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জোগাবে এবং আপনি দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে নেমে পড়বেন।

কিন্তু স্ক্রিননির্ভর এসব বিনোদনে কি তা হয়? কখনোই না। আমরা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একথা বলছি। পৃথিবীজুড়ে মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও এখন তা-ই বলছেন–হতাশা, বিষণ্নতা, উদ্যমহীনতা, মনোবৈকল্য ও কর্মবিমুখতার অন্যতম প্রধান কারণ এসব প্রযুক্তিপণ্যের আগ্রাসন।

কারণ বিনোদনের নামে এসব একদিকে জীবনের মূল্যবান সময় কেড়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে গড়ে তুলছে আসক্ত, পরিশ্রমবিমুখ ও মেধাহীন একটি প্রজন্ম। যে-কারণে প্রযুক্তি মাফিয়ারা বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ ও শিশুদের হাতে স্মার্টফোনসহ নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য তুলে দিচ্ছে। কিন্তু তারা নিজেদের সন্তানদের কখনোই এসব উপকরণ হাতে নিতে দেয় না–সেটা বিনোদনের জন্যেই হোক বা যোগাযোগের প্রয়োজনেই হোক। কারণ এর পরিণতিটা তারা ভালোভাবেই জানে। অতএব নিজেরা বাঁচুন। সন্তানদের বাঁচান। সন্তানদেরকে পরিশ্রমনির্ভর জীবনযাপনে উৎসাহিত করুন।

আর সঠিক জীবনদৃষ্টির সাথে বিনোদনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু সেটা হতে হবে সুস্থ বিনোদন। যেমন, চিরায়ত সাহিত্য ও আত্ম উন্নয়নমূলক বই পড়া, মানুষ ও প্রকৃতিকে জানতে ভ্রমণ, বাগান করা, খেলাধুলা, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ইত্যাদি। এমনকি বঞ্চিত-অসহায় মানুষের কল্যাণে প্রতিদিন নিয়ম করে কিছুটা সময় দেয়াটাও হতে পারে আপনার জন্যে নতুন অনুপ্রেরণার উৎস।

এককথায় যা আপনাকে আসক্ত করে, নেশাগ্রস্ত করে, বাস্তব যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন একা মানুষে পরিণত করে, জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, মেধার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং আপনার অর্থনাশের কারণ হয় সেটা বিনোদন নয়। জুয়া যেমন কখনো বিনোদন হতে পারে না, মাদক কখনো বিনোদন হতে পারে না। যা আপনাকে স্বস্তি দেয়, প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত করে, সেটাই সত্যিকারের বিনোদন।

প্রশ্ন : *চিনি বর্জনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে কোয়ান্টামের পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও চিনিকে চিহ্নিত করছেন 'হোয়াইট পয়জন' হিসেবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি চিনি বর্জন করতে। কিন্তু অতিথি আপ্যায়নে বা কারো বাসায় দাওয়াতে যাওয়ার সময় মিষ্টির প্রচলন সর্বত্র। এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী? মিষ্টির বিকল্প হিসেবে আমরা কী দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারি?*

উত্তর : ফল ও খেজুর দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করুন। কারো বাসায় দাওয়াতে গেলেও মিষ্টান্নের পরিবর্তে ফল ও খেজুর নিয়ে যান। সবদিক থেকে এটাই স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ।

আসলে একটা প্রচলিত ধারণা ও অভ্যাসচক্রের বাইরে এসে সমাজে নতুন কিছুর প্রচলন ঘটানো একটু সময়সাপেক্ষ, কিন্তু অসম্ভব নয়। বরং কিছু মানুষ সৎ উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে লেগে থাকলে সমাজের সবাই একসময় সেটা সাদরে গ্রহণ করেন, এটাই সত্য। এর প্রমাণ তো অনেক আছে।

যেমন, আমরা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা যখন ২০১৩ সাল থেকে বৈশাখে ইলিশ বর্জন করলাম, একটু একটু করে চারপাশে এর প্রভাব পড়তে শুরু করল। সর্বস্তরেই একটা সচেতনতা পরিলক্ষিত হলো। ফলে গত কয়েক বছরে বৈশাখে ইলিশ খাওয়া ও ইলিশ নিধনের ব্যাপারে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় ভাটা পড়ল। আর এটা তো এখন প্রমাণিত সত্য যে, আমাদের দেশে ইলিশের আকার ও স্বাদ বেড়েছে, যেখানে অন্যান্য দেশের ইলিশের আকার কমে গেছে!

শুধু তা-ই নয়, দুই দশক ধরে আমরা প্রতি রমজানে শুধু খেজুর-পানি দিয়ে ইফতার করছি–এরপর বহু রকমের খেজুর দেশে সহজলভ্য হয়েছে, যা ২০ বছর আগে ছিল না। কারণ খেজুরের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ আমরা ছোটবেলায় দুধরনের খেজুরই শুধু দেখতাম–একেবারে চ্যাপ্টা এক ধরনের খেজুর, আরেকটা ছিল শুকনো খোরমা।

আসলে যখন যেখানে যে জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি হয়, সেখানে সেই জিনিসের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়। যেমন, ডাব। এখন প্রতিটি বাজারে তো আছেই, এ-ছাড়াও রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভ্যানগাড়িতে ডাব। এই চাহিদা যখন আরো বাড়বে এবং আমরা আরো ডাব গাছ রোপণ করব, দেখা যাবে তখন ডাব রপ্তানিও করা সম্ভব হচ্ছে। দুযুগের বেশি সময় ধরে আমরা কোয়ান্টামে বলে আসছি যে, কোমল পানীয় বর্জন করুন। এর পরিবর্তে ডাবের পানি পান করুন। একদিকে আপনার স্বাস্থ্য বাঁচবে, সেইসাথে টাকাটা পাবে দেশের কৃষক।

একইভাবে আমরা যদি খেজুরের চাহিদা সৃষ্টি করি এবং ব্যাপকভাবে ভালো মানের খেজুর উৎপাদন শুরু করি, তাহলে ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশে আমরা খেজুর রপ্তানি করতে পারব ইনশাল্লাহ। আগামী ১৫ বছরে এই বাস্তবতা সৃষ্টি করা সম্ভব, যদি আমরা চাই। কারণ আমাদের আন্তরিক ও সঙ্ঘবদ্ধ চাওয়া যে কতটা কার্যকর, তা-তো আমরা জানিই। আর আমাদের মাটি এত উর্বর যে, এখানে বীজ পড়লে গাছ হয়ে যায় প্রায় কোনো যত্ন ছাড়াই।

দেশে বর্তমানে প্রতিবছর খেজুর আমদানি করা হয় ৩০ হাজার টন। এই ৩০ হাজার টন খেজুর উৎপন্ন হতে মাত্র আড়াই লক্ষ গাছই যথেষ্ট। আর ডাব এবং খেজুর গাছের জন্যে জায়গার প্রয়োজন হয় সবচেয়ে কম। জমির প্রান্ত ঘেঁষে রোপণ করলে মূল ক্ষেতের কোনো ক্ষতিও হয় না।

তাই বিয়েসহ যে-কোনো দাওয়াতে, আপ্যায়নে ও সাফল্য উদযাপনে মিষ্টি বর্জন করুন। বিকল্প হিসেবে বেছে নিন খেজুর ও ফল, বিশেষত মৌসুমি ফল। আর খেজুর খাওয়া সুন্নত। রসুলুল্লাহ (স) খেজুর খুব পছন্দ করতেন। বহু দিন তাঁর কেটেছে শুধু খেজুর খেয়ে। তিনি খেজুরের বীজও ভিজিয়ে খেয়েছেন। পুষ্টির দিক থেকেও খেজুর খুব ভালো। অতএব এখন থেকে মিষ্টির বিকল্প হিসেবে আমরা খেজুরের প্রচলন করব। সেইসাথে দেশীয় ও মৌসুমি ফল তো আছেই।

এ মাসের অটোসাজেশন

জানাকে মানায় রূপান্তর করতে না পারলে সে জানা অর্থহীন। আমি জানব এবং মানব।

শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

রক্তদাতারা দেশের জন্যেই কাজ করছেন

১৫১ তম পর্বের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

বর্তমানে আমাদের দেশে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সচেতনতা তৈরি হচ্ছে, যা ২০ বছর আগেও ছিল না। আর ৭০ কিংবা ৮০-র দশকে তো কল্পনাই করা যেত না। সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের ভীতি কাজ করত। ফলে মাদকাসক্ত বা পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে অনেক সময় রক্ত নিতে হতো। একবার ভাবুন, একজন সুস্থ মানুষের শরীরে দূষিত রক্ত গেলে কী অবস্থা হবে? রক্তদাতারা মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ করছেন। ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকার জন্যে যেমন মুক্তিযোদ্ধারা রক্ত দিয়েছিলেন, আপনারা মুক্তিযুদ্ধ না করলেও দেশের মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। আপনারা আসলে দেশের জন্যেই কাজ করছেন।

২৪ নভেম্বর শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৫১ তম পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর (পিআইবি) মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

এর আগে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৫০ তম পর্ব। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, 'মানুষের জীবন হলো তার কাজের সমষ্টি। কিন্তু কাজটা হতে হবে ইতিবাচক। কারণ নেতিবাচক কাজ জীবনের সংজ্ঞা হতে পারে না। বলা হয়, ত্যাগের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। তাই দেয়ার আনন্দই পারে জীবনকে সুখী করতে। রক্তদাতারা সুখের এ সূত্র ভালোভাবেই বুঝেছেন।'

উল্লেখ্য, ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত এই প্রোগ্রাম দুটিতে কোয়ান্টাম ল্যাবে ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ১৭০ জনকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।

১৫০ তম পর্বে প্রধান অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ ও সভাপতি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন

১ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে অনুষ্ঠিত হয় ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক সেমিনার। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে মিশনের নিজস্ব মিলনায়তনে আয়োজিত এ সেমিনারে অংশ নেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস) নূর এলাহী মিনাসহ মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

- ☐ ১ নভেম্বর রাজশাহীর বহুমুখী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জেলা শিক্ষা অফিসের আয়োজনে বিভিন্ন উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৬০ জন শিক্ষক ও প্রশিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন।
- ☐ ৫ নভেম্বর দিনাজপুরে ক্রিসেন্ট কিন্ডারগার্টেন গার্লস হাই স্কুল ও সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২১০ জন এবং ৩৫৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ☐ ৭ ও ১৪ নভেম্বর ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুলের আজিমপুর শাখায় তিনটি সেশনে ৭০৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ☐ ৭ নভেম্বর ঢাকায় রায়হান স্কুল এন্ড কলেজে ১২৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন।
- ☐ ১২ নভেম্বর ঢাকায় হামদর্দ কলেজের হোস্টেলে ৭০ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন।
- ☐ ১২ নভেম্বর মাগুরা জেলার ভাবনহাটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫১০ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন।

মহাজাগতিক সফরে

কানিজ ফাতেমা রুমা

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০–১২ নভেম্বর ২০১৯

১২ নভেম্বর মহাজাগতিক সফরে যাত্রা করেন কোয়ান্টাম ল্যাবের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী কানিজ ফাতেমা রুমা (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

সেদিন সকালে মিরপুরস্থ বাসা থেকে কর্মস্থল ল্যাবে আসার পথে শান্তিনগর মোড়ে এক মর্মন্তুদ সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। খবর পাওয়ার সাথে সাথে মুমূর্ষু কানিজকে নিয়ে তার ল্যাব সহকর্মীরা দ্রুত চলে যান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

হাসপাতালের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বাঁচানো সম্ভব হয় নি কানিজকে। কোয়ান্টাম ল্যাব কর্মীদের দ্রুত তৎপরতায় রক্ত ও অন্যান্য উপকরণের তৎক্ষণাৎ জোগান দেয়া সম্ভব হলেও ততক্ষণে কানিজ ফাতেমা রুমা চলে গেছেন সমস্ত চিকিৎসার ঊর্ধ্বে। বেলা একটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কানিজ ফাতেমা ২০১১ থেকে ফাউন্ডেশনে কাজ করছেন। কিছুদিন আর্কাইভে দায়িত্ব পালনের পর ইনফরমেশন সেল, কেন্দ্রীয় দফতরের অভ্যর্থনা এবং সবশেষে ল্যাবে যোগ দেন ২০১৩-তে। তিনি ল্যাবের সংযোগায়ন টিমে কর্মরত ছিলেন।

২৮৪ ব্যাচে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স সম্পন্ন করেন। রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ১৬ তম ব্যাচে।

হাসিখুশি সদালাপী সপ্রতিভ এ মানুষটি ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রিয়মুখ। সঙ্ঘের প্রতি তার আন্তরিকতা ও লেগে থাকা তাকে করেছিল ব্যতিক্রমী একজন।

আমরা কানিজ ফাতেমা রুমার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করছি।

সভ্যতা যাদের কাছে ঋণী

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু

কাজই ছিল যার প্রেম

৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ – ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭

'যে ব্যক্তি পৌরুষ হারিয়েছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।'

'বিজ্ঞান প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের নয়, বিজ্ঞান সর্বজনীন'

রাত ১১টা। এখনো বাড়ি ফেরেন নি জগদীশচন্দ্র বসু। নিজের গবেষণাগারে কাজ করছেন গভীর মনোযোগে। গবেষণাগার বলতে ২৪ বর্গফুটের ছোট্ট একটি ঘর। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শৌচাগারের পাশে পরিত্যক্ত এই ঘরটি বরাদ্দ পেয়েছেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু। যদিও কলেজে গবেষণাগার রয়েছে, কিন্তু সেখানে তার প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই। কারণ তিনি বাঙালি।

এটি উনিশ শতকের কথা। তখনো আমরা ব্রিটিশদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

নীতিতে অহিংস ॥ তবু মাথা নোয়াবার নয়

পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জগদীশ বসু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন, ব্রিটিশ শিক্ষকদের চেয়ে অর্ধেকেরও কম বেতন দেয়া হলো তাকে। তিনি তা নিতে রাজি হন নি। বলেছিলেন, 'যেদিন আমি ন্যায্য বেতন পাব সেদিনই নেব, তার আগে নয়।' এরপর কোনো বেতন ছাড়াই অধ্যাপনা করে গেলেন। দায়িত্বে আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না।

তার গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই ডিজাইন করতেন। স্থানীয় মিস্ত্রিকে দিয়ে তা বানিয়ে নিতেন। এসব খরচও নিজেকেই বহন করতে হয়েছে। বেতন বা অধিকার আদায়ের জন্যে কারো শরণাপন্ন হন নি, কখনো তর্ক-বিতর্কেও জড়ান নি।

তিন বছর এভাবেই চলল। এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলো তাকে পূর্ণ মর্যাদায় ব্রিটিশ শিক্ষকদের সমান বেতন দিতে। উপরন্তু তিন বছরের বকেয়া বেতনও তারা পরিশোধ করল। এই অর্থ পেয়ে জগদীশচন্দ্র প্রথমেই তার বাবার ধার-দেনা শোধ করে বাবাকে নির্ভার করলেন।

এ তিন বছর জগদীশের অর্থকষ্ট কিন্তু কম হয় নি। পত্রিকায় কলাম লিখে তিনি সংসার চালিয়েছেন। তবুও অটল ছিলেন তার অহিংস নীতি এবং লক্ষ্যে।

বাবা-মায়ের শিক্ষা ছিল দেশপ্রেম

ব্রিটিশ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ও মা বামাসুন্দরী বসু তাকে উদারনৈতিক একটি পরিবেশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সন্তানকে তারা শিশুকালে ইংরেজি মাধ্যমে না পড়িয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়িয়েছেন। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, 'জীবনের এই প্রান্তে এসে আজ আমি বুঝে ফেলেছি, জীবনের সবচেয়ে তলতলে কাঁচা বয়সে কেন আমাকে বাংলা স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। নিজের ভাষা শেখো, স্বদেশের সংস্কার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হও। হৃদয়ঙ্গম করো, তুমি ওদেরই একজন। বিচ্ছিন্ন নও, শ্রেষ্ঠ নও।'

লন্ডনে কেমব্রিজে পড়াশোনা করতে গেলেও পড়া শেষ করে তিনি দেশে চলে আসেন। পরবর্তীতে গবেষক হিসেবে অনেকবার বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও তা নাকচ করেছেন অবলীলায়।

সাহস জুগিয়েছেন সহধর্মিণী অবলা বসু

জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী অবলা বসুর মতো মেধাবী বাঙালি নারী সে যুগে কমই ছিল। ১৮৮১ সালে প্রবেশিকা পাশ করে মেডিকেলে পড়ার জন্যে তিনি মাদ্রাজে যান। তিন বছর পড়াশোনাও করেন। কিন্তু বিয়ের পর সেটা সম্পন্ন করা হয় নি।

তাদের ৫০ বছরের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের ছিল। জগদীশচন্দ্র অকপটেই বলেছেন, 'আমার স্ত্রীরত্নের সহযোগিতা না পেলে বিজ্ঞানের সাধনায় সফল হওয়া কঠিনই হতো। সম্ভবত আমার কোনো প্রচেষ্টাই আলোর মুখ দেখত না। মাঝপথে তা উল্টে পড়ত মুখ থুবড়ে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে আমি অবলার কাছে চিরঋণী।'

সভ্যতাকে উপহার দিলেন নতুন এক বিজ্ঞান

গবেষণা করতে গিয়ে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সাথে তিনি মিল খুঁজে পেলেন আলোক তরঙ্গের। এর নাম দিলেন 'অদৃশ্য আলোক' এবং বললেন, 'অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে।' জনসম্মুখে প্রমাণ করেও দেখালেন।

১৮৯৫ সাল। কলকাতার টাউন হল লোকারণ্য। ৭৫ মিটার দূরত্বে তালাবদ্ধ একটি ঘরে সিগন্যাল পাঠিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার চেপে পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পেল সবাই। অনেকে মনে করলেন এটি জাদু! সভ্যতা পেল তারবিহীন নতুন এক প্রযুক্তি।

এবছরই তিনি মাত্র পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আদান-প্রদানের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন এবং এই জ্ঞান সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। পরের বছর ইতালীয় বিজ্ঞানী জি. মার্কনি ২৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ প্রেরণ করলেন। সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে পড়ল, মার্কনি হলেন বেতার আবিষ্কারক। অথচ জগদীশ বসুর নাম কেউ নিলেন না। পরাধীন একটি দেশের নাগরিককে কে মূল্যায়ন করবে? চাপা পড়ে গেল তার নাম। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি। চান নি কোনো স্বীকৃতি। এগিয়ে নিয়েছেন তার গবেষণা।

বর্তমানে সত্যটি কিন্তু সবাই জানে। মার্কনি নয়, জগদীশচন্দ্র বসুই রেডিও বিজ্ঞানের জনক।

গাছেরও প্রাণ আছে, আছে অনুভূতি!

গাছের যে প্রাণ আছে–একথা তিনিই প্রথম বলেন। বিদ্যুৎ ও আলো নিয়ে গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে তিনি গাছ নিয়েও গবেষণা করেছেন প্রায় ৩৩ বছর। নিরলস গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন শতাধিক যন্ত্র। এসব যন্ত্র দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন গাছের জীবনচক্র এবং গাছের অনুভূতির নানা রহস্য।

বিজ্ঞান সাধনার বিষয়, কোনো বিক্রয়পণ্য নয়

অনেকেই তার আবিষ্কারগুলোকে পেটেন্ট করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, একজন বিজ্ঞানী কখনো অর্থের পেছনে ছুটতে পারেন না। কারণ বিজ্ঞান বিক্রির পণ্য নয়। এটি সাধনার বিষয়।

আসলে কোনো মোহ সাধনার বিপরীতে তাকে নিয়ে যেতে পারে নি। সভ্যতাকে তিনি ঋণী করে গেছেন। তার নিরলস কর্ম-সাধনা আবারো প্রমাণ করল–সত্যের জন্যে যে কাজ করে, তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি না পেলেও ইতিহাস তাকে মাথা নুইয়ে স্বীকৃতি দেয়।

- জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ময়মনসিংহে এবং পিতৃভূমি মুন্সিগঞ্জে।
- বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার সম্পর্কে বলেন, 'জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিটির জন্যে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।'
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তার বন্ধু। তিনি বলেছেন, 'মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মাঝে আলো দেখেছিলুম।'
- বাংলা ভাষার প্রথম সায়েন্স ফিকশন লেখক।
- জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভাবিত তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে রেডিও, টেলিভিশন, এমনকি একালের রাডারেও। আধুনিক ওয়াইফাই প্রযুক্তির উদ্ভাবনেও তার দেয়া তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
- আবিষ্কার করেন সেমিকন্ডাক্টর রেক্টিফায়ার এবং এই উপমহাদেশে তার মাধ্যমেই প্রথম এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের চর্চা শুরু হয়।
- ১৯১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'।
- মৃত্যুর আগে তার উপার্জনের ১৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তির ১৩ লক্ষ টাকাই দান করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির ফান্ডে। মৃত্যুর পর তার স্ত্রীও বাকি সম্পত্তি দান করেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ডিসেম্বর ২০১৯ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd